নীলাচলে
শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ

শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী
প্রণীত।

পুরী আনন্দধাম হইতে
শ্রীযুক্ত নরহরি ঠাকুর কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

—:০:—

কলিকাতা,
২৫নং রামবাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,
সান্যাল এণ্ড কোম্পানি হইতে
শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।
বাং ১৩২৩। ইং ১৯১৬।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।
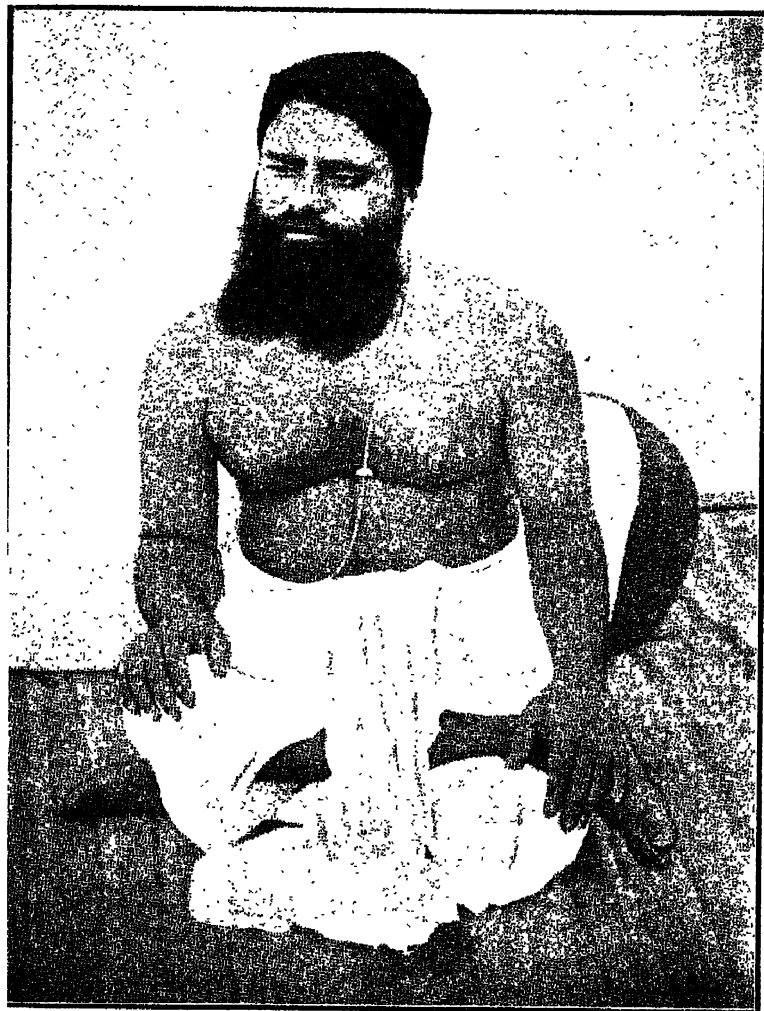
মুক্তাগাছা হরিভক্তি-প্রদায়িনী সভার সভাপতি
রাজর্ষি গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী

L. RAY & S

নিবেদন

মৎপ্রণীত নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-গ্রন্থ বহু বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এতদিনে প্রকাশিত হইতে চলিল। এই গ্রন্থ কাহাকে উপহার দেই ভাবিতেছিলাম। ইহা ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ। কে ইহাকে আদর করিয়া গ্রহণ করিবে? যাঁহার নিকট সামান্য গুণ বহুল বলিয়া বিবেচিত হয়, গুণ না থাকিলেও অনাদৃত হইবার কোন ভয়ের কারণ নাই, তাঁহারই চরণে সমর্পণ করিব। তিনি আমার শ্রীহরি। মুক্তাগাছা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার নিত্য পূজার দেবতা শ্রীশ্রীজগন্নাথ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীহরি ইহাতে অভেদ সুতরাং শ্রীহরিকে অর্পণ করিলে ইঁহাদের সকলকেই অর্পণ করা হইল এই মনে করিয়া ও হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার কল্যাণ কামনায় শ্রীহরিচরণে অর্পণ করিলাম।

এই গ্রন্থ বিক্রয় দ্বারা যাহা লাভ হইবে তাহা হরিসভা তহবিলে জমা হইবে এবং তাহার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যতে এই গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে যাহা ব্যয় লাগিবে তাহা আমার ষ্টেট্ হইতে দেওয়া হইবে।

এই গ্রন্থ প্রণয়ন জন্য যাঁহাদের গ্রন্থ হইতে সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি তাঁহাদের নিকট আমি ঋণী। ৺পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহুজন প্রণীত অনেক গ্রন্থ

আছে। তাঁহাদের সকলের নিকট হইতেই কিছু কিছু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি সুতরাং তাঁহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি। ইঁহাদের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের প্রণীত জগন্নাথ মাহাত্ম্য ও তাঁহার প্রকাশিত মুক্তি চিন্তামণি গ্রন্থ হইতে বহু সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি এজন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি।

প্রথমতঃ স্নেহাস্পদ শ্রীমান শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এই গ্রন্থের কতক কতক উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে তজ্জন্য তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি। এতদ্‌ব্যতীত অনেকে আমায় লিখিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীমান বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য, বিধুভূষণ রায় চৌধুরী, পূজনীয় শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত নরহরি ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অঘোরনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রুফ দেখার সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য ইহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য হওয়ার জন্য এই গ্রন্থের ভাষা সাধারণ ভাষাতে লিখিত হইয়াছে।

দ্বাদশ যাত্রা লিখিতে গিয়া রাসযাত্রা পরে বিস্তারিত রূপে লিখিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম কিন্তু আমার শরীর নিতান্ত রুগ্ন থাকায় রাসযাত্রা লিখা প্রায় শেষ করিয়াও অল্পের জন্য এই গ্রন্থের কলেবরভুক্ত করিতে

পারিলাম না। ঈশ্বরানুগ্রহ হইলে অল্প দিনের মধ্যে এই গ্রন্থের কলেবরভুক্ত হইবে এবং পৃথক্‌রূপেও তাহা বাহির করিতে ইচ্ছা রহিল। এই গ্রন্থে অনেক ভুল দেখা যায়, তাহা পাঠকবর্গ আমাকে ক্ষমা করিবেন। প্রুফ দেখার দোষে কি ছাপাখানার দোষে হইল তাহা বলিতে পারি না। শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল তাহা দেখিয়া লইবেন।

বিনীত—

শ্রীগোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

নীলাচলে

শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ।

প্রস্তাবনা।

—ঃ০ঃ—

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

আমরা কি চাই? কেবল আমরা কেন—সমস্ত জীবজন্তু, পশুপক্ষী এবং অন্যান্য প্রাণিসকল কি চায়? সমস্ত জগৎ যে অনবরত ছুটাছুটী করিতেছে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছে—কি উদ্দেশ্যে? ধনীর প্রাসাদে যাও, দরিদ্রের কুটীরে যাও, বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকলের দিকে তাকাও—সকলেই যেন এক অভিপ্রায়ে একদিকে ধাবিত হইতেছে। অনুসন্ধান করিলে কি বুঝিতে পারা যায়? স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে, পিতা পুত্রকে ভালবাসে,—সকলেরই উদ্দেশ্য একস্থানে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। সকলেই চায় সুখ হউক, দুঃখ না হউক।

"সুখং মে ভূয়াৎ, দুঃখং মে মা ভূৎ।"

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ সকলেই এইকথার সাক্ষ্য দিতেছে।

বেদান্ত বলেন, বিনা প্রয়োজনে কোন কার্য্য হয় না। সেই প্রয়োজন কি?—অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং সুখের প্রাপ্তি। অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলেই সমস্ত দুঃখের অবসান হয়, এবং নিত্য সুখ লাভ হয়। বেদান্ত বলিতেছেন—

প্রয়োজনন্তু তদৈক্যপ্রমেয়গতাজ্ঞান-
নিবৃত্তিঃ তৎস্বরূপানন্দাবাপ্তিশ্চ।
শোকং তরন্তি সাধবঃ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।

আমাদের প্রয়োজন কি তাহা ব্যাখ্যা করিতেছেন,—আমাদের প্রয়োজন অজ্ঞানের নিবৃত্তি; অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেই প্রকৃত সুখলাভ হয়,—অর্থাৎ আনন্দময় আত্মার বিকাশ হয়। প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই শোকের নিবৃত্তি হয়—ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই ব্রহ্ম হইয়া যায়। মানুষ সুখের আশায় সংসারের সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, কিন্তু তাহা বেশী দিন ভাল লাগে না, আবার নূতন করিয়া পত্তন দিতে থাকে। এইরূপ একবার ধরিতেছে, আবার ছাড়িতেছে—কোনটীতেই স্থায়ী সুখ হয় না বলিয়া, মনে করে, অন্যটা ধরিলে বোধ হয় সুখ হইবে, কিন্তু তাহাও ঠিক হয় না। এইরূপে কতই পরিবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তাহার অভীষ্ট লাভ হয় না। বেদান্ত এই সম্বন্ধে একটী গল্পের আভাষ দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেছি। কোন ব্যক্তি কোন জিনিষ হারাইয়াছে—কত জিনিষ তাহার সম্মুখে উপস্থিত করা যাইতেছে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া

দেখে তাহার নয়, আর ছাড়িয়া দেয়। এইরূপ ভাবে বহুদিন গেল কিন্তু তাহার হারাণ জিনিষ আর পাওয়া গেল না। এই জিনিষের শোকে অত্যন্ত মুহ্যমান হইয়া নানারূপ পরিতাপ করিতেছে, এমন সময়ে একজন পথিক জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কি হারাইয়াছে? সে বলিল, আমার কণ্ঠমণি। ঐ পথিক তাহার কণ্ঠ দেখাইয়া বলিল, তোমার কণ্ঠে ওটা কি? তখন কণ্ঠে হাত দিয়া তাহার জ্ঞান হইল যে তাহার ভুল হইয়াছে, তাহার হারাণ হার তাহার কণ্ঠেই আছে। আরও একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। মৃগনাভি সকলেই জানেন। এক প্রকার পার্ব্বতীয় মৃগ আছে, তাহার নাভিদেশে কস্তুরী জন্মে। যখন কস্তুরী প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহার গন্ধ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে। মৃগ সেই গন্ধে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া গন্ধোৎপাদক সামগ্রী লাভের জন্য সমস্ত বন অনুসন্ধান করিতে থাকে; কিন্তু মৃগ কিছুতেই তাহা স্থির করিতে পারে না। তাহার নাভিতে কস্তুরী আছে, অথচ সে তাহা বুঝিতে না পারিয়া দুনিয়া খুজিয়া বেড়াইতেছে। তাই তুলসীদাস বলিতেছেন—

"সব ঘটমে হরি হ্যায়, পছন্তায় নেই কই।
নাভিকা সুগন্ধ মৃগ নাহি জানত,
ঢোড়ত ব্যাকুল হোই॥"

মানুষও তাহার অন্তরস্থ আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া তাহার

সুগন্ধস্বরূপ যে ক্ষণিক সাংসারিক সুখ, তাহাই গ্রহণ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে স্থায়ী সুখের কোনও সম্ভাবনা নাই; তাহা কয়েকদিন পরেই ফুরাইয়া যায়, আবার অন্য বস্তু ধরে। জীব আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া, মৃগের ন্যায় সংসার অরণ্যে ঘুরিয়া মরিতেছে। ভাগ্যবশতঃ যদি সদ্‌গুরু লাভ হয়, তবে তাহার প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়; এবং একদিন যে আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া গিয়াছিল, তখন তাহার উপলব্ধি হয়। পূর্ব্বে যে পথিকের কথা বলিয়াছি তাহাই গুরু

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

(তুলসীদাস)।

সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান কর উপদেশ।
কয়লা কি ময়লা ছোটে যব্ আগ্ করে প্রবেশ॥

তথাচ বেদান্তে।—

নিত্যপ্রাপ্তস্য আত্মনঃ অজ্ঞানমোহান্ধ-
কারাবৃতত্বেন বিস্মৃতস্বস্বরূপস্য গুরুশ্রুতিবাক্য-
শ্রবণানন্তরং অজ্ঞানমোহান্ধকার-নিবৃত্তিঃ স্যাৎ।

আত্মা নিত্য স্বপ্রকাশ, অজ্ঞানমোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া তাঁহার নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছেন। কালক্রমে গুরু শ্রুতিবাক্য শ্রবণ দ্বারা অজ্ঞানমোহান্ধকার নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

জনন-মরণাদি-সংসারানল-সন্তপ্তঃ প্রদীপ্তশিরা
জলরাশিমিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং
ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।

সূর্য্যতাপে প্রদীপ্তশির পথিক যেমন জলাশয় অনুসন্ধান করে জন্মমরণাদি সংসারানল সন্তপ্ত হইয়া শিষ্য সেইরূপ জন্মমরণাদি ত্রিতাপ জ্বালা জুড়াইবার জন্য সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার অনুসরণ করিতে থাকে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বলিতেছেন—

"ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি,
কিন্ত্বাত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"

অরে সমস্ত বস্তু যে আমাদের নিকট প্রিয় কি জন্য? স্ত্রীকে ভালবাসি, পুত্রকে ভালবাসি, এবং কত উপাদেয় সামগ্রী প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিতেছি; কিন্তু কোন জিনিষই দ্রব্যের প্রয়োজনীতা বলিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। ইহা আত্মার প্রয়োজন—তাই সমস্ত উপহার তাহাকে দেওয়া হইতেছে। কিন্তু প্রকৃত আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কিছু দ্বারা তাহার পূরণ হইতেছে না। আত্মতত্ত্ব না জানিয়া সমস্ত বেদ, সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করিলেও, সমস্ত বিদ্যা জানিলেও তাহার সেই তৃপ্তিলাভ হইবে না। সুতরাং আত্মাকে লাভ করাই সমস্ত প্রয়োজনের মূলতত্ত্ব।

পরমকারুণিক পরমেশ্বর আমাদের আত্মোন্নতি লাভের জন্য নানা উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন—চারি বেদ প্রদান করিয়াছেন। ঋষিগণ আত্মতত্ত্ববিদ্, সুতরাং তাঁহারা আত্মার স্বরূপ বর্ণনে সমর্থ; এই জন্য শাস্ত্র-প্রচার কার্য্যে ঋষিদিগকে নিয়োগ করিয়াছেন। ভগবান জীবগণের প্রতি দয়া করিয়া বহু তীর্থ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন, যাহাতে অতি সহজে ভগবৎ স্বরূপ লাভ করা যায়। বেদ, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ সমস্ত শাস্ত্র পাঠ করিয়া আত্মতত্ত্ব লাভ করা বড়ই দুঃসাধ্য ও দুর্গম। কলির জীব অতীব দুর্ব্বল-চিত্ত,—সত্যকালের জীবদিগের ন্যায় কলির জীবের শক্তি নাই। সেই জন্য কলির জীবের উদ্ধারের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। তাহাদের উদ্ধারের উপায় তীর্থদর্শন এবং হরিনাম কীর্ত্তন।

প্রশ্ন এই হইতে পারে যে কেমন করিয়া তীর্থ উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়? তাহাতে আত্মার ত কোনও উন্নতি হইল না—আত্মতত্ত্ব কেমন করিয়া লাভ হইবে? তাহার উত্তর এই যে, আত্মা স্বপ্রকাশ, তাহার কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না। মায়ার দ্বারা আবৃত হওয়ায় তাহার দর্শন হয় না—মায়া কাটাইতে পারিলেই আত্মার বিকাশ হয়।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়
শ্রবণাদি-শুদ্ধ-চিত্তে করয় উদয়॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

নিত্য প্রাপ্তস্য আত্মনঃ ইত্যাদি।

তীর্থদর্শন দ্বারা মায়ার খণ্ডন হয়—শাস্ত্রসিদ্ধ। ব্রহ্মাণ্ডে স্কান্দে—

কিং ব্রতৈঃ কিং তপোদানৈঃ কিং তীর্থৈঃ ক্রতুভিস্তথা।
কিমষ্টাঙ্গেন যোগেন সাংখ্যেন পরমেণ চ॥
তীর্থরাজজলে স্নাত্বা ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
ন্যগ্রোধমূলে বসতৌ বসন্তং চর্ম্মচক্ষুষা।
দৃষ্ট্বা দারুময়ং ব্রহ্ম মোহবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥
যত্র সাক্ষাৎ জগন্নাথঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ।
জন্তূনাং দর্শনান্মুক্তিং যো দদাতি কৃপানিধিঃ॥

তথাচ গারুড় পুরাণে ব্যাস উবাচ—

কলিকাল-মহাঘোর-তিমিরাবৃতচক্ষুষাং।
নীলাচলশিরোরত্নং আত্মতত্ত্ব-প্রকাশকং॥
যদ্ যূয়ং বৈ সুরশ্রেষ্ঠাঃ সংসারং তর্ত্তুমিচ্ছথ।
তদা কদাচিৎ পশ্যন্তু নীলশৈলশিরোমণিং॥

পদ্মপুরাণে ব্রহ্মাণং প্রতি শ্রীভগবদ্‌বাক্যম—

শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণগোপিতং
মন্মায়য়া যন্নহি কস্য গোচরং।
প্রসাদতোমে স্তবতস্তবাধুনা
প্রকাশমায়াস্যতি সর্ব্বগোচরং॥

ব্রতেষু তীর্থেষু চ যজ্ঞদানয়োঃ
পুণ্যং যদুক্তং বিমলাত্মনাং হি।
অহো নিবাসাল্লভতেঽত্র সর্ব্বং
নিশ্বাসবাসাৎ খলু চাশ্বমেধিকম্‌॥

তীর্থ-দর্শনদ্বারা আমাদের জ্ঞান, ভক্তি এবং মুক্তি, সমস্তই লাভ হইয়া থাকে; এবং যোগাদি দ্বারা যেরূপভাবে হয়, তাহা অপেক্ষা তীর্থদর্শনে সহজভাবে লাভ হয়।

তন্ত্রযামলে ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি বশিষ্ঠবাক্যং—
ভারতে চোৎকলে দেশে ভূস্বর্গে পুরুষোত্তমে।
দারুরূপী জগন্নাথো ভক্তানামভয়প্রদঃ॥
নরচেষ্টামুপাদায় আস্তে মোক্ষৈককারণঃ।
তস্যোপভুক্তদানেন নরঃ পাপাৎ বিমুচ্যতে॥
নাস্তি তত্রৈব রাজেন্দ্র স্পৃষ্টাস্পৃষ্টবিবেচনং।
যস্য সংস্পৃষ্টমাত্রেণ যান্ত্যমেধ্যাঃ পবিত্রতাং॥
নির্ম্মাল্যদানাৎ পাপানি ক্ষয়ং যান্তি নৃপোত্তম।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পাপক্ষয়াদব্যভিচারিণী॥
ভক্ত্যা বিজ্ঞানমাপ্নোতি জ্ঞানান্মুক্তিরবাপ্যতে।
তস্মাদ্‌ যত্নেন নির্ম্মাল্যদানং দদ্যাদ্‌ দ্বিজাতয়ে॥

* * * *

সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুভক্তি-সমন্বিতঃ।
নির্ম্মলজ্ঞান-সম্পন্নস্ততো মোক্ষমবাপ্নয়াৎ॥

নদীয়াবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রত্যহ জগন্নাথদর্শন করিতেন

"আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

আপনার দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবকে তীর্থদর্শনের মাহাত্ম্য শিক্ষা দিতেন। তিনি গরুড়স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইতেন—মণি কোঠার ভিতরে প্রবেশ করিতেন না। ঐস্থানে দাঁড়াইয়া তিনি দর্শন করিতেন;—তিনি দেখিতেন ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ। এই মূর্ত্তি দর্শন কালে তাঁহার চক্ষু হইতে বারিবর্ষণ হইত;—এ পরিমাণে বারিবর্ষণ হইত যাহা পাঠক বিশ্বাস করিবেন না। যেমন নর্দ্দমার জল সজোরে নিক্ষিপ্ত হয়, এইরূপভাবে তাঁহার চক্ষু হইতে জল পড়িত। সেই চক্ষের জলে কুণ্ড হইয়াছে। চক্ষের জলে পাথর ক্ষয় হইয়া কুণ্ড হওয়া কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব আপনি এইরূপ দেখাইয়া তীর্থদর্শনের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন। ভক্তিতে মন পরিষ্কার হয়, যোগের দ্বারাও সেইরূপ হয়। সুতরাং বেদান্তের যোগে ও ভক্তি-যোগে যে ফল হয়, তীর্থদর্শনে সেই ফল লাভ হয়।

মায়াদ্বারা আত্মা যে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহার আর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা দরকার মনে করিতেছি। সমস্ত শাস্ত্রেরই লক্ষ্য মায়ার নিবৃত্তি করা, মায়া-নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয় ও আনন্দের উদ্ভব হয়। সুতরাং

মায়া যে কি তাহা বুঝাইবার জন্য বেদান্তের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল, যথা—

"অজ্ঞানস্য শক্তিদ্বয়মস্তি আবরণ-বিক্ষেপনামকং।"

অজ্ঞানের দুইটী শক্তি—আবরণ ও বিক্ষেপ। অজ্ঞান অর্থাৎ মায়া। এক শক্তিতে (আবরণ শক্তিতে) সচ্চিদানন্দ-স্বরূপকে আবরণ করিয়া রাখিতেছে—তাহাতে প্রকৃত আত্মার স্বরূপ বুঝিতে দেয় না। দ্বিতীয়টী বিক্ষেপ শক্তি—তাহাতে এ জগৎ সৃষ্টি করিতেছে। প্রথম শক্তি সমস্ত অলীক জগৎকে সৎপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান করাইতেছে। এই মায়ার কথাই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

এই মায়ার কথাই চণ্ডীতে বলা হইয়াছে—

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়া-প্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণঃ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসার-বন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥

এখানে বেদান্তের অজ্ঞান, চণ্ডীর মহামায়া এবং গীতার মায়া একই জিনিষ। বেদান্তের মায়া শক্তি দ্বারা আবরণ ও বিক্ষেপ জন্মাইতেছে। চণ্ডীতেও আমরা সেই দুই শক্তির কার্য্যই দেখিতেছি। কারণ যিনি মোহগর্ত্তে নিমজ্জিত করিতেছেন, তিনি সৃষ্টিও করিতেছেন। এই মহামায়া যে আমাদিগকে মোহেতে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই কথার প্রমাণ স্বরূপ রামপ্রসাদের একটী গাণের কয়েকটী পংক্তি উল্লেখ করিতেছি ঃ—

মা আমায় ঘুরাবি কত।
কলুর চোক ঢাকা বলদের মত॥

ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা আমায় পাক দিতেছ অবিরত
খুলে দে মা চোখের ঠুলি, হেরি তোমার অভয় পদ॥

এখন আমরা মায়া বোধ হয় চিনিতে পারিলাম। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া—এই মায়াতে আমাদিগকে বহির্ম্মুখ করিয়া রাখিয়াছে, ভগবন্মুখী হইতে দেয় না।

বিষয়াসক্ত-চিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ।
বারুণীদিগ্‌গতং বস্তু ব্রজন্নৈন্দ্রীং কিমাপ্নুয়াৎ॥

যেমন পূর্ব্বদিগস্থ বস্তু পশ্চিমদিকে গমনশীল ব্যক্তির পাওয়া অসম্ভব, সেইরূপ সংসারাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বর লাভ করা অসম্ভব।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ ত্রিবিধ উপায়ে

আত্মতত্ত্ব বা ভগবানকে লাভ করা যায়। ইহার কোন্‌টী ভাল, কোন্‌টী মন্দ তাহা বলা কঠিন ;—অধিকারী ভেদে ব্যবস্থা। তাই চৈতন্যচরিতামৃত উল্লেখ করিয়াছেন—

"যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম॥"

যিনি কর্ম্মযোগের অধিকারী, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মযোগই প্রশস্ত, তাঁহাকে জ্ঞানযোগ দিলে তাঁহার পক্ষে উপযুক্ত হইবে না। তাহা দ্বারা, তাঁহার সাধনের সেরূপ উপকারও হইবে না। এইরূপ ভক্তিযোগও যাহার পক্ষে উপযুক্ত নয়, তাহাকে উপদেশ দিলে সেরূপ ফল ফলিবে না। সুতরাং যাহার যে উপাদান তদনুসারে ধর্ম্ম হইলেই তাহার সাধনের অনুকূল হয়, রুচির সঙ্গেও মিলে। এই জন্য রুচি অনুসারে ধর্ম্ম নানারূপ হইয়াছে।

রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল-নানাপথযুষাং
নৃণামেকো গম্য স্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।

রুচির বিচিত্রতা অনুসারে ধর্ম্ম সাধনের নানাপথ হইয়াছে—কোনটা সহজ, কোনটা কঠিন, কিন্তু গন্তব্যস্থান একই। নদী যেমন নানা পথ দিয়া আসে, কিন্তু এক সমুদ্রেই গিয়া সমস্ত মিলিত হয়, ধর্ম্মেরও সাধন নানা প্রকার। বিভিন্ন মতে হইলেও উদ্দেশ্য সকলেরই এক এবং যখন প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তখন সকলেই দেখেন যে, একমাত্র

ভগবানই উপাস্য। নীচস্তরে যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই নানারূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কবীরের একটী দোহা এখানে উল্লেখ করিতেছি, তাহা দ্বারা এ কথার সমর্থন হইবে।

ঐহি দেশমে মেরি যানা
যাহা নেহি আপনা বেগানা
যাহা চন্দ্র সূরয নাহি ভাওয়ে যাহা শোকতাপ নাহি পাওয়ে
যাহা নেহি জমিন আসমানা।
যাহা মিট গিয়া সব ধন্দা রাম রহিম এক বান্দা
যাহা নেহি বেদ কোরাণা॥

(কবিরের দোহা)

তীর্থদর্শন কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত বলা যায়।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥

যোগীদের যোগ সাধন দ্বারা যাহা হয়, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা সেই ফল হয়। তিনি গৃহস্থ হইয়াও সন্ন্যাসীর ফললাভ করিতে পারেন।

কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—ভগবান্ প্রাপ্তির যে ত্রিবিধ উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তাহারও একটু আলোচনা হওয়া দরকার মনে করিতেছি। প্রথমতঃ কর্ম্মযোগটী কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। কায়িক, বাচনিক, মানসিক তিন উপায়েতে আমাদের কর্ম্মের অভিব্যক্তি হয়।

এক হিসাবে বলিতে পারি, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ কর্ম্মেরই ফল, সুতরাং তাহাও তাহারই অঙ্গ। যে দ্রব্য যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা একই পদার্থ। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করি—যেমন জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তিদর্শন করিলে ভক্তি ও জ্ঞানের উদয় হয়। শ্রীমূর্ত্তিদর্শনটী কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান তাহার ফল। আমি অন্নভোজন করিতেছি, অন্ন-ভোজনটী কর্ম্ম, তজ্জনিত ক্ষুধানিবৃত্তি ও আনন্দ তাহার আনুষঙ্গিক ফল। ক্ষুধানিবৃত্তি ও আনন্দ এই দুই ব্যাপার কর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গেই হইতেছে, সুতরাং সেটীও কর্ম্মসংজ্ঞার মধ্যে ভুক্ত। তাহার আর পৃথক সত্ত্বা নাই। এইরূপে কায়িক, মানসিক, বাচনিক যে ভাবেতেই ভগবানের উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করি না কেন, কর্ম্মের হেতুও কর্ম্মই বলা যাইতে পারে। ভক্তি ও জ্ঞানকে বিশেষ করিয়া দেখাইবার জন্য কর্ম্ম হইতে ঐ দুইটীকে পৃথক করিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কর্ম্ম দুই প্রকার—সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম কর্ম্মেতে ভগবানকে কামনা করিয়া পূজা করা হয়। যতদিন পর্য্যন্ত আকাঙ্ক্ষা থাকিবে, অন্তর্নিহিত কামনাবীজের মূলোৎপাটন না হইবে, ততদিন এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে হইবে। দুর্গোৎসবাদি পূজাতে উভয় রকমের ব্যবস্থাই দেখা যায়। "ধনং দেহি পুত্রং দেহি" ইত্যাদি বলিয়া পূজা করা হয়, আবার নিষ্কাম ভাবেও পূজা করা হয়। চণ্ডীতে ইহার দুইটী দৃষ্টান্ত আছে—

সুরথ রাজা কামনা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন ; আবার বৈশ্য সমাধি নিষ্কামভাবে পূজা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। সাকার উপাসনা ও বৈদিক কর্ম্ম সমস্তই কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষ জ্ঞান ও ভক্তিযোগের অধিকারী না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সাকার উপাসনা করিয়া মন নির্ম্মল করিতে হইবে। মন নির্ম্মল হইলে জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের অধিকারী হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্দে—

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্
বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবেয়ুঃ পুরুষস্য রূপম্
কর্ম্মাবসানে প্রযতঃ স্মরেত॥

যে পর্য্যন্ত জগন্ময় ভগবানেতে পূজা করিতে না পারিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ভগবানের স্থূলরূপেতেই পূজা করিতে হইবে।

উপাসনার প্রথম আরম্ভে স্থূলের উপাসনা করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সূক্ষ্মরূপের অধিকারী হইবে, তখন মানসে পূজা করিতে হইবে। অবশেষে নাম এবং রূপ কিছুই থাকিবে না এবং কর্ম্মেরও কোন প্রয়োজন থাকিবে না। সেইজন্য ভগবান্ গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে বলিয়াছেন—

আরোরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥

কামনার মূলোৎপাটনের প্রধান উপায় নিষ্কাম কর্ম্ম করা। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে তাহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সুতরাং তাহার পুনরাবৃত্তি নাই। অতএব, মানুষ কর্ম্মদ্বারাই মোক্ষলাভ করিতে পারে।

"যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥"

(গীতা—৫ম অধ্যায়)

ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া যিনি কর্ম্ম করেন, তিনি পরম শান্তি লাভ করেন; কিন্তু যাঁহার বলবতী কামনা ভিতরে রহিয়াছে, অথচ কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, তিনি কর্ম্ম না করিয়াও সংসার বদ্ধ হইয়া থাকেন। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবৎ-প্রাপ্তির প্রধান উপায়। আমাদের এ ক্ষেত্রে তিনটী বিষয়ের কোনটি বিস্তারিত বর্ণনা করিবার অভিপ্রায় নাই। কেবল সামান্যরূপে একটু আভাষ দিয়া যাওয়া মাত্র। সাকার উপাসনা করিয়াও পরে ভক্তি এবং জ্ঞানের উচ্চ সোপানে আরোহণ করা যায়। ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদের একটী গানে বিশেষরূপে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। রামপ্রসাদ প্রথমতঃ মায়ের মূর্ত্তি পূজা দ্বারা তাঁহার ভজন আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রাথমিক গান সকল পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, প্রথমস্তরে বিবেক

বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়া তিনি বিধিমার্গে ভগবতীকে অর্চ্চনা করিতেন—

"মন, তুমি কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব জমি রইল পতিত,
আবাদ করলে ফল্‌ত সোনা।"

এই গানটী দ্বারা বুঝা যায় যে তিনি প্রথম স্তরে বিবেক অবস্থায় মনকে সাংসারিক কাজ হইতে ছাড়াইয়া নিবৃত্তি মার্গে নিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। তৎপর মূর্ত্তি পূজার অবস্থা শেষ হইলে মানসপূজার অধিকারী হইলেন। সে অবস্থার একটী গান উল্লেখ করিতেছি—

ধাতুপাষাণ মাটীমূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে,
তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি বসাও হৃদি পদ্মাসনে।
আলোচাল আর পাকা কলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে,
তুমি ভক্তিসুধা খাওয়াইয়ে তারে তৃপ্ত কর আপন মনে।
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে,
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে বলি দাও ষড়্‌রিপুগণে।

তৎপরে ইহা অপেক্ষা আরও উচ্চ সোপানে উঠিলেন— এই গানটি দ্বারা বুঝিতে পারিবেন—

মন তোর এই ভ্রম গেল না,
কালী কেমন তায় চেয়ে দেখ্‌লি না;

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন তাও জান না।
তবে কেমনে ক্ষুদ্র মূর্ত্তিতে কর্‌তে চাও তাঁর অর্চ্চনা।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা
দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন লাজে সাজাতে চাস্ তায় দিয়ে ছার
ডাকের গহনা।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা
সুমধুর সুখাদ্য নানা।
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস্ তায় আলোচাল
আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালিছেন যে মা
সাদরে তাও কি জান না।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি মেষমহিষ আর ছাগলছানা।

আবার রামপ্রসাদ গায়িতেছেন—
শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান।
ওরে নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥
যত শোন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে।
ওরে আহার কর মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে॥

রামপ্রসাদ বেদ বেদান্ত কিছুই পড়েন নাই কিন্তু সাধনা দ্বারা যাহা লাভ হইতেছে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে শাস্ত্র সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। এই গানটী—

যজ্জুহোসি যদশ্নাসি যৎ করোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥ (গীতা)

ইহারই অনুবাদ মাত্র।

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম-সমাধিনা॥

এই উভয় শ্লোক দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞানের ভাব প্রকাশ করিতেছে, রামপ্রসাদ তাহা অনুভূতিতে বুঝিয়া গানে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার গান আর শাস্ত্র একই কথা প্রকাশ করিতেছে; রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা আলোচনা করিলেও আমরা তাহাই দেখিতে পাই। তিনিও নিরক্ষর ছিলেন; কিন্তু সাধন দ্বারা সমস্ত শাস্ত্রতত্ব অনুভূতি করিয়াছিলেন। বহু শাস্ত্র পড়িয়াও পণ্ডিতেরা যাহা ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না, তিনি তাহা অতি সহজ ভাষায় ভক্তদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। সুতরাং সাধনাই সমস্ত পাণ্ডিত্যের মূল।

এখন দেখুন বাহ্য মূর্ত্তি-পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া ভক্তির মধ্য দিয়া রামপ্রসাদ ক্রমে জ্ঞানের চরমসীমায় উপনীত হইয়াছেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই পূর্ণ ব্রহ্ম জ্ঞান তখন

তাঁহার হৃদয়ে উপলব্ধি হইয়াছে। সাকার পূজা হইতে ভক্তি এবং জ্ঞান, এবং কর্ম্ম হইতেও ভক্তি এবং জ্ঞান উভয়ই পাওয়া গেল। সুতরাং নিষ্কাম কর্ম্ম কেবল কর্ম্মতেই নিবদ্ধ নহে, ইহা ভজনের চরমসীমায় লইয়া যায়। কর্ম্ম আমরা এইরূপ বুঝিলাম। ভক্তি ও জ্ঞানের বিষয় কিছু আলোচনা করা যাউক।

ভক্তি ত্রিবিধ—বৈধী ভক্তি, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ও পরা-ভক্তি। এই পরাভক্তি আবার গাঢ় হইলে তাহা প্রেম নামে অভিহিত হয়।

"রতি গাঢ় হইলে তার প্রেম নাম কই।"

(চৈতন্যচরিতামৃত)

ভক্তি নবধা—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

প্রথমে যে বৈধী ভক্তির কথা বলা হইয়াছে—এই নববিধা ভক্তি তাহারই অঙ্গীভূত এই বৈধী ভক্তি নয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার এক একটী ভাব নিয়া এক একজন কৃতার্থ হইয়াছেন।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রি ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে॥

অক্রূরঃ স্তুতিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্‌ ॥

(রায় রামানন্দ সংবাদ)।

শ্রীবিষ্ণুর গুণকীর্ত্তন শ্রবণ দ্বারা পরীক্ষিৎ মুক্ত হইয়াছিলেন, কীর্ত্তন করিয়া বৈয়াসকি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন, প্রহ্লাদ নাম স্মরণে, লক্ষ্মীদেবী তাঁহার পাদপদ্ম সেবনে এবং পৃথুরাজা পূজা করিয়া, অক্রুর স্তুতি-বন্দনা করিয়া, হনুমান দাস্য ভক্তিদ্বারা, অর্জ্জুন সখ্যে এবং বলিরাজা সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে মহারাজ অম্বরীষের নাম নাই; কিন্তু ইনি একজন পরম ভক্ত, ভগবৎ সেবাই ইঁহার প্রাণ। ইনি বিধি-সেবাদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—ইনি ভক্তি প্রভাবে মহর্ষি দুর্ব্বাসার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতে যাহা উল্লেখ আছে, তাহা নিম্নে লিখিতেছি—

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥

মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্‌।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদ-সরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরোহৃষিকেশ-পদাভি-
বন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে নতু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া
রাতঃ॥

সুতরাং বৈধীভক্তি ক্রমিক উন্নতির দ্বারা দাস্য, সখ্য এবং আত্ম-নিবেদন পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। দাস্য, সখ্য ও আত্ম-নিবেদন, এই তিনটী প্রেমভক্তির অন্তর্ভুক্ত। বৈধী-ভক্তি যখন চরমসীমায় উপনীত হয়, তখন প্রেম রাজ্যের আভাষ আসে, তখন কতক প্রেম কতক ভক্তি এই ভাবে জড়িত থাকে। এই জন্যই বোধ হয় এই তিনটীও বৈধী ভক্তির শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ভক্তির ক্রমিক বিকাশ শ্রীশ্রীরায় রামানন্দ ও শ্রীশ্রী৺মহাপ্রভুর সংবাদে বিস্তারিত-রূপে লেখা হইবে। এখানে আর সে বিষয়ের বিশেষ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভক্তির প্রথম অবস্থায় শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা আরম্ভ হয়। ভক্ত যখন প্রেম রাজ্যে গিয়া পড়েন, তখন ভক্ত আর বিধির অধীন থাকেন না। একেবারে চরমসীমার একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—এই শ্লোকে নামের মহিমাও কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এবং ব্রতস্বপ্রিয়-নাম-কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত
উচ্চৈহসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্ নৃত্যতি
লোকবাহ্যঃ। ইত্যাদি

মুরারিগুপ্তের একটী গান উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা দ্বারাও প্রেমেতে মানুষকে কি করিয়া তোলে তাহা বুঝিতে পারিবেন। গানটী এই—

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর সুধাও।
নয়নপুতলী করি লইনু মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি আগুন জ্বালি সকলি পোড়ায়নু
জাতি কুল শীল অভিমান।
না জানিয়া মূঢ় লোকে কত কি না বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোতের বিথার জলে এ তনু ভাসায়নু
কি করিবে কুলের কুক্কুরে।
খাইতে শুইতে আর নাহি লয় চিতে
কানু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপ্তে কহে পিরীতি এমতি হ'লে
তার গুণ তিন লোকে গায়।

এই গানটী দ্বারা ভক্তির একটা অবস্থা বর্ণিত হইতেছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ এই অবস্থাকে প্রেমের অবস্থা বলেন।

তাঁহাদের মতে প্রেমের স্থান জ্ঞানের উপরে। শ্রীমদ্-ভাগবতেও জ্ঞানের অবস্থার পরেই প্রেমের অধিকার বর্ণিত হইয়াছে। শুকদেব যখন জ্ঞানের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন বেদব্যাস তাঁহাকে গোপী ধর্ম্ম বলিবার উপযুক্ত পাত্র বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আবার বেদান্তমতে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে। এ বিষয়ে তারতম্য করিবার অধিকার আমার নাই—প্রয়োজনও নাই। তুলসীদাস জ্ঞান ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—জ্ঞান পিতা, ভক্তি মাতা, ইহার কে বড়, কে ছোট কিছুই বলিতে পারি না— জ্ঞান পিতারি, ভক্তি মাতারি, দুনো পাল্লা ভারী। তুলসীদাস একজন পরম ভক্ত। ইঁহার একটী দোহা উল্লেখ করিতেছি, যাহা দ্বারা বৈধী ভক্তির অনেকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারে।—

হরি সে লাগি রহরে ভাই
(তেরি বিগারা) বনেত বনেত বনি যাই।
রাঙ্কা তরে বাঙ্কা তরে তরে সুধন কষাই
সুয়া পড়াকে গণিকা তরে তরে মীরা বাই।
দৌলত দুনিয়া মালখাজানা বেনিয়া বয়েল চড়াই
এক বাৎমে ঠাণ্ডি হো যায় খোজ খবর নাহি পাই
এইসা ভকতি কর ঘট ভিতর ছোড়ে কপট চতুরাই
সেবা বন্দনা অউর দীনতা সহজে মিলয়ে গোঁসাই।

তুলসীদাস ভগবানের দাস্য ভাবের ভক্ত ছিলেন। যেমন ত্রেতাযুগে হনুমান শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন; তুলসী-দাসেরও সেই ভাব, ইনিও শ্রীরামচন্দ্রের ভক্ত ছিলেন। হনুমান ইঁহার গুরু এইরূপ জনপ্রবাদ আছে। প্রহ্লাদ, অম্বরীষ, বলি, অর্জ্জুন—ইঁহারা নববিধা ভক্তির ভাব লইয়াই কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন। কথিত হইয়াছে তন্মধ্যে অম্বরীষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সেবা দ্বারা, প্রহ্লাদ দাস্য ভক্তি দ্বারা, বলি আত্মনিবেদনে, এবং অর্জ্জুন সখ্যে ভগবানকে লাভ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুগণের ভিতরেও অনেকে বৈধী-ভক্তির ভাবের সেবা করিতেন---তন্মধ্যে প্রধান দৃষ্টান্তের স্থল হরিদাস। তিনি কেবল হরিনামকীর্ত্তনের দ্বারাই সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। মৃত্যু পর্য্যন্তও তিনি বিধি-ত্যাগ করেন নাই—ইহার উদ্দেশ্য তাঁহার নিজের উদ্ধারের জন্য নয়, জীব শিক্ষার জন্য। নাম জপিয়া তিনি নামের মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন—দেখাইয়াছেন নামের কি অদ্ভুত শক্তি; ইহা কেবল পাপ হরণ করে তাহা নয়, প্রেমও আনিয়া দেয়। বিধিমার্গ অবলম্বন করিয়া তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার নাম ব্রহ্ম-হরিদাস বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। নামের দ্বারা যে প্রেম হয়, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গান উদ্ধৃত করিতেছি।

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ।
নাহি জানি কত মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে অঙ্গ অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে।

এই গানটী দ্বারা বুঝিলাম নামই প্রেমের পথ-প্রদর্শক, অকুল সমুদ্রে ধ্রুবতারা।

এই নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা চরিতামৃত গ্রন্থে লেখা হইয়াছে, তাহা পাঠকবর্গকে শুনাইতেছি।

সাধনমার্গের প্রথম সোপানে আরোহণ করিতে হইলে নাম একমাত্র সম্বল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ শাস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

তৎপর, কেবল নাম করিলে হইবে না, কেমন করিয়া নাম করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

নিজকে তৃণ হইতেও ক্ষুদ্র মনে করিতে হইবে, বৃক্ষ হইতেও সহিষ্ণু হইতে হইবে, অমানী হইতে হইবে, এবং

অপরকে মান দান করিতে হইবে—এই ভাবে নাম করিলে হরিনামের প্রকৃত ফললাভ হইবে

নাম সংকীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থনাশ।
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস ॥

মহাপ্রভুর নিজকৃত শ্লোক।

চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং।
চেতঃকৈরব-চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্।
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥

বৈধী-ভক্তি এবং প্রেমভক্তি উভয়েরই একটী দুইটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিলাম। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। এই উভয় ভক্তির মধ্যস্থলের যে অবস্থা, তাহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। এই অবস্থা পর্য্যন্তও, ভক্ত একেবারে আত্মহারা হয় না, জীয়ন্তে মরে না, আমিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয় ন। এই অবস্থায় ভক্ত কখনও প্রেমেতে বিহ্বল হয়..আবার তাহাকে বিধির সংস্কারেতে জাগাইয়া রাখে। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির দৃষ্টান্ত খুব অল্পই আছে। রায় রামানন্দ সংবাদে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির একটী শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে—

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাং ॥ (গীতা)

সর্ব্বভূতেতে ব্রহ্মজ্ঞান, সদা প্রসন্নচিত্ত, কোন দুঃখ বা আকাঙ্ক্ষা থাকে না, সমস্ত প্রাণীতে সমজ্ঞান হয়। ইতঃপর পরাভক্তি লাভের অধিকারী হয়।

ইহার পরস্তরেই ভক্ত একেবারে ডুবিয়া যায়,—তাই মুরারি গুপ্ত বলিয়াছেন—

"স্রোতের বিথার জলে এ তনু ভাসায়নু,
কি করিবে কুলের কুকুরে।"

এই মর্ম্মে চণ্ডীদাসেরও একটী গান উদ্ধৃত করিতেছি—

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ!
দেহ মন আদি তোঁহারে সঁপেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীন
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতি রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তুহারি পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন ভায়॥

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমারি লাগিয়া কলঙ্কেরি হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী, তোমাতে বিদিত,
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপ পুণ্য সম
তোহারি চরণ খানি॥

নিধু বাবুর গানে আছে—

ননদিনী বলগে নগরে নগরে।
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে॥
কাজ কি বাসে, কাজ কি বাসে, কাজ কিবা সে পীতবাসে।
সে যাহারে ভালবাসে, সে কি বাসে বাস করে॥
কাজ কি গোকুল, কাজ কি গোকুল, ব্রজকুল সব হউক প্রতিকূল।
আমি সপেছি গো কুল অকুল কাণ্ডারীর করে॥

প্রেমের চরম সীমা রাধা-প্রেম। রাধা নিজে ভক্ত-স্থানীয়া হইয়া কিরূপ ভাবে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী হইতে হয়, তাহা নিজে উন্মাদিনী হইয়া দেখাইয়াছেন। কেবল উন্মাদিনী নয় প্রেমে যে মরিতে হয়, তাহাও দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণ বিরহ প্রেমের চরম সীমা। কৃষ্ণ বিরহের মুর্ম্মুর দাহে

রাইয়ের যে কি দশা হইয়াছিল তাহা চণ্ডীদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

বিরহ কাতরা বিনোদিনী রাই পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায়, কহিনু তোহারি কাছে।
যদি দেখিবে তোমার প্যারী,
চল এইক্ষণে রাধার সপথ্ আর না করিও দেরী।
কালিন্দীপুলিনে কমলের সেজে রাখিয়া রাইয়ের দেহ,
কোন সখী অঙ্গে লিখে শ্যাম নাম, নিশ্বাস হেরয়ে কেহ।
কেহ কহে তোর বঁধুয়া আসিল, সে কথা শুনিয়া কানে
মেলিয়া নয়ন, চৌদিশে নেহারে—দেখিয়া না সহে প্রাণে।
যখন হইনু যমুনা পার দেখিনু সখীরা মেলি—
যমুনার জলে রাখে অন্তর্জ্জলে রাই দেহ হরি বলি।
দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব ঝাট চল ব্রজে যাই
বলে চণ্ডীদাস বিলম্ব হইলে আর না দেখিবে রাই।

শ্রীগৌরাঙ্গদেব রাধাভাবেতে এই কৃষ্ণবিরহবেদনা যে কি জিনিষ তাহা নিজে রাধা হইয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন। তাঁহার সেই বিরহের ভাব দেখিলে, এবং তাঁহার সেই বিরহিনীর দুঃখপূর্ণ মুখ দর্শন করিলে সমস্ত ভক্তের হৃদয় সেই দুঃখে ফাটিয়া যাইত। গম্ভীরা লীলায় এ বিষয় বিস্তারিত বর্ণিত হইবে।

এখন জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব। জ্ঞান বলিতে এখানে আত্মতত্ত্বজ্ঞান আলোচনা করিব। জ্ঞান হৃদয়ের একটী বৃত্তিবিশেষ; ইহা দ্বারা পরমাত্মারূপী পরমেশ্বরকে জানা যায়। যতদিন পর্য্যন্ত এই জ্ঞানলাভ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের হৃদয়স্থিত পরমব্রহ্ম পরমাত্মাকে জানিতে পারিব না। এখন ইহাকে উদ্বোধন করাই জীবের প্রধান কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে লিখিয়াছি—

"প্রয়োজনন্তু তদৈক্য-প্রমেয়-গতাজ্ঞান-
নিবৃত্তিঃ তৎস্বরূপানন্দাবাপ্তিশ্চ।"

বেদান্তবিদ্ বেদান্ত লিখিতে গিয়া তিনটি বিষয়ের প্রথমতঃ আলোচনা করিয়াছেন—বিষয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন। জীবব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচৈতন্যং প্রমেয়ং। জীব এবং ব্রহ্মের একত্ব, অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম যে এক বস্তু তাহা প্রমাণ করাই বেদান্তের বিষয়। বোধ্য-বোধক-ভাবঃ সম্বন্ধঃ। গ্রন্থের সহিত ব্রহ্মের বোধ্য বোধকভাব—সম্বন্ধ।

জীবব্রহ্মে একত্বের প্রতিবন্ধক অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং তৎস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ যে আনন্দ তাহাকে লাভ করা—এই প্রয়োজন। জীবের ব্রহ্মত্ব লাভ—ইহা জীবের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছিতে গেলেই প্রতিবন্ধক-স্বরূপ যে অজ্ঞান রহিয়াছে, তাহাকে সরাইতে না পারিলে লক্ষিত স্থলে পৌঁছা যায় না। যদিও আমার অজ্ঞান নিবৃত্তির কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু প্রতিরোধীকে

নিবৃত্তি করিতে না পারিলে, উদ্দেশ্য সাধন হয় না; কাজেই অজ্ঞানের নিবৃত্তিও প্রয়োজন হইয়া উঠিল। যেমন কোন রাজা যদি অন্য কোন রাজার সম্পত্তি গ্রহণ করিতে চান, তাহা হইলে রাজ্যাধিকারই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য; বিরোধীয় রাজাকে পরাজিত করিতে না পারিলে, রাজ্য হস্তগত হয় না, সুতরাং প্রতিদ্বন্দ্বীর পরাজয় প্রয়োজন হইল। এখানেও সেইরূপ অজ্ঞানই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাকে নিবৃত্তি করিতে না পারিলে লক্ষ্যেতে পৌঁছিতে পারি না; তজ্জন্যই নানারূপ আয়োজন করিতে হয়। কোন রাজ্য আক্রমণ করিতে হইলেই সেই দেশের অবস্থা রীতি-নীতি অভিজ্ঞ ব্যক্তির মন্ত্রণার প্রয়োজন;—এই দেশও যিনি লাভ করিতে চান, তাঁহারও এই দেশের অভিজ্ঞ লোক চাই। এই দেশের লোকবেদ-পারগ গুরু। তিনি মন্ত্র দিবেন, তিনিই সমস্ত রীতি-নীতি স্বরূপ যে বেদবেদান্ত উপনিষদাদি শাস্ত্র—তাহা উপদেশ করিবেন; তখন শিষ্য সেই গুরুর মন্ত্রণা দ্বারা রণে মায়ারূপ শত্রু হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন—এই যুদ্ধের অস্ত্র। সঙ্ক্ষেপতঃ ইহাকে প্রাণায়াম সাধন বলা যায়। প্রাণায়ামের শাস্ত্রোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি—

ইড়য়া পূরয়েৎ বায়ুং মুঞ্চেদ্ দক্ষিণয়ানিলং।
যাবৎ শ্বাসং সমাসীনঃ কুম্ভয়েত্তং সুষুম্নয়া॥

যাবদ্ যোগী পদ্মাদ্যাসনে উপবিশ্য যোগমভ্যস্যতি তদা গুল্ফাভ্যাং গুহ্যমূলং নিষ্পীড্য খেচরীমুদ্রা-সাহায্যেন প্রাণ-ধারণয়া সুষুম্না-মার্গেণ মূলাধারাৎ কুণ্ডলিনীমুত্থাপ্য স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরকানাহত-বিশুদ্ধাজ্ঞাখ্য-ষট্‌চক্রভেদক্রমেণ সহস্র-দল-কমল-কর্ণিকায়াং বিদ্যমান-পরমাত্মনা সহ সংযোজ্য তত্রৈব চিত্তং নির্ব্বাত-দীপবদচলং কৃত্বা আত্মানন্দরসং পিবতি।

এখন পাঠককে প্রথমতঃ ঐ যুদ্ধের ক্যাম্প্ কোথায় বলা দরকার। আক্রমণকারীর ক্যাম্প্ শরীরস্থ মূলাধার চক্রে। প্রতিদ্বন্দ্বীর দুর্গ বহুতর, তন্মধ্যে প্রধানতম দুর্গ ছয়টী—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাখ্য। এই সব দুর্গ আক্রমণ করিয়া সহস্র দলে পৌঁছিতে হইবে। সহস্র দলে পৌঁছিবার রাস্তা তিনটী—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। এই রাস্তা নির্ব্বাচন, যিনি এই ব্যাপারের কাপ্তান হইবেন, তাঁহার বিবেচনাধীন। সুষুম্না মধ্যবর্ত্তী পথ—অপর দুই রাস্তা ইহার দুই দিকে। মূলাধারে যিনি ক্যাম্প্ করিয়াছেন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী স্থলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। তিনি ঐ দরজার প্রহরী স্বরূপা; তিনি অচৈতন্য অবস্থায় থাকেন। তাঁহার ত্রিবলি-বেষ্টিত সর্পাকার দেহ। ইহাকে পূজা দিয়া সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে, জয়ের কোন আশা নাই; সুতরাং প্রথমতঃ ইহাঁর প্রীতিসাধন করাই যুদ্ধার্থী সাধকের কর্ত্তব্য। ইনি সুপ্রসন্ন হইলে, মূলাধার হইতে স্বাধিষ্ঠান দুর্গে যাত্রা করিতে হইবে। প্রত্যেক দুর্গেই এক

বৎসর, দুইবৎসর, কি কাহার দুর্ভাগ্যবশতঃ, দশ বৎসরও হইতে পারে। এই যুদ্ধের সৈন্য ইন্দ্রিয়গণ—ইহাদিগকে বশে রাখাও বিশেষ কৌশলের প্রয়োজন। অনেক সময় সৈন্যদলের ভিতরে বিদ্রোহী হওয়াতে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। ইহাদের চালক মন, ও মনের চালক বুদ্ধি। ঐ রাজ্যের প্রধান নগর সহস্রার। সহস্রারে পৌঁছিলেই সব গোল চুকিয়া যায়। তখন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হয়, তখন হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে তস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

এ বিষয়ের প্রারম্ভেই কিছু জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনা করা হইয়াছে ; আর একটু বিশদরূপে প্রকাশ করিবার জন্য, আর একটী গল্পের অবতারণা করিতেছি। অনাহতপুরে সঞ্জীব চন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অতি ধার্ম্মিক, সরল ও বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার এক বিশ্বাসী মন্ত্রী ছিল, তাঁহার নাম জ্ঞানবন্ত। সেই মন্ত্রীর আর দুই জন সাহায্যকারী কর্ম্মচারী ছিল—তাহাদের নাম বিবেকরাম ও বিশ্বাসরাম। ইহাদের অধীনে অন্যান্য কর্ম্মচারী, সৈন্য সামন্ত, লোকজন পরিচালিত হইত। এ মন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্য অতি সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছিল। এ রাজ্যের উন্নতি দেখিয়া অন্যান্য রাজাগণ অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। মন্ত্রী

সকল সময়েই বিশেষ সতর্কতার সহিত রাজাকে রক্ষা করিতেন। রাজা স্বভাবতঃ ভাল মানুষ; কিন্তু তাঁহার দোষ এই যে, যে যাহা বলে, তাহাই বিশ্বাস করেন, এইজন্য তাঁহার উপর সহজেই আধিপত্য করিতে পারা যায়। এই জন্য মন্ত্রী সকল সময়েই সতর্ক থাকিতেন, কোন্ সময়ে কুলোক আসিয়া রাজার মন বিগড়াইয়া দেয়। ঐ রাজ্যের নিকটবর্ত্তী মায়াপুর নামে এক রাজ্য ছিল। তাহার রাণীর নাম মায়াবতী। তিনি অতি প্রখরা, বুদ্ধিমতী ও বিষয় কার্য্যে অতি নিপুণা। তিনি স্ত্রীলোক হইয়াও বুদ্ধি-কৌশলে অনেক পুরুষকে পরাভব করিতেন, এবং তাঁহার মন্ত্রীর নাম ছিল অহঙ্কার-চূড়ামণি। মায়াবতীর অনেক সহচরী ছিল, তাহারাই অনেক কাজ নির্ব্বাহ করিত। তাঁহার সহচরীর নাম—কামনাসুন্দরী, বিলাসিনী, কুমতি, জটিলা, কুটিলা, রতি এবং এইরূপ আরও অনেক সহচরী ছিল। এক সময়ে এই রাণীর, সঞ্জীব রাজার রাজ্য আক্রমণ করার ইচ্ছা হইল। রাণী দেখিলেন—রাজাকে প্রকাশ্য ভাবে যদি আক্রমণ করি, তাহা হইলে সুবিধা হইবে না এবং বহুলোক-ক্ষয় হইবে। তিনি রাজার নিকটে গুপ্তচর পাঠাইয়া, তাঁহাকে বাধ্য করা নিরাপদ মনে করিলেন। তবে এমন ভাবে লোক পাঠাইতে হইবে যাহাতে মন্ত্রী জ্ঞানবন্তও বুঝিতে না পারেন যে, তাঁহাদের শত্রুপক্ষীয় কোন লোক আসিয়াছে। তখন তিনি অহঙ্কার-চূড়ামণি

মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন—তিনিও তাঁহার মতের প্রশংসা করিলেন এবং সহজে কর্য্যোদ্ধার করিতে পারিবেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলেন। তদনুসারে অহঙ্কার-চূড়ামণিকে, এবং রতি, বিলাসিনী, কামনা, সুন্দরী এই সমস্ত সহচরীকে Spy ভাবে নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের শক্তি ছিল, যত বড় বীর পুরুষই হউক না কেন, স্থিরপ্রতিজ্ঞ হউক না কেন, তাহাদের হাতে পড়িলে তাহাদিগকে হাতের ক্রীড়ার পুতুল বানাইতে পারিত। তাহারা এই কয়জন সজীব রাজার বাটীতে প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ মন্ত্রীও তাহাদের ছল বুঝিতে পারিলেন না—তিনিও তাহাদিগকে আপনার লোক বলিয়াই মনে করিলেন। ইহাদের মধ্যে অহঙ্কার-চূড়ামণি পারিষদ্ দলের মধ্যে মিশিলেন, এবং কামনা, বিলাসিনী, রতি, সুন্দরী এ কয়েকজন অন্তঃপুর-বাসিনীদের অন্তর্ভুক্ত হইলেন। কেহই ইহাদের চতুরতা বুঝিতে পারিল না। রতি, বিলাসিনী, সুন্দরী ইহারা নৃত্যগীতাদিতে এবং সৌন্দর্য্যে অন্য গায়িকা এবং নর্ত্তকী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা হইলেন। আবার বহির্ব্বাটীতে অহঙ্কার চূড়ামণিও পারিষদ্-বর্গের ভিতরে খুব অল্পদিনের মধ্যে রাজার অতি প্রিয়পাত্র হইলেন। রাজা ক্রমশঃ অহঙ্কার-চূড়ামণির সংসর্গে থাকিয়া, মন্ত্রী জ্ঞানবন্ত এবং তাঁহার সহচর বিবেকরাম ও বিশ্বাসরামের মন্ত্রণায় উদাসীনতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহারা এতদূর আধিপত্য বিস্তার করিল, যে তিনি বাহিরে যখন

আসেন, তখন অহঙ্কার-চূড়ামণি ব্যতীত অন্য কাহারও কথায় কর্ণপাত করেন না, এবং ভিতরে যখন থাকেন, তখন রতি, বিলাসিনী সুন্দরী ইহাদিগকে নিয়াই থাকেন। হইতে হইতে এইরূপ হইল যে, অহঙ্কার চূড়ামণি এবং রতি বিলাসিনীর কুমন্ত্রণায় মন্ত্রী জ্ঞানবন্ত এবং বিবেকরাম ও বিশ্বাসরাম তাঁহাদের অনুচরবর্গ সমেত রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইতে আদিষ্ট হইলেন। এই সংবাদ মায়াপুরে অবিলম্বে পৌঁছিল। মায়াবতী নিজের সমস্ত সৈন্য এই সময়ে তাঁহার রাজ্য মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন। মায়াবতীর সুকৌশলে বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে রাজা সঞ্জীবচন্দ্র বন্দী হইলেন। রাজা বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি বন্দী হইয়াছেন ;— বাস্তবিকও সৈন্য সামন্ত প্রহরী পরিবেষ্টিত রাখিয়া যে বন্দী করা, তাহা হয় নাই। তাঁহার মনকে সম্পূর্ণরূপে বন্দী করা হইয়াছে, তাঁহার বিবেককে বন্দী করা হইয়াছে, এবং জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে ; সুতরাং তিনি মায়াবতীর হাতের ক্রীড়ার পুতুল বই আর কিছুই নহেন। মায়াবতী তাঁহার সৈন্য সামন্ত দিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রাখিলেন যে, জ্ঞানবন্ত, বিবেকরাম ও বিশ্বাসরাম কোনমতে রাজার সহিত দেখা করিতে না পারেন, বা রাজবাটীতে না আসিতে পারেন ; এবং শূন্যমার্গে বৈদ্যুতিক আলোক সংযোগে যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারেন; তজ্জন্য সমস্ত নগর অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন। মায়াবতী বর্ত্তমান

airship, zeppolin প্রভৃতির খবর না রাখিতে পারেন, কিন্তু কার্য্যতঃ বুঝা যায় যে, ঐরূপ কোন যন্ত্র তখন ছিল, যাহাতে শূন্যমার্গে প্রবেশ করা যায়। এখন যেরূপ লণ্ডন নগর অন্ধকারাচ্ছন্ন, অনাহত পুরীও সেইরূপই অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইয়াছিল ; লণ্ডন নগর কেবল রাত্রে অন্ধকার করা হয়, কিন্তু অনাহতপুরী দিবা রাত্রই অন্ধকারাচ্ছন্ন করা হইয়াছিল। মন্ত্রী জ্ঞানবন্ত দেখিলেন, এখন তাঁহার কৌশল অবলম্বন করিয়াই পুনরায় রাজার নিকট পৌঁছিতে হইবে। এই জন্য বিবেকরাম ও বিশ্বাসরামকে নিযুক্ত করিলেন। এ দিকে অনেক দিন গত হইলে, মায়াবতীর বিশ্বাস হইল যে রাজা এবং মন্ত্রী কেহই আর কিছু করিতে পারিবেন না। এই বিশ্বাসেতে তিনি শিথিলপ্রযত্ন হইলেন। এরূপ সকলেরই ঘটিয়া থাকে। রাজারও বহুদিন এইরূপ ভোগের পর, ভোগের লালসা অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হইয়া আসিল। সকল কর্ম্মেরই একটা প্রতিক্রিয়া (reaction) হয়—বহুদিন ভোগ করিয়া ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয়। সঞ্জীবচন্দ্রেরও তাহাই ঘটিল। মায়াবতীর প্রহরীরা আর সেরূপ পাহারা দেয় না। সুযোগ পাইয়া বিবেকরাম ও বিশ্বাসরাম শূন্যপথে ভিক্ষুকের বেশে সঞ্জীবচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বিবেকরাম শঙ্করাচার্য্যের মোহমুদ্গর আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন।—

"মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।
যল্লভসে নিজ-কর্ম্মোপাত্তং বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তং ॥
নলিনীদলগত-জলমতিতরলম্ তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা ॥
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডং।
করধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডং তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডং ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবৎ তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥
যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজ-পরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর-দেহে বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥
পুনরপি জননং পুনরপি মরণং পুনরপি জননী-জঠরে শয়নং।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥
যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে ॥

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যংনাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যং।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥
কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোঽহম্
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকনিগূঢ়াঃ॥
সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥
শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং বাঞ্ছস্যচিরাদ্ যদি বিষ্ণুত্বং॥
ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং" ॥

ইহার পর বিবেকরাম বলিতেছেন—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী রঘুপতেঃক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃস্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমশ্চার্য্যমতঃ পরং॥
শ্বঃ কার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্ণে চাপরাহ্ণিকম্।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য ন বা কৃতম্॥

বিশ্বাসরাম বলিতেছেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরি সে লাগি রহরে ভাই।
(তেরি বিগারা) বনেত বনেত বনি যাই।
রাঙ্কা তরে বাঙ্কা তরে তরে সুধন কষাই॥
সুয়া পড়াকে গণিকা তরে তরে মীরা বাই।
দৌলত দুনিয়া মালখাজানা বেনিয়া বয়েল চড়াই।
এক বাৎসে ঠাণ্ডি হো যাই খোজ খবর নেই পাই॥
এইসা ভকতি কর ঘট ভিতর ছোড় কপট চতুরাই।
সেবা বন্দনা আউর দীনতা সহজে মিলয়ে গোসাঁই॥

ভয়ং ভয়ানামপহারিণি স্থিতে মনস্যনন্তে মম কুত্র তিষ্ঠতি।
যস্মিন্ স্মৃতে জন্মজরান্তকাদি-ভয়ানি সর্ব্বাণ্যপয়ান্তি তাত॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

এই সব কবিতা গ্রহণ করিয়াই সঞ্জীবচন্দ্রের ভাবান্তর উপস্থিত হইল, তাঁহার পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। কিন্তু মায়াবতীর অনুচরেরা মনে করিল, যেরূপ ভিখারীরা আসিয়া থাকে, ইহারাও সেই শ্রেণীর। তাহারা দুই এক পয়সা দিয়া ভিখারীদিগকে বিদায় করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহারা যাইবার লোক নহে। রাজাও তখন বুঝিতে পারিলেন যে, ইহারা তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত মন্ত্রী-সহচর। সময় হইলে এইরূপই হয়। "সময় ত যায়, বাবা খাইতে আস" (বাসনা জ্বালাইয়া দেও) এই কথা বলাতেই লালা বাবু ফকির হইলেন। এইরূপ কথা ত কতই শোনা যায়,

লালাবাবুও হয় ত পূর্ব্বে এরূপ কথা অনেক শুনিয়াছেন, কিন্তু তখন তাঁহার সেরূপ লাগে নাই। আজ কেমন সুসময়ে কথাটি পড়িয়াছে, মন পূর্ব্বেই প্রস্তুত হইয়াছিল, অমনিই প্রাণের ভিতর লাগিল। চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ করিতে লাগিল। সঞ্জীবচন্দ্রেরও আজ সেই অবস্থা। ভোগ করিয়া ভোগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হইয়াছে; এখন চায় প্রাণে নিবৃত্তি—সেই সময়েই ঐ সব শ্লোক বিবেক-রাম ও বিশ্বাসরামের মুখে শুনিতে পাইল, আর চৈতন্যের উদয় হইল। তখনই মায়াবতীর লোক বুঝিতে পারিল যে, সেই মন্ত্রীর সেই অনুচর উপস্থিত হইয়াছে, এবং রাজাকে বিগড়াইয়া ফেলিয়াছে। এদিকে রাজার ও বিবেকরামের ইঙ্গিতমাত্র মন্ত্রী জ্ঞানবন্ত সদলে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিলেন। মায়া-বতীর লোক অহঙ্কার-চূড়ামণি ও কামনা, বিলাসিনী প্রভৃতি ক্রমশঃ সরিয়া গেল, রাজ্যের ও রাজার পুনরুদ্ধার হইল। সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত সহর, নগর, গ্রাম আলোকে উদ্ভাসিত হইল—দুঃখের অবসান হইল, সকলে সুখ সাগরে ভাসিতে লাগিল— রাজ্য মধ্যে আবার পূর্ব্বরূপ বেদাধ্যয়ন, শাস্ত্রা-লোচনা আরম্ভ হইল। তখন সঞ্জীবচন্দ্র আর সে সঞ্জীবচন্দ্র নাই, তিনি তখন দীন হীন কাঙ্গাল, 'তৃণাদপি সুনীচেন' ভাবের মহিমা তাঁহার হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়াছে সুতরাং ব্রহ্মত্বলাভে আনন্দময় হইয়া গিয়াছেন। তিনি তখন প্রকৃত তত্ত্ব যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বং ততশ্চ সূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদাস্তেহন্তরাত্মাখ্যমতীব সূক্ষ্মম্॥
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদি-বিশেষণানামগোচরে যৎ পরমাত্মরূপং।
কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমস্তি তস্মৈ নমস্তে পুরুষোত্তমায়॥
নমোহস্তু বিষ্ণবে তস্মৈ নমস্তস্মৈ পুনঃ পুনঃ।
যত্র সর্ব্বং যতঃ সর্ব্বং যঃ সর্ব্বং সর্ব্বসংশ্রয়ঃ॥
সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥

অনন্তর, গ্রহ-নক্ষত্রাদি-সুশোভিত আকাশাদি সহিত বিশ্ব তোমার বৃহৎ রূপ, পয়োধি ও ভূধরাদি-সমন্বিত পৃথিবী তোমার অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মরূপ, জীবদেহ তাহা হইতেও সূক্ষ্ম—তদপেক্ষা তোমার সূক্ষ্মরূপ দেহান্তর্ব্বর্ত্তী অন্তরাত্মা, তদতিরিক্ত সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অগোচর, অচিন্ত্যনীয় পরমাত্মা স্বরূপ তোমার যে রূপ আছে, আমি সেই পুরুষোত্তম পরম ব্রহ্মকে নমস্কার করি। যেহেতু এই অনন্তদেব সর্ব্বময়, অতএব আমিই সেই ঈশ্বর, আমা হইতে বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, আমি জগন্ময়, অবিনশ্বর, আমাতেই জগত অবস্থিত। (জ্ঞানযোগ)

এত দিন সঞ্জীবচন্দ্র মায়ামোহে ভুলিয়াছিলেন, এখন মায়া কাটিয়া গেল। নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্বস্বভাব পরমানন্দাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তির উদয় হইল—জ্ঞানের

উদয় হইল, অজ্ঞানের পরাজয় হইল। এখন সঞ্জীবচন্দ্র বুঝিলেন, অহঙ্কার-চূড়ামণি যে, দেহেন্দ্রিয়ই আত্মা বুঝাইয়াছিলেন, তদনুসারেই তিনি এতদিন দেহের সেবা করিতেছিলেন। এখন তিনি বুঝিয়াছেন দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার কেহই আত্মা নহে, মায়ার চর। বাস্তবিক আত্মা—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সমস্তের অতীত—নিত্য চৈতন্য স্বরূপ। "অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে।" অহঙ্কার দ্বারা বিমুগ্ধ হইয়া লোকে নিজেকেই সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা মনে করিয়া থাকেন। সঞ্জীবচন্দ্রের দেহেতে যে অহংভাব ছিল, তাহা চলিয়া গেল। তখন বুঝিতে পারিলেন—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা একই জিনিষ; জীবাত্মা মায়াবচ্ছিন্ন আর পরমাত্মা মায়ামুক্ত—কিন্তু তত্ত্বতঃ একই জিনিষ। তাই পরীক্ষিৎকে শুকদেব শিক্ষা দিয়াছিলেন—

অহং ব্রহ্ম পরং ধাম ব্রহ্মাহং পরমং পদং। ইত্যাদি

(শ্রীমদ্ ভাগবৎ ১২শ স্কন্ধ)

এই উপদেশ পাইয়া, তিনি এবং দংশনকারী সর্প এবং পরমাত্মা তিনেতেই অভেদ জ্ঞান হইয়া তাঁহার মৃত্যুভয় তিরোহিত হইয়াছিল।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানা সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাৎ বিমুক্তঃ পরাৎ পরং পুরুষ-মুপৈতি দিব্যম্॥

(জ্ঞানযোগ উপনিষদ্)"

নদী সমুদায় যেমন তত্তন্নাম পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে মিশিয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানবান্ নাম-রূপ-দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মাভিমানাদি ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাতে মিশিয়া যান, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন। জীবাত্মা ব্যষ্টিরূপ ও পরমাত্মা সমষ্টিরূপ। এখন পাঠককে বুঝাইতেছি—সঞ্জীবচন্দ্র ইনি জীবাত্মা, অনাহতপুরীতে অর্থাৎ অনাহত চক্রে ইঁহার বাস; আর জ্ঞানবন্ত ইনিই জ্ঞান, দেহধারী হইয়া জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য গুরুরূপে প্রকটীভূত হইয়াছেন, আর গুরুরূপে ভিতরে থাকিয়া শিক্ষা দেন। অহঙ্কারচূড়ামণি ইনি অহঙ্কার; মায়াবতী মায়া, অবিদ্যা, সুতরাং মায়াপুরে তার বাস—অহঙ্কার, রতি, বিলাস ইত্যাদি মায়ারই কার্য্য। পরমহংসদেব বলিতেন, অহঙ্কার না গেলে, জ্ঞান আসে না, উঁচু ঢিবিতে জল আসে না। মহাপ্রভুও সেই জন্য "তৃণাদপি সুনীচেন" ইত্যাদি দ্বারা অহঙ্কার নিবৃত্তি হইলে, ভক্তির উদয় হয়, এই শিক্ষা দিয়াছিলেন। বৈষ্ণব-দর্শন অনুসারে জীব এবং পরমব্রহ্ম এক পদার্থ নয়। মহাপ্রভুও জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক হইতে পারে না বলিয়াছেন, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতকার উল্লেখ করিয়াছেন। বেদান্ত মতে জীব এবং পরমাত্মা একই পদার্থ—কেবল মায়া দ্বারা বিভিন্ন হইয়াছে।

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত হইয়াছে—

কাঁহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর।
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥

তথাহি, ভগবৎ-সন্দর্ভে ঃ—

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

আনন্দ ও সম্বিৎ-শক্তিযুক্ত ভগবান্ সচ্চিদানন্দ, আর জীব স্বীয় অবিদ্যাচ্ছন্ন হইয়া অশেষ ক্লেশ নিকর ভোগ করিয়া থাকে।

বিবেকরাম ও বিশ্বাসরাম—ইঁহারা বিবেক ও বিশ্বাস, ইঁহারা জ্ঞানের সহচর। পূর্ব্বে যে উল্লেখ করা হইয়াছে, সমস্ত স্থান অন্ধকারময় করা হইল—ইহার অর্থ জ্ঞান আলোক, মায়া অন্ধকার। জ্ঞানের অভাব হইলেই অজ্ঞানান্ধকারে সমস্ত আচ্ছন্ন হয়, তাই ঐরূপ কথিত হইয়াছে। এখন আমার বোধ হয়, জ্ঞান কি তাহা এক রকম বুঝিলাম।

এই যে জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল, তদনুসারে ব্রহ্মবস্তুই আরাধ্য। তাহা নিরাকার—"সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ব্রহ্ম"। আর, ভক্তি এবং কর্ম্মের কথা যে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহাতে সাকার এবং নিরাকার উভয় রূপেতেই ভগবানের উপসানা হইতে পারে। অধিকারী ভেদে উপাসনার প্রভেদ আছে। এই নিয়া বহুদিন হইতেই বাদানুবাদ চলিতেছে। তন্ত্র এই বিষয়ের একটা মীমাংসা করিয়াছেন। যথা মহেশ্বর বলিতেছেন—

স্ত্রীরূপাং বা স্মরেৎ দেবি পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে।
স্মরেদ্বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপিণম্॥

নেয়ং যোষিন্ন চ পুমান্ ন ষণ্ডোন জড়ঃ স্মৃতঃ।
তথাপি কল্পবল্লীব স্ত্রীশব্দেন চ যুজ্যতে॥
সাধকানাং হিতায়ৈব অরূপা রূপধারিণী।
চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ তন্ত্রপ্রদীপ

এই কথা দ্বারা বুঝা যায়, তিনি অরূপ হইয়াও ভক্তের নিকট ভক্তের বাঞ্ছিতরূপে দর্শন দেন।

কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি—যে বিষয়ের এতক্ষণ আলোচনা করা হইল, ইহার প্রত্যেকেই মুক্তিদান করিতে পারে, কিন্তু সহজ-সাধ্য কেহই নয়; তৎপরে ভাগ্যের সাপেক্ষ; শুনিতে পাই, তীর্থদর্শন দ্বারাতে সহজে ফললাভ হয়।

এখন আমাদের পক্ষে সকল অপেক্ষা কোন্ তীর্থ সহজে মুক্তিদান করিতে পারে, এবং কোন অবতার আমাদের মত পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য করুণার হস্ত প্রসারণ করিয়া কোলে তুলিয়া লেন, তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করিব। এই গ্রন্থের ইহাই উদ্দেশ্য। আমাদের মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য অনেক তীর্থ আছে, কিন্তু জ্ঞানলাভ না হইলে, কোন তীর্থ মুক্তিদ হন না। যথা—গঙ্গা বড়ই দয়াবতী, সমস্তকে উদ্ধার করিতেছেন; কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য জ্ঞান-গঙ্গালাভের প্রয়োজন; সুতরাং তাহা অনিশ্চিত। জ্ঞান লাভ না হইলে মোক্ষপ্রাপ্তির কোন আশা নাই। সুতরাং গঙ্গার

নিকট আমার মত জীবের মোক্ষপ্রাপ্তির আশা সুদুর্ল্লভ। ৺কাশীর কথাও ঐরূপ। স্কন্দপুরাণে জানিতে পারিলাম, উড্র দেশে সমুদ্রতীরে এক তীর্থ আছে, তাহার নাম পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। তাহাতে ভগবান্ নিত্য বাস করিতে-ছেন, এবং তাহাতে বাস করিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, এমন কি কাক মরিয়া সেখানে চতুর্ভুজ হইয়াছিল। সেখানে জাতিবিচার নাই। বিশ্বাবসু শবর জাতি হইয়াও ভগবানের কৃপা লাভ করিয়াছিল। সেখানে প্রসাদ ভক্ষণ করিলেই মহাপুণ্য হয়; অন্য জাতিস্পর্শেও সে প্রসাদ অগ্রাহ্য হয় না। এই সব গুণকীর্ত্তন থাকায়, অধমতারণের পক্ষে এই তীর্থকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া মনে হয়। এই তীর্থ যে পাপ-তাপ-হারণ, অধমতারণ তাহা বিবেচনা করিতে হইলে, তাহার মাহাত্ম্য কিরূপ রহিয়াছে, তাহা প্রথমে বিবৃত হওয়া উচিত। তাহা হইলে সকলের শুনিবার জন্য প্রবৃত্তি এবং বিশ্বাস জন্মিবে। তজ্জন্য এইখানে মাহাত্ম্যসূচক কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

যথা মুক্তিচিন্তামণৌ পদ্মপুরাণে—

যঃ পশ্যেত্তমজং কৃষ্ণং সর্ব্বচাক্ষুষগোচরং।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তো যাতি সাযুজ্যতাং হরেঃ॥
স এষ করুণাসিন্ধুঃ সিন্ধুতীরে শরীরবান্।
যথা তথা দৃষ্টিপথাদাচণ্ডালাৎ বিমুক্তয়ে॥

জন্মরহিত কৃষ্ণ, যিনি সকলের দর্শনের বিষয়ীভূত হইয়াছেন, সেই হরিকে দর্শন করিলে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। সেই যে করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সিন্ধুতীরে শরীর ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। আচণ্ডাল সমস্ত জীবদিগকে মুক্তিপ্রদান করিবেন বলিয়া এই জগন্নাথরূপী শরীর ধারণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আমরা দেখাইলাম তিনি পরম কারুণিক। তথাচ কপিল-দুর্ব্বাসঃসংবাদে ব্যাস উবাচ—

বস্তুস্বভাবো বিপ্রেন্দ্র দর্শনাৎ মোক্ষদায়কঃ।
যথার্কস্য প্রতপনং যথা চন্দ্রস্য শীতলং॥

এই শ্লোক দ্বারা বুঝা যাইতেছে, ইহা বস্তুরই স্বভাব যে, এই দারুময় মূর্ত্তি দর্শন করিলেই মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন। সূর্য্যের স্বভাব যেরূপ তাপ দেওয়া, চন্দ্রের স্বভাব যেরূপ শীতলতা প্রদান করা, এই দারুময় মূর্ত্তিরও মোক্ষপ্রদান বস্তু-শক্তি। "নহি বস্তু-শক্তিঃ বুদ্ধিমপেক্ষতে।"

তথা চ যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবচনং—

সঁ এব পরমানন্দঃজনবৎ চেষ্টতে জগৎ
দাদাত্যেব ধ্রুবং মুক্তিং দর্শনাৎ পাপকর্ম্মিণাং॥

তথাচ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে মোক্ষাধিকার-নির্ণয়ে বেদব্যাসং প্রতি উদ্দালকবচনং—

শ্রুত্বা ময়া নিদিধ্যাস্যং স্বরূপমাত্মনস্তথা।
যৎ সাক্ষাৎ-করণং প্রোক্তং তত্ত্বমুক্তি-স্বরূপকম্॥
তদনেক-জন্ম-সাধ্যং দুর্ল্লভং জন্মিনাং সদা।
শুকো বা বামদেবো বা মুক্ত ইত্যভিধীয়তে॥
তদেতন্মুক্তিদং ক্ষেত্রং মরণাদৌ ত্বয়োদিতং।
অর্থবাদস্বরূপঞ্চ এতন্মে সংশয়ো মহান্॥
সাক্ষাৎকারবলান্মুক্তি র্নাস্তীত্যেতন্মতং শ্রুতং।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বপি মুনে নিশ্চিতং ভারতাদিষু।
তৎ কথং মরণাল্লভ্যং ক্ষেত্রেঽস্মিন্ পুরুষোত্তমে॥

বেদব্যাস উবাচ—

গতাগতপ্রদং কর্ম্মমার্গং শ্রুত্যাদিচোদিতং।
তত্ত্বরূপং হি জানামি এতৎ ক্ষেত্রং বহিঃ স্মৃতম্॥
যথা সুগোপিতং ব্রহ্ম তথেদং ক্ষেত্রমুত্তমম্।
ক্ষেত্রং বিষ্ণোস্তু জানীহি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ॥
তথ্যং ব্রবীমি তে বিপ্র শ্রুত্বৈতদবধারয়।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বদাম্যাহতডিণ্ডিমম্॥
দক্ষিণোদধিতীরস্থং দারুব্রহ্মাবলোকিতং।
বিনা সাংখ্যমতং পুংসাং দর্শনান্মুক্তিদং ধ্রুবং॥
ইত্যয়ং দারুরূপীশো দর্শনাদপি মুক্তিদঃ।
কিং পুনস্তস্য চরণাভ্যাসে প্রাণান্ বিযোজয়েৎ॥

পদ্মপুরাণে শ্রীশ্রীভগবানুবাচ—

শ্রুতি-স্মৃতীতিহাস-পুরাণ-গোপিতং মম্মায়য়া যন্নহি কস্য গোচরম্।
প্রসাদতো মে স্তুবতস্তবাধুনা প্রকাশমায়াস্যতি সর্ব্বগোচরঃ॥
ব্রতেষু তীর্থেষু চ যজ্ঞদানয়োঃ পুণ্যং যদুক্তং বিমলাত্মনাংহি।
অহো নিবাসাল্লভতেঽত্র সর্ব্বং নিশ্বাসবাসাৎ খলু চাশ্বমেধিকম্॥

(মুক্তিচিন্তামণৌ)

তথাচ পদ্মপুরাণে—

ক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যে স্বেচ্ছাশনং দেবী মহাহবিষ্যং।
যোগেঽত্র নিদ্রা ক্রতবঃ প্রচারঃ স্তুতিঃপ্রলাপঃ শয়নং প্রণামঃ॥
পথি শ্মশানে গৃহমণ্ডপে বা রথ্যাপ্রদেশে ভুবি যত্র তত্র।
ইচ্ছন্ননিচ্ছন্ পুরুষোত্তমাখ্যে দেহাবসানে লভতে চ মোক্ষং॥

ব্রহ্মোবাচ—

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনং।
দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্॥
যা গতির্যোগযুক্তস্য বারাণস্যাং মৃতস্য চ।
সা গতির্ঘটিকার্দ্ধেন পুরুষোত্তমদক্ষিণে॥

ভগবদ্ বাক্যং—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব সুনিশ্চিতং।
ভক্ত্যা মমান্নং ভুক্ত্বা তু সান্নিধ্যং মম গচ্ছতি॥

একতঃ সর্ব্বতীর্থানাং যৎ ফলং পরিকীর্ত্তিতং।
তৎ ফলং সমবাপ্নোতি কৃষ্ণ সিদ্ধান্ন-ভোজনাৎ॥
কুক্কুরস্য মুখভ্রষ্টং মমান্নং যদি জায়তে।
ব্রহ্মাদ্যৈরপি তৎ ভক্ষ্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে

বায়ুপুরাণে—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ।
দুর্জ্জনেনাপি সংস্পৃষ্টং সর্ব্বমেবাঘনাশনং॥

মেদতন্ত্রে বৈষ্ণবান্ প্রতি নারদবাক্যং—

নাতঃ পরতরং নাম ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
ন গঙ্গাস্নানমেতাদৃক্ ন কাশীগমনং তথা।
জগন্নাথে তু সঙ্কীর্ত্ত্য নরঃ কৈবল্যমাপ্নুয়াৎ॥

বিষ্ণুযামলে নারদং প্রতি ভগবদ্-বাক্যং—

চিদানন্দময়ং ব্রহ্ম দারুব্যাজেন সংস্থিতং।
জীবভূতং জগন্নাথং মামবেহি কলিপ্রিয়ঃ॥
মামত্র যে প্রপশ্যন্তি দৃষ্ট্বা চাক্ষুষগোচরম্।
বিদধামীতি তন্মুক্তিমিতি মে নিশ্চয়া মতিঃ॥

গরুড়পুরাণে বেদব্যাস উবাচ—

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং তৎক্ষেত্রং ভগবত্তনুঃ।
সচ্চিদানন্দরূপং তদ্‌ব্রহ্ম দারব-দেহভৃৎ॥

যতো বিষ্ণোঃ শরীরং তৎ ক্ষেত্রং পরমদুর্ল্লভং।
তস্মাৎ শরীর-সংত্যাগাৎ পাপিনোঽপি ব্রজন্তি তং ॥
সংসার-মগ্নচিত্তানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্।
তাপত্রয়াভিভূতানাং বাসনাবদ্ধচেতসাম্ ॥
অন্যেষাং অন্ত্যজাতীনাং দর্শনান্মুক্তিদো বিভুঃ।
আস্তে তত্র জগন্নাথো দারুণা নির্ম্মিতোঽব্যয়ঃ ॥

জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা হইল। এখন ক্রিমিকীট পতঙ্গাদি যে পরমাগতি লাভ করে তাহার একটী প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি। শৌনকাদীন্ প্রতি ব্রহ্মোবাচ—

ক্রিমি-কীট-পতঙ্গাদ্যাস্তীর্য্যগ্‌যোনি-গতাশ্চ যে।
তত্র দেহং পরিত্যজ্য তে যান্তি পরমাং গতিং ॥

যে সকল শ্লোক উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা আমাদের আবশ্যকতা পূর্ণ হইল। প্রথমতঃ, দ্রষ্টব্য দারুময় ব্রহ্ম, যিনি নীলাচলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তিনি আমাদের মত পাপীকে উদ্ধার করিবেন কি না? প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ—

"স এষ করুণাসিন্ধুঃ সিন্ধোস্তীরে শরীরবান্।
যথা তথা দৃষ্টিপথাদাচণ্ডালাৎ বিমুক্তয়ে ॥"

ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিলাম তিনি করুণাসিন্ধু, আচণ্ডালকে বিমুক্ত করিবার জন্য তিনি সিন্ধুতীরে শরীর-

ধারী হইয়া অবস্থান করিতেছেন,—সুতরাং আমাদের কোনও চিন্তা করিবার কারণ নাই। ইতঃপরে যে সকল শ্লোক উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারা বলা হইয়াছে—তাঁহার দর্শনেই মুক্তি হয়, তাঁহার প্রসাদভক্ষণে মুক্তি হয়, তাঁহার নির্ম্মাল্যধারণে মুক্তি হয়, সেখানে বাস করিলে মুক্তি হয় এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিলেও মুক্তি হয়। পাপীদের উদ্ধারের পথ আরও সহজ করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়া বলিতেছেন, যথা—"ক্ষেত্রোত্তমে শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যে" ইত্যাদি। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যাহা ইচ্ছা আহার কর, মহাহবিষ্যের ফল হইবে; এখানে নিদ্রাতে যোগের ফল হয়, এখানে আলাপ করিলে বেদাধ্যয়নের ফল হয়, শয়ন করিলে জগন্নাথকে প্রণাম করিলে যে ফল, তাহা লাভ হয়, আর গৃহে হউক বা শ্মশানে হউক, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় মৃত্যুর পর মুক্তি অবধারিত। এরূপ সহজে মুক্তিলাভ অন্য কোন তীর্থ দিতে পারেন বলিয়া মনে হয় না। সমস্ত তীর্থ হইতে জগন্নাথ যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই সব শ্লোকেতে ইহাও পাইয়াছি যে, সাংখ্য যোগ দ্বারা যাহা লাভ হয়, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণোক্ত সাধন দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তৎ সমস্তই শ্রীজগন্নাথদর্শন দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। আমার মনে হয় শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা ত্রিমূর্ত্তি, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের প্রতিকৃতি। এই জন্য সুভদ্রা মধ্যস্থানে সন্নিবিষ্টা। কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞান যোগ দ্বারা

যাহা লাভ হয়, এই জগন্নাথ সেবা দ্বারা সেই ফললাভ হইয়া থাকে। শ্রীমুখদর্শনে, তাঁহার প্রসাদভোজনে এবং নির্ম্মাল্য গ্রহণে মন পরিষ্কার হইয়া অব্যভিচারিণী ভক্তির উদয় হয়। ভক্তি দ্বারা জ্ঞানের লাভ হয় এবং জ্ঞান হইতে মুক্তি হয়।

সর্ব্বপাপাবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুভক্তি-সমন্বিতঃ।
নির্ম্মলজ্ঞান-সম্পন্নস্ততো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥

সংক্ষেপতঃ, আমাদের যাহা প্রার্থিত, তাহা আমরা অতি সহজেই লাভ করিতেছি। ইহা অপেক্ষা সহজতর উপায় আর বোধ হয় হইতে পারে না। মহাপ্রভু যে হরিনামের পন্থা প্রচার করিয়াছেন, তাহাও ইহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হয়; সুতরাং তাঁহার যে হরিনাম কীর্ত্তন, তাহাও ইহারই অঙ্গীভূত।

এই যে প্রতিধ্বনির কথা উল্লেখ করিলাম, ইহার ভিতরে কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-লীলার মাহাত্ম্যশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে দেখিতে পাই, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য পাপী জীবকে উদ্ধার করা;—যাহার অন্য কোন উপায় নাই বা আশ্রয় নাই, তাহাকে একটা অবলম্বন করিয়া দেওয়া। সেই উপায়-জগন্নাথ নামকীর্ত্তন, প্রসাদ ভক্ষণ, জগন্নাথ দর্শন ইত্যাদি। এখন শ্রীগৌরাঙ্গলীলারও উদ্দেশ্য দেখিতে পাই, তিনি পাপী জীবের জন্য হরিনাম প্রচারের পন্থা প্রসারণ করেন।

পাপী উদ্ধার অংশে জগন্নাথদেবের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। ইহাতে মনে হয় যেন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবই পুনরায় এই গৌরদেহ ধারণ করিয়া জীব উদ্ধারে জন্য হরিনামপ্রচার এবং কৃষ্ণপ্রেমের নিগূঢ় তত্ত্ব, অর্থাৎ রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব এবং জগন্নাথতত্ত্ব সমস্ত দেখাইবার জন্য তিনি রাধার ভাব লইয়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়, এবং কৃষ্ণ ও জগন্নাথ যে এক বস্তু তাহা দেখাইয়াছেন।

যথা, চৈতন্য চরিতামৃতে—

গরুড়ের পাছে রহি করেন দর্শন।
দেখেন জগন্নাথ হয় মুরলী-বদন॥

দারুময় ব্রহ্ম এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব যে এক বস্তু, তাহা চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ উল্লেখ আছে।—

জগন্নাথ হয় কৃষ্ণের আত্মাস্বরূপ।
কিন্তু ইহা দারুব্রহ্ম স্থাবরের রূপ॥
তাহা সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ এক তত্ত্বরূপ দুইরূপ হঞা॥
সংসার তারণ হেতু যে ইচ্ছা শক্তি।
তাহার মিলনে কহি একতা প্রাপ্তি॥
সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গমরূপে কৈল অবতার॥

জগন্নাথ দরশনে খণ্ডায় সংসার।
সবদেশের সব লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব লোক নিস্তারিল জঙ্গম ব্রহ্ম হঞা॥

অবশেষে, সেই গৌর কলেবর জগন্নাথ দেহেতেই মিশিয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী ঘটনাদ্বারা এই অনুমান আরও দৃঢ়ীভূত হয়। ইহা আমার নিকট অনুমান হইতে পারে, কিন্তু প্রাকৃত তত্ত্বই এই। যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রধান সাক্ষ্য রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, শিখি মাইতি, মাধবী দাসী, স্বরূপ, দামোদর এবং বহুভক্তগণ। এই সব সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতে বিস্তৃতরূপে আলোচিত হইয়াছে; আমি তাহারই আভাষ মাত্র এখানে দিলাম।

অতএব, তাঁহাদেরই মাহাত্ম্য বর্ণন করা আবশ্যক মনে করিতেছি। এই উপলক্ষে জগন্নাথ নাম কীর্ত্তন হইবে, তাহাতেও ফলশ্রুতি আছে। যথা—

নাতঃ পরতরং নাম ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
ন গঙ্গাস্নানমেতাদৃক্ ন কাশী গমনং তথা।
জগন্নাথে তু সংকীর্ত্ত্য নরঃ কৈবল্যমাপ্নুয়াৎ

এখন

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥”

এই শ্লোকের সহিত ইহার বিরোধ মনে করিতে পারেন— কিন্তু তাহা নহে। এই “জগন্নাথেতি কীর্ত্তনাৎ” শব্দ বলা হইয়াছে ইহাদ্বারা হরি, কৃষ্ণ, জনার্দ্দন, বামন, হর, কালী ইত্যাদি সমস্ত নাম মাত্রেই বুঝিতে হইবে। হরি নামেতেও কেবল হরি নাম নয়, জগন্নাথ নামেতেও কেবল জগন্নাথ নয়—উপলক্ষণ বিধায় একটী নামের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদ্বারা কেবল নামকীর্ত্তনেরই গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে। এই হরি নামের যিনি প্রধান প্রবর্ত্তক—হরিনাম প্রচারের জন্য যিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া বহুপাপী উদ্ধার করিয়াছেন এবং হরিনামে সকলকে মাতাইয়াছেন; যিনি যুবতী ভার্য্যা, বৃদ্ধা মাতা এবং সুখের সংসার পরিত্যাগ করিয়া ডোর: কৌপিন ধারণ করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য অষ্টাদশবর্ষ পুরীধামে অবস্থান করিয়াছেন এবং দিবানিশি অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং সেই প্রেমের বণ্যায় রায় রামানন্দ, সার্ব্বভৌম, স্বরূপ, দামোদর, রাজা প্রতাপরুদ্র এবং পুরীবাসীদিগকে ভাসাইয়াছেন; যিনি জগন্নাথ ও শ্রীকৃষ্ণ যে একবস্তু আপনি দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন এবং তৎসম্পর্কে বহুলীলা জগন্নাথে করিয়াছেন, তাঁহার নাম এবং তাঁহার

লীলা জগন্নাথলীলার সহিত সম্মিলিত না থাকিলে, প্রকৃত জগন্নাথলীলা মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ বর্ণিত হইল, বলিয়া আমি মনে করি না, সেই জন্য এই সঙ্গে নদেবিহারী শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পুরীধামের লীলা উল্লিখিত হইল।

ভগবান্ পরম দয়াল, তাঁহার গুণ আমি আর কি কীর্ত্তন করিব। কেহই এ পর্য্যন্ত তাহার গুণ কীর্ত্তন করিয়া সীমা পান নাই। তাই পুষ্পদন্ত লিখিয়াছেন—

মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতি র্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ। ইত্যাদি

আবার লিখিয়াছেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥

(মহিম্নঃ স্তোত্র)

ইহা দ্বারা তাঁহার গুণের অপরিসীমত্ব দেখাইয়া ভক্তেরা তাঁহার কিরূপে পূজা করিবে ইহার ব্যবস্থা করিতেছেন; তাহা বেশ সুন্দর—

অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধিগৃণম্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর-নিরপবাদঃ পরিকরঃ।

অতীতঃ পন্থানং তবচ মহিমা বাঙ্‌মনসয়ো-
রতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদেত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ॥

পুষ্পদন্ত লিখিয়াছেন, তোমার স্তুতি কে করিতে সমর্থ? ব্রহ্মাদিরাও স্তুতি করিয়া তোমার গুণের পরিসীমা করিতে পারেন নাই, ঋষিগণও তোমার গুণবর্ণনে অসমর্থ। সিন্ধু যদি কজ্জলপাত্র হয়, গিরি যদি কজ্জল হয়, সুরতরু যদি লেখনী হয়, আর পৃথিবী যদি পত্র হয় এবং সারদা যদি অনন্তকাল বসিয়াও লিখিতে থাকেন, তথাপি তোমার মহিমার শেষ হইবে না। তোমার স্তব আমি কি করিব? যখন কাহারও স্তুতিই সিদ্ধ হয় না, তখন আমার স্তুতিও উপহাসাস্পদ হইতে পারে, কিন্তু তাহা তোমার উদ্দেশ্য নয়। স্ব স্ব জ্ঞানের সীমা অনুযায়ী যদি কেহ স্তব করে, তাহাই তোমার গ্রহণীয়। সুতরাং আমার যে স্তব তাহাও তোমার অগ্রাহ্য হইবে না।

এখন পুষ্পদন্তের উপদেশ অনুসারে আমাদেরও স্তব বা গুণ কীর্ত্তনের অধিকার বর্ত্তিল। এখন প্রার্থনা করি, ভগবান্, তুমি আমার এই স্তব এবং গুণকীর্ত্তন করিবার সহায় হও। যাঁর কৃপাতে মূকের কথা ফোটে, পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘন করিবার শক্তি জন্মে, সেই পরমানন্দরূপী ভগবানকে প্রণাম করিতেছি।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবং ॥

গ্রন্থারম্ভে গ্রন্থ নির্ব্বিঘ্নে সমাপন করিবার জন্য আর্য্য-ঋষিরা চিরদিন 'ওঁনমোঃ গণেশায়' বলিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়া থাকেন। এই সামান্য গ্রন্থের উদ্দেশ্য কেবল গ্রন্থ সমাপন নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথের নাম কীর্ত্তন; সুতরাং ওঁনমো গণেশায় বলিয়া জগন্নাথের স্তোত্র পাঠ করি, তাহাতে আমাদের উভয় কার্য্য সংসাধিত হইবে। প্রথমতঃ আমরা জগন্নাথের স্তুতিগান পাঠ করি। শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্র-মুখপদ্ম-বিনির্গত যে স্তব তাহাই অগ্রে পাঠ করা যাউক—

কদাচিৎ কালিন্দী-তটবিপিন-সঙ্গীতক-রবো
মুদাভীরী-নারী-বদন-কমলাস্বাদ-মধুপঃ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মা-সুরপতি-গণেশার্চ্চিতপদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়ন-পথগামী ভবতু মে ॥
ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবন-বসতি-লীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রসাদান্তে সহজ-বলভদ্রেণ বলিনা।

সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকল-সুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
কৃপাপারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণিরুচিরো
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখৈঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
পরব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধা-সরস-বপুরালিঙ্গনসুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে।
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কণক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।

অহো দীননাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

শেষ নিবেদন।

ভক্তপ্রবর পাঠক মহাশয়গণ, এ ক্ষেত্রে পাঠক এবং গ্রন্থকার উভয়েরই একই উদ্দেশ্য। আপনারাও চান ভগবানের পূজা করিতে, আমিও আপনাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পূজা করিবার জন্য নানা ফুল সংগ্রহ করিয়া সাজি পূর্ণ করিয়াছি। ভক্তগণ, আসুন আমরা এই ফুলের দ্বারা ভগবৎ চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেই।

বিনীত নিবেদক
শ্রীগোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী।

———o———
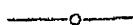
শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ

ওঁ নমো গণেশায় ।

প্রণাম । বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশা-কৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ।

(জয়দেব—গীতগোবিন্দ)

গান । মাধব বহুত মিনতি করি তোয় ।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমাপনু
দয়া নাহি ছোড়বি মোয় ॥
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
(জগ) বাহিরে নহি মুই ছার ॥
গণয়িতে দোষ (গুণ) লেশ নাহি পাওবি
তুঁহু যব করবি বিচার ॥
দেহ জনমিয়ে মানুষ পশু কিএ
অথবা কীট পতঙ্গ

করম বিপাকে গতাগতি পুনঃ পুনঃ
মতি রঁহু তুয়া পরসঙ্গে ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহে রসিকবর
তরয়িতে ইহ ভবসিন্ধু ।
এ ভব সায়র মাঝে আর যে তরণী নাই
বিনা তব চরণারবিন্দ ॥

(বিদ্যাপতি)

ব্রহ্মস্তোত্রম্‌ ।

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়
* নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায় ।
নমোঽদ্বৈত-তত্ত্বায় মুক্তি-প্রদায়
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায় ॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং
ত্বমেকং জগৎ-কারণং বিশ্বরূপম্‌ ।
ত্বমেকং জগৎ-কর্ত্তৃ-পাতৃ-প্রহর্ত্তৃ
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্বিকল্পং ॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং
গতিঃ প্রণিনাং পাবনং পাবনানাং ।
মহোচ্চৈঃ পদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাং ॥

পরেশ প্রভো সর্ব্বরূপাবিনাশিন্
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥
তদেকং স্মরামস্তদেকং ভজাম-
স্তদেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
সদেকং নিধানং নিরালম্বমীশং
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

নৈমিষারণ্যে ঋষিগণ কর্ত্তৃক সূতমুনির নিকট প্রশ্ন।

পূর্ব্বকালে পুণ্যক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিগণ অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যাসশিষ্য সূতমুনির নিকট শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্র বিবরণ শুনিতে ইচ্ছুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে যে—

উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজাক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥

তথাচ—

ভারতে চোৎকলে দেশে ভূস্বর্গে পুরুষোত্তমে।
দারুরূপী জগন্নাথঃ ভক্তানামভয়প্রদঃ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথ

U. RAY & SONS
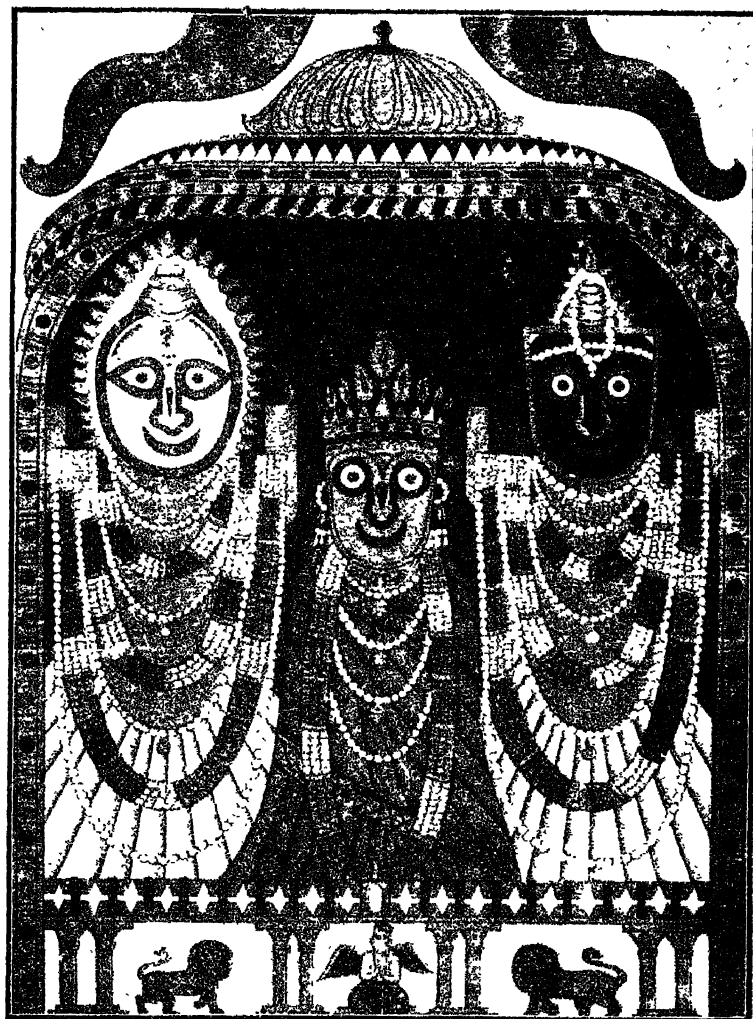
এই বর্ণিত পরম পবিত্র পুরুষোত্তম ক্ষেত্র এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্যের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হইবার জন্য আমরা আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। কৃপা বিতরণে ভগবান্ লক্ষ্মীপতি যে ভাবে যে লীলা করিয়াছিলেন তাহার সবিস্তার বর্ণন করিয়া আমাদের কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।

ব্যাসশিষ্য পরমভাগবত মহাত্মা সূত মুনিগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন, হে মুনিগণ! পরমপাবন শ্রীশ্রীজগন্নাথক্ষেত্রের বিষয় আমার ন্যায় ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিস্তারিত বর্ণন দুঃসাধ্য। স্বয়ং ব্রহ্মা চতুর্মুখে বহুবৎসর বর্ণন করিয়াও ইহার মাহাত্ম্য নিঃশেষ করিতে পারেন নাই, যথা ----

অহো ক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং সমন্তাদ্দশযোজনং।
দিবিষ্ঠা যত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্॥
সপ্ত সপ্তসু লোকেষু লোকালোকে চরাচরে।
নাস্তি নাস্তি সমং ক্ষেত্রং উত্তমং পুরুষোত্তমাৎ॥
মাহাত্ম্যমস্য তীর্থস্য বক্তুম্ বর্ষশতৈরপি।
ন সমর্থো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছথ॥

সুতরাং আমার ন্যায় অল্পজ্ঞান মনুষ্য ইহা কিরূপে বিস্তারিত বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? কিন্তু আপনারা শুনিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন, এবং আমিও ভগবদ্ধামের

বিষয় বর্ণন করিয়া পবিত্র হইতে পারিব ভাবিয়া সেই ভগবান বৈকুণ্ঠনাথের ভগবৎলীলা, যাহা পরম কারুণিক গুরুদেবের নিকট শুনিয়াছি, তাহা যথাসাধ্য বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন।

এক সময়ে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মায়ার শক্তি এবং তাহার স্বরূপ জানিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভগবান্ বলিয়াছিলেন, মায়ার যে কি স্বরূপ, তাহা এক সময়ে তোমাকে দেখাইব। মহাপ্রলয়াবসানে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ধ্যানভঙ্গে শিশুর ক্রন্দন শব্দের ন্যায় শব্দ শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, নিকটে বটবৃক্ষতলে একটী শিশু মুখ ব্যাদান করিয়া হাসিতেছে। শিশুরূপী ভগবান্ মহর্ষিকে দেখিয়া আহ্লাদ সহকারে কহিলেন—"এস"। এই বলিয়া শিশু মুখ বিস্তার করিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনি তাঁহার উদরে প্রবেশ করিয়া তন্মধ্যে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদিসমন্বিত ত্রিলোক দর্শন করিলেন। তথা হইতে নির্গত হইয়া স্তব করিতেছেন এমন সময় দৈববাণী হইল—"তুমি যে মায়া দর্শন করিতে চাহিয়াছিলে, তাহা দেখাইলাম।"

মার্কণ্ডেয়ং প্রতি শ্রীভগবদ্‌বচনং—

মুনে পুণ্যমিদং ক্ষেত্রং শাশ্বতং মে বিভাবয়।
ন সৃষ্টিপ্রলয়ৌ যত্র বর্ত্ততে নাত্র সংশয়ঃ ॥

মদেকরূপং পুরুষোত্তমাখ্যং মুক্তিপ্রদং মামিব সংপ্রবুধ্য।
তত্র প্রবিষ্টা ন পুনঃ প্রযান্তি গর্ভস্থিতং সান্দ্রসুখস্বরূপং॥

আমি এই বটবৃক্ষ নিকটস্থ নীলাচলে নীলমাধবরূপে অবস্থান করিব। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় দৈববাণী শ্রবণে, এই স্থানেই ভগবান্ আছেন জানিয়া, সেই স্থানে একটী সরোবর খনন করিয়া তাহার কূলে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কাজেই এই স্থান অতীব প্রাচীন এবং মহাপ্রলয়াবসান হইতেই এই স্থান ভগবদ্ধাম। সেই সময়ে এই স্থানটী সাধারণ মনুষ্যের অগম্য ছিল। দেবগণ স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়া পারিজাতাদি পুষ্প, অমৃত ও উপাদেয় নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভক্তিভাবে ভগবানের পূজার্চ্চনা এবং নৃত্যগীতাদি করিতেন। অতঃপর কেবল দেবতাদের সেবায় তৃপ্ত না হইয়া, অথবা জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইবার ইচ্ছা হইল।

রাজস্থানের অন্তর্গত মালবারে, বর্ত্তমান উজ্জয়িনী নগরে, পরমভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ প্রজাপালক পরম ধার্ম্মিক ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক রাজা ছিলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। তিনি ভগবৎ প্রাপ্তির নিমিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়াছিলেন। অশেষ শাস্ত্রবিশারদ বহুদর্শী ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন,— মহাত্মাগণ, আপনারা কৃপাপূর্ব্বক বলুন—কোথায় গেলে, কি

করিলে, সেই ত্রিতাপহারীর দর্শন লাভ হয়। পণ্ডিতগণ বলিলেন, মহারাজ, আপনার যখন ভগবৎ-লাভের জন্য এতদূর উৎকণ্ঠা হইয়াছে, তখন অবশ্যই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

ভক্তবৎসল ভগবান্ রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, বৃদ্ধ জটিল ব্রাহ্মণরূপে রাজসভায় প্রবেশপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ! আমি পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে দক্ষিণ সমুদ্রতীরে নীলাচলে অক্ষয়বট নিকটবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় মোহিনীকুণ্ড নামে একটী অতি পবিত্র কুণ্ড আছে। সেই স্থানে ভগবান্ নীলমাধব মূর্ত্তিতে পূর্ণভাবে বিরাজমান। তাঁহাকে দর্শন করিলেই সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।" এই কথা বলিয়াই তিনি অদৃশ্য হইলেন।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া, ভগবান এই বেশে আসিয়াছেন, মনে করিয়া, রাজা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বচক্ষে ভগবদ্দর্শন পূর্ব্বক, ভক্তিগদ্‌গদ স্বরে হরির স্তব করিয়া, ভগবৎস্বরূপ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কথিত স্থান নির্ণয় করিবার জন্য, তাঁহার পুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতি নামক জনৈক বহু-ভাষাবিৎ পণ্ডিতকে পাঠাইলেন।

বিদ্যাপতি বহুকষ্টে নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরবর্ত্তী, অরণ্যাকীর্ণ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। বহু অন্বেষণে বিশ্বাবসু নামক জনৈক শবরজাতীয় লোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই বিশ্বাবসু ব্যাধ

হইয়াও ভগবানের অত্যন্ত কৃপাপাত্র ও প্রিয় সেবক ছিলেন। তাঁহার নিকট নীলমাধব সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করিয়া, এই স্থানই, সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কথিত স্থান স্থির করিয়া, বিশ্বাবসুর সাহায্যে নীলমাধব দর্শন ও অতি উপাদেয় প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, দেবগণ-সেবিত নির্ম্মাল্য-মালা লইয়া বিদ্যাপতি স্বদেশে গমন করিলেন। তিনি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে পরম পবিত্রধাম জগন্নাথক্ষেত্রের বিস্তারিত বিবরণ অবগত করাইলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরোহিত প্রমুখাৎ শ্রীধামের বিষয় সবিশেষ অবগত হইয়া সপরিবারে পাত্র-মিত্র-বন্ধুবান্ধব-স্বজন-পরিবৃত হইয়া, পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রাভিমুখে শুভদিনে যাত্রা করিলেন। এমন সময় দেবর্ষি নারদ, হরিগুণ গান করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং রাজার পুরুষোত্তমে গমন সংবাদ শুনিয়া, এবং তাঁহার সহিত সাওয়ার জন্য ইন্দ্রদ্যুম্নের একান্ত ইচ্ছা জানিতে পারিয়া, পথপ্রদর্শকরূপে তাঁহার সহিত গমন করিলেন।

উজ্জয়িনী হইতে যাত্রা করিয়া, বঙ্গদেশ জনপদ অতিক্রম করিয়া বিরজাক্ষেত্রে বরাহরূপী ভগবানকে দর্শন, বৈতরণী-স্নান ও পিতৃগণের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া একাম্রকাননে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিন্দু সরোবরে স্নান করিয়া ভুবনেশ্বরদেবের পূজার্চ্চনা ও অন্যান্য দেবদেবী দর্শন করিয়া, তাঁহারা শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রাভিমুখে চলিলেন।

লীলাময়ের লীলা বুঝিবার শক্তি, যখন ব্রহ্মাদিরও নাই, তখন সামান্য মানব কিরূপে বুঝিবে। নীলাচলবিহারী নীলমাধব ভক্তবৎসল বটে, কিন্তু তিনি সহজে দেখা দেন না, এবং কর্ম্ম ভিন্ন তাঁহার দর্শন লাভ হয় না। বহুবিধ কর্ম্মের পর তাঁহার দর্শন লাভ হয়। ভগবান্ ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাকে দর্শন দিবেন স্থির করিয়াছেন;—কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম শেষ হয় নাই, কাজেই যে দিবস বিদ্যাপতি যাইয়া রাজাকে সংবাদ দিয়াছেন, সেই দিবসই ভগবান্ নীলাচল হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। প্রবল ঝটিকা আসিয়া নীলমণিময় স্থান বালুকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন পুরোহিত প্রদর্শিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেই, তাঁহার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে লাগিল। এই দুর্লক্ষণ দেখিয়া তিনি দেবর্ষি নারদের নিকট জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার কারণ কি? আমাকে শীঘ্র বলুন।" তখন মহর্ষি বলিলেন, "হে মহারাজ! স্বর্ণপদ্মাসনস্থ মণিময় নীলমাধব এই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।"

মালবাধিপতি এই সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র, ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায়, অজ্ঞান হইয়া ধূলায় পতিত হইলেন। চেতনান্তর নীলমাধবকে না দেখিয়া, শোকে, দুঃখে ও আশাভঙ্গে নিতান্ত মুহ্যমান হইয়া বালুকারাশির মধ্যে পতিত হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি কখনও বিদ্যাপতির প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন, কখনও বা

পাত্র, মিত্র, বন্ধু, বান্ধব সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমরা স্বরাজ্যে প্রস্থান কর, এবং তথায় যাইয়া আমার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া, তাহার আদেশানুসারে রাজ্যসংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে থাক। আমি এ দেহ আর রাখিব না ; এখনই হয় সমুদ্রে পতিত হইয়া, অথবা অনলে প্রবেশ করিয়া, কিম্বা তীব্র বিষ পান করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

দেবর্ষি নারদ, তখন রাজাকে বলিলেন, "হে মহারাজ! তুমি পরম জ্ঞানবান্ হইয়া, সামান্য লোকের ন্যায় বিচলিত হইতেছ কেন ; ধৈর্য্য ধারণ করিয়া আমার কথা শ্রবণ কর। পিতা ব্রহ্মা আমাকে যাহা বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা তোমার মঙ্গলকর। অতএব, ব্রহ্মার কথিত মত কার্য্য আরম্ভ কর, তাহা হইলেই তোমার মনস্কামনা অচিরে সিদ্ধ হইবে। যে দিন, ভগবান্ নীলমাধব এই স্থান হইতে শ্বেতদ্বীপে দারুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গমন করিয়াছেন, সেই দিনই, আমি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তোমার নিকট প্রেরিত হইয়াছি। অতএব, তুমি ব্রহ্মাদিষ্ট কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নারায়ণকে দর্শন করিতে পারিবে। তিনি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন,—তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। তুমি এইস্থানে শুদ্ধমতে শতাশ্বমেধ যজ্ঞ কর। তাহা হইলেই তুমি তাঁহার দর্শন পাইবে। তিনি তোমা কর্ত্তৃক দারুব্রহ্মরূপে স্থাপিত হইয়া, জগতের দুঃখী ও পাপী জীব সকলকে দর্শন দিয়া চরিতার্থ করিবেন। অতএব,

শোক পরিহারকরতঃ কার্য্যে ব্রতী হও; তাহা হইলেই অচিরে তোমার সকল কষ্টের অবসান হইবে।”

এই সময়, সহসা দৈববাণী হইল, “মহারাজ! তুমি দেবর্ষি নারদ বাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া, তাঁহার আদেশ মত কার্য্য নির্ব্বাহ কর। তাহা হইলেই তোমার অভীষ্ট পূর্ণ ও সমস্ত মঙ্গল হইবে। আমি দারুকলেবর ধারণকরতঃ তোমা কর্ত্তৃক এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তোমার বাসনা পূর্ণ করিব এবং চিরদিন জীবগণের নয়ন চরিতার্থ করতঃ, ভক্তবৎসল নামের সার্থকতা করিব ও তোমায় অমর করিয়া রাখিব।”

রাজা দৈববাণী শ্রবণ করিয়া, বাতাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় মুনির চরণে পতিত হইয়া, ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে, দেবর্ষির স্তব করিতে লাগিলেন। নারদ বলিলেন, “মহারাজ! আমার অনুসরণ কর।” মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তদনুসারে ভগবান্ নৃসিংহদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক বট-বৃক্ষস্থ নীলকণ্ঠ দেবকে প্রণাম করিলে পর, দেবর্ষি নারদ বলিলেন, “অক্ষয় বটের উত্তর পশ্চিমে স্বর্ণবালুকাময় স্থানে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ কর, এবং যত শীঘ্র পার শতাশ্ব-মেধ যজ্ঞে ব্রতী হও, যজ্ঞ সমাপন হইলেই, দারুরূপী ব্রহ্ম আগমন করিবেন। তুমি সেই কাষ্ঠরূপী ভগবানকে সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিবে। সূত্রধর রূপে বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া, ঐ বৃক্ষ দ্বারা সাতটী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন। ঐ সপ্তমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে, স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া ঐ মূর্ত্তি সকল স্থাপন ও

প্রতিষ্ঠা করিবেন। অতএব, তুমি ইহাতে নিঃসন্দেহ হইয়া ভক্তিভাবে গণেশাদি দেবতাগণের অর্চ্চনা ও নারায়ণ স্থাপন করিয়া শুভ কার্য্য আরম্ভ কর। মালবাধিপতি রাজা কাল বিলম্ব না করিয়া, তৎক্ষণাৎ অমাত্য, বন্ধু, বান্ধব ও পুরোহিতগণকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহার্থ আদেশ করিয়া, দেবর্ষির পদতলে বসিয়া, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্ বোধে সেবা পূজা করিতে লাগিলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যজ্ঞ সমাপনের দিবস শেষরাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার নিকটে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান্ লক্ষ্মী এবং হল-মুষল-ধারী বলরাম সহ উপস্থিত হইয়া আদেশ করিলেন—"নারদের বাক্য অনুসরণ কর, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।" স্বপ্নে অভীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া, মহারাজ আনন্দে অভিভূত হইয়া আছেন, এমন সময়ে নারদ আসিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। নারদ মহারাজকে তদবস্থ দেখিয়া ধ্যানে জানিলেন রাজার ভগবদ্দর্শন হইয়াছে। তখন তিনি রাজাকে লইয়া সমুদ্রতীরে গমনকরতঃ, মহা সমারোহে নানা দেবতার অর্চ্চনা করিয়া, নানারূপ উৎসব সহকারে দারুব্রহ্মকে যজ্ঞবাটীতে আনয়ন করিলেন।

যে দিবস দারুরূপী ভগবান্ যজ্ঞবাটীতে আসিলেন, সেই দিন মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন দেবর্ষি নারদকে বলিলেন, "প্রভো, দাসের প্রতি কৃপা করিয়া বলুন, এই ব্রহ্মরূপী কাষ্ঠ দ্বারা কে কিরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে।" নারদ বলিলেন, "তাঁহার

যে কি ইচ্ছা, তাহা কাহারও বলিবার শক্তি নাই। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে। তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না।"

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় দৈববাণী হইল, "মহারাজ, আগামী কল্য, এক বৃদ্ধ সূত্রধর যন্ত্রাদিসহ তোমার বাটীতে আসিবে, তুমি তাহাকে যত্নপূর্ব্বক মূর্ত্তিনির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, ১৫ দিন পর্য্যন্ত কপাট না খুলিয়া সর্ব্বদা প্রাঙ্গণে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশি, শিঙ্গা, মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা এই ১৫ দিবস পর্য্যন্ত উৎসবানন্দ করিবে। তৎপর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া যেরূপ মূর্ত্তি দেখিবে, তাহাই তাঁহার ইচ্ছারূপ মূর্ত্তি।"

তৎপরদিন, ভগবান্ বৃদ্ধ সূত্রধররূপে ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা ভক্তিসহকারে তাঁহাকে পূজন করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে দিয়া, দ্বার বন্ধ করিলেন; এবং যেরূপ আদেশ পাইয়াছিলেন, তদনুসারে উৎসবাদি করিতে লাগিলেন। পশ্চাত্তে দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলেন, সপ্তধা মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে—জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মাধব। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মাধব এই তিনটির কথা অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখ নাই। কিন্তু জগন্নাথের মন্দিরে এই সাতটী মূর্ত্তি এখনও দেখা যায়।

নীলমেঘকান্তি জগন্নাথ, ভক্তজনে অভয় দেওয়ার জন্য হস্তদ্বয় তুলিয়া আছেন। পদ্মাসনে স্থিত বলিয়া তাঁহার

চরণ দর্শন হয় না। বলরাম শ্বেতবর্ণ—ভক্তদিগের অভয়দান-চ্ছলে হস্তদ্বয় উত্তোলিত, বাসুকী ফণা দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন। পদ্মাসন করিয়া আছেন বলিয়া ইঁহারও চরণ দর্শন হয় না। সুভদ্রা দেবী কুঙ্কুমবরণা, হস্ত অপ্রকাশিত। সুদর্শন স্তম্ভরূপে প্রকাশিত। শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বর্ণাচ্ছাদিতা এবং শ্রীসরস্বতীদেবী রৌপ্যাচ্ছাদিতা। মাধব জগন্নাথেরই মূর্ত্তি, কিন্তু ক্ষুদ্র কলেবর।"

দেবর্ষি নারদ বলিলেন, "মহারাজ, অদ্য তুমি ধন্য হইলে, আমিও ধন্য হইলাম, এবং জগৎবাসী জীবগণও ধন্য হইল। তাঁহারা তোমা কর্ত্তৃক স্থাপিত এই মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভবযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার হইবে। হে রাজন, বারাণসী ও কুরুক্ষেত্রে যাবজ্জীবন বাস করিলে যে ফল হয়, শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে কোন ধর্ম্মকর্ম্ম না করিয়াও কেবলমাত্র একদিন বাস করিলেই, জীব সেই ফল পাইবে। ৺বারণসী ধামে ধ্যান করিতে করিতে জীবনান্ত হইলে যে ফল হয়, এই স্থানে অর্দ্ধঘণ্টা কাল বাস করিলেই, সেই ফল প্রাপ্তি হইবে, ইহাতে কদাচ অন্যথা হইবে না।"

কিলান্তে ভারতে বর্ষে চোৎকলে পাবনং মহৎ।
চতুর্ভুজা জনাঃ সর্ব্বে দৃশ্যন্তে তত্র বাসিনঃ॥
বাঞ্ছন্তি অমরাঃ সর্ব্বে যত্র স্থাতুং মুহুর্মুহুঃ।
কিং বচমি তস্য মাহাত্ম্যং ক্ষেত্রস্য মহিমাপরঃ॥

যন্নাম-কীৰ্ত্তনাদেব লীয়ন্তে সকলাংহসঃ।
ন স্থাননিয়মস্তত্র ভূস্বর্গে পুরুষোত্তমে॥
যত্র তত্রাপ্যসুত্যাগাদ্‌যে কেচিৎ পুরুষাধমাঃ।
তেঽপি সালোক্যতাং যান্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
বারাণস্যাং কুরুক্ষেত্রে যাবজ্জীবং বসেন্নরঃ।
প্রাপ্নোতি যৎ ফলং রাজন্ ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে॥
দিনমেকং বসেৎ যস্তু সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ।
তৎফলং সমবাপ্নোতি ন কিঞ্চিৎ ক্রিয়তে যদি॥
যা গতির্যোগযুক্তস্য বারাণস্যাং মৃতস্য চ।
সা গতির্ঘটিকার্দ্ধেন পুরুষোত্তমদক্ষিণে॥

মহারাজ তখন অক্ষয়বটের বায়ু-কোণে নীলাচলে, যে স্থানে নীলমাধব ছিলেন, সেই স্থানে অতি উচ্চ সুবিস্তৃত এক মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। তাহাতে ৪টী প্রকোষ্ঠ হইল। তাহার অভ্যন্তরে—রত্নবেদী, তদনন্তর কোষাগার, নাট মন্দির ও ভোগমন্দির। ঐ মন্দিরটী সুবিস্তৃত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হইল, এবং ৪টী প্রবেশদ্বার রাখা হইল। এইরূপে মন্দির নির্ম্মাণ হইলে, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাকে আনিবার জন্য দেবর্ষি নারদের সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। রাজা ও দেবর্ষি নারদ, ইন্দ্রলোকাদি পশ্চাতে রাখিয়া, ব্রহ্মলোকে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় মণিকোদর নামক দৌবারিক মুনিকে বলিল, "পিতা এখন সামবেদ দ্বারা ভগবানের

স্তুতি করিতেছেন। আপনি তথায় যাইয়া, ব্রহ্মার আদেশ লইয়া রাজার সহিত গমন করুন। তখন, নারদ দ্বারবানের বাক্যানুযায়ী অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, ইন্দ্রদ্যুম্নের আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলে, ব্রহ্মা রাজাকে আনিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

নারদ রাজার সহিত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া, সাষ্টাঙ্গে প্রণামকরতঃ, করজোড়ে স্তুতি করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা মহারাজাকে বলিলেন, "হে মালবাধিপতে! তুমি যেজন্য আসিয়াছ, তাহা আমি অগ্রেই অবগত হইয়াছি; অতএব, আমি বলিতেছি, যে তুমি সত্বর প্রতিগমন করিয়া, প্রতিষ্ঠোপযোগী সমস্ত দ্রব্যাদি নারদের আদেশমত প্রস্তুত কর; এবং এই শঙ্খনিধি ও পদ্মনিধি লইয়া যাও। আমি দেবগণ সহ তোমার কার্য্য নির্ব্বাহ ও প্রতিষ্ঠা করিতে আসিতেছি। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন, "আমি সমস্ত প্রস্তুত করিতে বলিয়া আসিয়াছি।" তখন ব্রহ্মা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "তুমি বহুকাল যাবৎ আসিয়াছ—ইতিমধ্যে তোমার পুত্রপৌত্রাদি অনেক পুরুষ ধ্বংস হইয়াছে; পুনরায় যাইয়া সমস্ত প্রস্তুত কর। আমি তৎপর আসিতেছি। মহারাজ! তুমি ধন্য, ভগবানের দারুময় মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা দ্বারা তুমি কৃতার্থ হইবে। এই কার্য্য দ্বারা সমস্ত জীবের মুক্তির দ্বার প্রসারণ করা হইবে। ভগবান্ এরূপ দয়া, কাহাকেও আর

কোনও কালে করেন নাই। এই দারুময় মূর্ত্তির যে কি মাহাত্ম্য, তাহা দেবতাদের নিকটও গোপনীয়। ভগবান্ যেরূপ আমাকে বুঝাইয়াছেন, সেরূপ তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। ব্রহ্মোবাচ—

সুভদ্রাং রামসহিতং মঞ্চস্থং পুরুষোত্তমং।
দৃষ্ট্বা নরোঽব্যয়ং স্থানং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ॥

ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মোবাচ—

সকৃৎ পশ্যতি যো মর্ত্ত্যঃ শ্রদ্ধয়া পুরুষোত্তমং।
পুরুষাণাং সহস্রেষু স ভবেদুত্তমঃ পুমান্॥
ধন্যাস্তে বিবুধপ্রখ্যা যে বসন্ত্যুৎকলে নরাঃ।
তীর্থরাজ-জলে স্নাত্বা পশ্যন্তি পুরুষোত্তমং॥

ব্রহ্মার প্রতি শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন—

সাগরস্যোত্তরে তীরে মহানদ্যাস্তু দক্ষিণে।
সঃ প্রদেশো পৃথিব্যাং হি সর্ব্ব-তীর্থবরপ্রদঃ॥
তত্র যে মনুজা ব্রহ্মন্ নিবসন্তি সুবুদ্ধয়ঃ।
জন্মান্তর-কৃতানাঞ্চ পুণ্যানাং ফলভাগিনঃ॥
একাম্রকাননাদ্ যাবৎ দক্ষিণোদধি-তীরভূঃ।
পদাৎ পদাৎ শ্রেষ্ঠতমা ক্রমেণ পরিকীর্ত্তিতা।
সিন্ধুতীরে তু যো ব্রহ্মন্ রাজতে নীলপর্ব্বতঃ॥

পৃথিব্যাং গোপিতং স্থানং তব চাপি সুদুর্ল্লভং।
সুরাসুরাণাং দুর্জ্ঞেয়ং মায়য়াচ্ছাদিতং মম।
ক্ষরাক্ষরমতিক্রম্য বর্ত্তেঽহং পুরুষোত্তমে।
সৃষ্ট্যা লয়েন নাক্রান্তং ক্ষেত্রং মে পুরুষোত্তমং॥"

ইন্দ্রদ্যুম্ন প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। অনন্তর মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আসিয়া দেখেন যে, তাঁহার বংশধরগণের সকলেরই অভাব হইয়াছে। যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা সেই সময় এক প্রতাপশালী মহারাজা গালমাধবদেব কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া, তাহাতে নীলমাধব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন আসিয়া, ঐ মন্দির মধ্যে নীলমাধব-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার লোকের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবস্থা অবগত হইলেন যে, বহুকাল অতীত হওয়ায় মন্দির বালুকা দ্বারা প্রোথিত হইয়া যায় এবং রাজা গালমাধব তথায় আসিয়া, ঐ মন্দির পুনরুদ্ধার করিয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐ মূর্ত্তিকে অপর এক স্থানে রাখার বন্দোবস্ত করেন। এই সংবাদ গালব রাজার নিকট প্রেরিত হইলে, গালবরাজ যুদ্ধার্থ আগমন করেন; কিন্তু দেবর্ষি নারদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া গালমাধব লজ্জিত হইলেন, এবং ইন্দ্রদ্যুম্নের সহিত দারুব্রহ্ম-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং নিজ স্থাপিত বিগ্রহ পুরীর মধ্যে, প্রধান মন্দিরের

উত্তর পশ্চিমদিকে, অপর এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে স্থাপিত করিলেন।

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদাদেশে দারুব্রহ্ম-প্রতিষ্ঠোপযোগী সমস্ত বস্তু প্রস্তুত করিলেন। প্রজাপতি স্বয়ং স্বর্গ হইতে দেবগণ সহ, প্রথম যে স্থানে অবতরণ করেন, তাহার নাম স্বর্গদ্বার। প্রজাপতি ঐ স্থানে রথ হইতে অবতরণ করিলে, মহারাজ ও দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া, প্রতিষ্ঠা কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন, লক্ষ্মী, সরস্বতী, ও মাধব এই সপ্ত মূর্ত্তি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের যজ্ঞবেদী হইতে, তিন রথে চড়াইয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ অরুণ স্তম্ভের নিকট আনয়ন করা হইল, এবং রথ হইতে অবতরণ করাইয়া, নূতন রত্নবেদীতে স্থাপন করা হইল। তখন ব্রহ্মা, বৈদিক মন্ত্র দ্বারা স্নানাদি সমাপন করাইয়া, নৃসিংহ মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবামাত্র, নারায়ণ, নৃসিংহ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার গাত্রতেজে নরগণ অস্থির হইয়া উঠিলেন, কেহই আর সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইলেন না। তদ্দর্শনে রাজা করজোড়ে স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। নৃসিংহদেব রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, সেই জ্যোতিঃ সাতমূর্ত্তির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিলেন! তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতঃ, মৃত্তিকায় পতিত থাকিয়া, ভগবান্‌কে ও প্রজাপতিকে বন্দনা করিলেন।

ভগবান্, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথ

দেবের মাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্যে ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি ভগবদ্ বাক্যং—

ভঙ্গে প্রোথে চ রাজেন্দ্র স্থানং ন ত্যজ্যতে ময়া।
কালান্তরেঽপি যোঽপ্যন্যং প্রাসাদং কারয়িষ্যতি॥
তবৈব কীর্ত্তিঃ সা নূনং ত্বৎপ্রীত্যৈ তত্র মে স্থিতিঃ।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেব ব্রবীমি তে॥
প্রাসাদভঙ্গে তৎ স্থানং ন ত্যজামি কদাচন।
অনেন দারুবপুষা স্থাস্যাম্যত্র পরার্দ্ধকং॥
দ্বিতীয়ং পদ্মযোনেস্তু যাবৎ পরিসমাপ্যতে।

তথা রুদ্রযামলে ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি ভগবদ্‌বাক্যং—

রাজন্নবেহি রূপং মে নামজাতি-বিবর্জ্জিতং।
কেবলানুভবানন্দং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥
স আস্তে শ্রীনীলগিরৌ জগন্নাথাখ্য-সংজ্ঞয়া।

ব্রহ্মপুরাণে ইন্দ্রদ্যুম্নং রাজানং প্রতি শ্রীভগবানুবাচ—

সর্ব্বঃ সম্পৎস্যতে কামস্তব রাজন্ যথেচ্ছসি।
মুক্তিপ্রদং মম ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যসার-সংগ্রহং॥
ইদং ক্ষেত্রবরং রম্যং ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষদং।
ক্ষেত্রাণাং সর্ব্বতীর্থানাং রাজেব ক্ষেত্রমদ্ভুতং॥
যথা সমুদ্রস্তীর্থানাং রাজেন্দ্র উচ্যতে বুধৈঃ।
অতএব পুরাণাদৌ প্রধানত্বাচ্চ উচ্যতে॥

কলৌ তর্থানি ন সন্তি ক্ষেত্রং ভাগীরথীং বিনা।
নদীনাঞ্চ যথা গঙ্গা ক্ষেত্রাণাং পুরুষোত্তমঃ॥

বৈরঞ্চ্যতন্ত্রে ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি ব্রহ্মোবাচ—

জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাতস্তনে কালে ব্রহ্মণা সহিতঞ্চ মাং।
রামং সুভদ্রাং সংস্নাপ্য মম লোকমবাপ্নুয়াৎ॥
স্নাপ্যমানন্তু যঃ পশ্যেন্মাং তদা নৃপসত্তম।
দেহবন্ধমবাপ্নোতি ন পুনঃ স তু পূরুষঃ॥

স্কন্দপুরাণে—

তত্ত্বং ব্রবীমি তে ভূপ শ্রুত্বৈতদবধারয়।
ন্যগ্রোধমূলে কূলেঽস্য সিন্ধোর্নীলাচলে স্থিতং॥
দক্ষিণোদধিতীরস্থং দারুব্রহ্ম সনাতনং।
বিনা সাংখ্যং বিনা যোগং দর্শনাৎ মুক্তিদং ধ্রুবং॥
শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত-নিয়মা বিদ্যন্তে নেহ পার্থিব॥

তৎপরে ভগবান্ বৈকুণ্ঠপতি, প্রতিষ্ঠার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রতি মাসে যে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, তাহার উপদেশ দিলেন এবং দৈনিক কিরূপ ভাবে পূজার্চ্চনাদি করিতে হইবে, তাহার ব্যবস্থা পূর্ব্বক, রাজাকে তৎকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। কতকদিন এইভাবে রাজা সেবা করিলেন। দেশময় "জয় জয় জগদীশ হরে" এই রবে এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণগানে সমস্ত

দেশ মুখরিত হইতে লাগিল। তৎপরে ইন্দ্রদ্যুম্ন, বিশ্বাবসু ও বিদ্যাপতি-বংশীয়দের উপর সেবার ভার দিয়া, এবং গালব রাজার উপর তত্ত্বাবধানের ভার অর্পণ করিয়া, দেবর্ষি নারদের সহিত হরিগুণ গান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন।

সমুদ্রের উত্তর উপকূলে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ দারু শরীরে বিরাজ করিতেছেন। দারুময়, ভগবানকে দর্শন করিতে হইলে প্রথমতঃ সমুদ্রে স্নান করিয়া অক্ষয় বট প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করতঃ, নৃসিংহ মূর্ত্তি প্রণাম করিতে হইবে। ইতঃপর মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবে; মন্দির মধ্যে দক্ষিণে জগন্নাথ, বামে বলরাম, মধ্যে সুভদ্রা, ও জগন্নাথদেবের বাম পার্শ্বে সুদর্শন চক্র অবস্থিত। ইঁহাদিগকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া তিনবার বেদী প্রদক্ষিণ করিবে; পরে মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে নিষ্ক্রান্ত হইবে। জগন্নাথদেবের ললাটে হীরকজ্যোতি দেখিতে পাইবে। দারুময়ী লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মাধব এই স্থানে আছেন। অন্যান্য গ্রন্থে, এই তিন মূর্ত্তির বিষয় উল্লেখ না থাকায়,

এই গ্রন্থেও উঁহাদের বিস্তারিত উল্লেখ করা হইল না। এখন হইতে, এই চারি মূর্ত্তির কথাই উল্লিখিত হইবে। প্রভাস পুরাণে ইঁহাদের এইরূপ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে—

দক্ষিণস্যোদধেস্তীরে নীলাদ্রৌ পুরুষোত্তমে।
দৃষ্ট্বা দারুময়ং ব্রহ্ম ভ্রাতৃভ্যাম্ সহ সংস্থিতং॥
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহঃ সর্ব্বক্লেশ-বিবর্জ্জিতঃ।

এই দারুময় ব্রহ্মকে, বলরাম ও সুভদ্রা সহ, যিনি দর্শন করিবেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া, মুক্তি লাভ করিবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই মাহাত্ম্য বর্ণন উপলক্ষে ভগবান্ নারদকে বলিয়াছেন—

বিষ্ণুযামলে—
চিদানন্দময়ং ব্রহ্ম দারুব্যাজেন সংস্থিতং।
জীবভূতং জগন্নাথং মামবেহি কলিপ্রিয়॥
মামত্র যে প্রপশ্যন্তি দৃষ্ট্বা চাক্ষুষগোচরং।
বিদধামীতি তন্মুক্তিমিতি মে নিশ্চয়া মতিঃ॥

তথা ব্রহ্মযামলে—
অপিচেৎ সুদুরাচারাঃ সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতাঃ।
তীর্থ-রাজ-জলে স্নাত্বা যে মাং পশ্যন্তি মানবাঃ॥
তেভ্য এবহি দাস্যামি মুক্তিং যোগেন্দ্রদুর্লভাং।
ইতি সত্যপ্রতিজ্ঞোঽস্মি স্থাস্যাম্যত্র পরার্দ্ধকং॥

হে নারদ, এই জীবরূপে দারুময় মূর্ত্তিতে আমার যেরূপ দর্শন করিতেছ, ইহা চিদানন্দময় ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা নিশ্চয় জানিও। আমাকে এই মূর্ত্তিতে যে দর্শন করে, তাহাকে আমি মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি। সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত অতি দুরাচার হইয়াও যদি সমুদ্রজলে স্নান করিয়া, আমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে দেবদুর্ল্লভ যে মুক্তি, তাহা আমি প্রদান করিব; ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এবং আমি পরার্দ্ধকাল এই স্থানে অবস্থান করিব।

পুরীর রাজাদের বিবরণ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ যদিও নির্গুণ, নিষ্কাম, পরমব্রহ্ম, কিন্তু তিনি যখন দারুময় দেহ ধারণ করিয়াছেন, তখন লৌকিক দেহানুরূপ তাঁহাকে ভোগ স্বীকার করিতে হইয়াছে। সেই জন্য তাঁহাকে সময়ে সময়ে, নানারূপ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছে। জরাসন্ধের উপদ্রবে, শ্রীকৃষ্ণ যেমন দ্বারকায় বাসস্থান নিরূপণ করেন, জগন্নাথও সেইরূপ সময়ে সময়ে, তাঁহার মন্দির ত্যাগ করিয়া, চিল্কা হ্রদে শোণপুরে অবস্থান করিয়াছেন এবং কলেবর পরিত্যাগ করিয়া নব কলেবর ধারণ করিয়াছেন। এবং মন্দিরও নূতন নির্ম্মিত বা পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীমন্দিরের বিবরণের সঙ্গে পুরীর রাজাদের বিবরণ

সংস্পৃষ্ট রহিয়াছে। এই মন্দির কোন্ রাজার অধীনে কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহা জানার জন্য পাঠকদের কৌতূহল হইতে পারে। সেই কৌতূহলের অনুরোধে, সামান্যভাবে, কতিপয় রাজার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

এই রাজাদের রাজত্বের সময় নিরূপণ করা বড়ই কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইতিহাস লেখকগণ নানারূপ ভিন্ন ভিন্ন সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই সময় সম্বন্ধে পার্থক্য এতদূর অধিক যে, তাহা বিচার করিতে গেলে, বাস্তবিক কিছুই স্থির হইয়াছে বলিয়া, বলা যায় না। এই সমস্ত ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মতের উপর নির্ভর করিয়া, কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না। সুতরাং ঐতিহাসিকদের মত, বাদ দিয়া, অন্য প্রমাণ দ্বারা যাহা পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করা যাউক।

এই মন্দির প্রথমতঃ মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন স্থাপন করেন। তাঁহার কোন পুত্রপৌত্রাদি ছিল না, সেইজন্য শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দির ও জগন্নাথের সেবা পূজা, গালবাধিপতির হস্তে ন্যস্ত হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার পর কোন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস না থাকায়, ধারাবাহিক ইতিহাস জানা যায় না। আমরা কেশরীবংশীয় রাজা যযাতি হইতে কতিপয় উৎকলাধিপতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি।

মহারাজ যযাতি একজন প্রবল নৃপতি ছিলেন; ইনি রক্তবাহুবংশীয় যবন রাজাদিগকে পরাজিত করেন, এবং

ইঁহার সময়ে উৎকল স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইনি শৈব-ধর্ম্মাবলম্বী রাজা ছিলেন। শৈব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের উপর বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, এবং তাঁহার উন্নতিকল্পে বহু যত্ন করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজা জনমেজয়। ইঁহারই সময়ে, বোধ হয়, যবন রাজাদের ভয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মূর্ত্তি চিল্কা হ্রদে লুক্কায়িত রাখা হইয়াছিল, কারণ, যযাতি-কেশরীর সময়ে জগন্নাথদেবের পুনঃস্থাপন হয় এবং মন্দিরের পুনঃ সংস্কার হয়। সুতরাং তিনি হিন্দু মাত্রেরই পূজ্য। রক্তবাহু উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। তাঁহার ভয়েই হউক, বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধ-রাজাদের প্রভাববশতঃই হউক, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তি এই মন্দির হইতে সরাইয়া চিল্কা হ্রদে রাখা হইয়াছিল। তৎপরে যযাতি কেশরীর রাজত্বকালে, এই মূর্ত্তি পণ্ডিতদের মতানুযায়ী নীলাদ্রি-মহোদয়োক্ত-বিবরণানুসারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজা যযাতি কেশরীর রাজত্ব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও বিস্তার হইয়াছিল। সেই সময়ে ভুবনেশ্বরের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, শিব মন্দিরে ভুবনেশ্বর পরিশোভিত হইয়াছিলেন।

আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, যযাতিকেশরী নবম শতাব্দিতে রাজত্ব করেন; কিন্তু তাহা সম্ভবপর নয়। মাদলাপঞ্জিকা অনুসারে দেখা যায়—তিনি চতুর্থ শতাব্দির অনেক পূর্ব্বে রাজত্ব করিয়াছিলেন; কারণ কেশরীবংশীয়

ষষ্ঠ নৃপতি ললাটেন্দু কেশরী ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নাম এবং সময় ঐ ভুবনেশ্বর মন্দিরে খোদিত রহিয়াছে। সেই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিতেছি—

গজাষ্টেন্দুমিতে জাতে শকাব্দে কৃত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদং কারিয়ামাস ললাটস্থেন্দুকেশরী॥

এই শ্লোক দ্বারা দেখা যায় যে, ৫৮৮ শকাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং ইন্দুকেশরী নির্ম্মাণ করাইয়াছেন, তাহাও লিখিত রহিয়াছে। মাদলাপঞ্জিকা অনুসারে ষষ্ঠ নৃপতির রাজত্বকাল যদি ৫৮৮ শকাব্দে নিরূপিত হয়, তাহা হইলে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী যযাতিকেশরীর সময় ৪০০ শকাব্দা হওয়াই সম্ভব।

এই কেশরীবংশীয় রাজাগণ ৪২ পুরুষ ব্যাপিয়া, নবম শতাব্দি পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বংশীয় রাজাদের মধ্যে যযাতিকেশরী, ললাটেন্দুকেশরী এবং নরেন্দ্রকেশরী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রকেশরীর সময় নরেন্দ্র সরোবর খনিত হইয়াছিল। ললাটেন্দুকেশরীর সময় ভুবনেশ্বর মন্দির প্রস্তুত বা পুনঃ সংস্কৃত করা হইয়াছিল।

এই কেশরী বংশের ক্রমশঃ অবনতি আরম্ভ হইল। সহস্র শকাব্দের প্রারম্ভে উড়িষ্যার দক্ষিণ প্রান্তে, গোকর্ণেশ্বরের ঔরসে এবং গঙ্গাদেবীর গর্ভে চৌরগঙ্গ নামক এক বীরপুরুষের অভ্যুদয় হয়। উড়িষ্যা এই বীরপুরুষের দ্বারা

আক্রান্ত হয়, এবং তৎকর্ত্তৃক কেশরীবংশীয় রাজা পরাজিত হন। এই হইতে কেশরীবংশ বিলুপ্ত হয়, এবং চৌরগঙ্গ হইতে গঙ্গাবংশের আরম্ভ হয়। এই গঙ্গাবংশীয় রাজাদের শাসন সময়ে, রাজ্যের এবং মন্দিরের বহু উন্নতি সাধিত হয়। চৌরগঙ্গ রাজ্যাধিকারের পর রাজ্য-বিস্তারে প্রয়াসী হন এবং বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করেন। এই বংশের ষষ্ঠ নৃপতি অনঙ্গভীমদেব অত্যন্ত খ্যাতনামা রাজা ছিলেন। ইঁহার সময় শ্রীমন্দিরের অনেক উন্নতি সাধিত হয়, সুতরাং আমাদের সহিত ইঁহার অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক। ইঁহার রাজত্বকালে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের পুনঃ সংস্কার হইয়াছিল। এবং পরমহংস বাজপেয়ীর হস্তে মন্দিরের তত্ত্বাবধান এবং নির্ম্মাণের ভার অর্পিত হয়। ১১৩১ শকাব্দে এই সংস্কার করা হয়, এবং অনঙ্গভীমদেব দ্বারা এই কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। এই বৃত্তান্ত জগন্নাথ-মন্দিরের প্রস্তরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। "শকাব্দে রন্ধ্র শুভ্রাংশুরূপ-নক্ষত্র-নায়কে। প্রাসাদঃ কারিতোঽনঙ্গভীমদেবেন ধীমতা॥" এই রাজা অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন—এমন কি তিনি তাঁহার রাজ্যে ঘোষণা করিয়াছিলেন, "এ রাজ্যের রাজা শ্রীশ্রীজগন্নাথ, আমি তাঁহার দাস মাত্র।" ইনি রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে ত্রুটী করেন নাই। কৃষ্ণানদীর ভূভাগ হইতে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত তাঁহার রাজ্যের সীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। এই বংশের রাজাদের ভিতর অনঙ্গভীমদেবের পর, এই

বংশীয় সপ্তম রাজা লাঙ্গুলা নরসিংহদেবের সময়, কারুকার্য্য-খচিত শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠার দৃষ্টান্তস্থল, কোণার্কের মন্দির নির্ম্মিত হয়—যাহা দেখিলে উড়িষ্যাবাসীরা শিল্প-নৈপুণ্যে অনভিজ্ঞ ছিলেন, একথা বলা যায় না। এই নরসিংহদেবের সময় বোধ হয়, নরেন্দ্র সরোবর খনিত হইয়াছে।

এই বংশীয় দ্বাদশপুরুষ রাজা নিঃশঙ্কভানুদেবও বিশেষ বিখ্যাত রাজার মধ্যে গণ্য ছিলেন। তাঁহার সময়েও রাজ্য অক্ষুণ্ণ ছিল এবং ধর্ম্মবিশ্বাস অটল ছিল। তাঁহার সময় খালধূপের প্রচার হয়, সুতরাং জগন্নাথ-মন্দিরের সহিত তিনি বিশেষ সম্পর্কিত। ইঁহার পরবর্ত্তী ঊনবিংশ পুরুষ, রাজা কপিলদেবও, বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, রাজ্যশাসনে সমধিক পারদর্শী, ও শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপাপাত্র ছিলেন। ইঁহার সময়ে বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা এই যে, ইঁহার ঔরসে প্রধানা মহিষীর গর্ভে অষ্টাদশ পুত্র জন্মে, এবং দাসীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে—তাঁহার নাম পুরুষোত্তম দেব। শ্রীশ্রীজগন্নাথ কপিলদেবকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন যে, "দাসীপুত্র পুরুষোত্তমকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত কর।" যদিও কপিলদেবের অষ্টাদশ পুত্র রাজ্যের প্রকৃত সত্ত্বাধিকারী, তথাপি সেই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, ভগবদ্ভক্ত রাজা কপিলদেব, ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করিয়া, ১৪৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পুরুষোত্তমদেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

পুরুষোত্তমদেব অত্যন্ত বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, ইনিও অনঙ্গভীমের ন্যায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, "এই রাজ্য জগন্নাথের, আমি কেবল কিঙ্করমাত্র।" ইঁহার সময়ে অন্তর্ব্বেষ্টন বা ভিতরের দেওয়াল নির্ম্মিত হয়। তাঁহার ভক্তিবলে ভগবান্ শাস্ত্রীয় নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন, অষ্টাদশ ভ্রাতাদের শত্রুতা হইতে রক্ষা করিলেন; অবশেষে ভক্তের অধীন ভগবান্, ইহা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য, বলরাম সহ, কাঞ্চিযুদ্ধে যোদ্ধৃবেশে স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত অন্যত্র লিখিত হইয়াছে। পুরুষোত্তমদেব পরম পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া "মুক্তিচিন্তামণি" প্রণয়ন করেন।

ইহার পরই, আমাদের সর্ব্বগুণধর, সুপণ্ডিত, পরম ভক্ত বীরপুরুষ, রাজা প্রতাপরুদ্র, পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশে সর্ব্বগুণোপেত এরূপ রাজা আর জন্মেন নাই—এরূপ মহাপুরুষ অতি অল্পই জন্মিয়া থাকেন। ১৫০৪ খৃঃ অব্দে ইনি সিংহাসনারোহণ করেন। ইঁহার রাজত্বকাল যদিও বিশেষ স্মরণীয়, এবং ইতিহাস ইহা আদরে বক্ষে ধারণ করিয়া চিরকাল পোষণ করিবে, তথাপি ইহাকে একেবারে নিষ্কণ্টক বলিতে পারি না। কমল যেমন কণ্টক-শূন্য হয় না, গোলাপ গাছে যেমন কাঁটা আছেই, সেইরূপ এই রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহে পরিপূর্ণ ছিল। ইঁহার রাজত্বের সময়ে মুসলমানদের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, এই জন্য রাজ্যে

একেবারে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ছিল না। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাতে কতকদিনের জন্য যুদ্ধাদি স্থগিত হইয়াছিল, এই অবসরে প্রতাপরুদ্রের আধ্যাত্মিক সৌভাগ্যসূর্য্যের উদয় হইল। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরীতে উপস্থিত হন। জীব-উদ্ধার তাঁহার ব্রত। নিজে জগন্নাথের মহিমা বিস্তার করিবেন, তাই জগন্নাথে উপস্থিত। মহাপ্রভুর উপস্থিত হওয়ার পর, দেশময় এই আন্দোলনে, এক মহাশক্তির আবির্ভাব হইল। ছোট বড়, ধনী নির্ধন, রাজা প্রজা, স্ত্রী পুরুষ, সকলের মধ্যেই এই শক্তি ক্রিয়া করিতে লাগিল। এই শক্তি প্রথমতঃ সার্ব্বভৌমেতে সংক্রামিত হইল, তৎপর মন্ত্রী রায় রামানন্দ আক্রান্ত হইলেন। উভয়েই একেবারে পাগল হইয়া গেলেন। ইতঃপর রাজার পালা—অল্প দিন মধ্যে, তিনিও ঐ দলভুক্ত হইলেন। এই উন্মাদনায় সমস্ত দেশ পূর্ণ হইয়া গেল। মহাপ্রভু ঘরে ঘরে পূজিত হইতে লাগিলেন—সকলেই গৌরভক্ত হইলেন। এইরূপে উড়িষ্যাতে এক নবযুগের অভ্যুদয় হইল। এই আনন্দস্রোত এখানে অষ্টাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া ক্রিয়া করিয়াছিল। যেমন আনন্দ, সেই পরিমাণে নিরানন্দ আসে। যখন মহাপ্রভু অপ্রকট হইলেন, রায় রামানন্দ এবং প্রতাপরুদ্র শোকে অধীর হইলেন, স্বরূপ ও দামোদর প্রাণত্যাগ করিলেন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ স্থানান্তরে সন্নিবেশিত হইবে।

মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের "জগন্নাথ

মন্দির” নামক গ্রন্থ হইতে আমরা অনেক সাহায্য লইয়াছি, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ ; কিন্তু তাঁহার একটি মন্তব্য আমাদের মতের সহিত একমত না হওয়াতে, আমরা তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইলাম। সেই মন্তব্যটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। “এ মন্দির গঙ্গাবংশীয় রাজাগণের তত্বাবধানে ৪০২ বৎসর ছিল। ইহার সময় হইতে গঙ্গা বংশের সৌভাগ্যরবি অস্তাচলগামী হইল। হওয়াও স্বাভাবিক।

তান্ত্রিক হওয়া ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম, যদ্যপি বৈষ্ণব হয়েন, তবে অবনতি অবশ্যম্ভাবিনী।” মহামহোপাধ্যায় মহাশয় বলিতেছেন যে, তান্ত্রিক হওয়া ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম, যদ্যপি বৈষ্ণব হয়েন, তবে অবনতি অবশ্যম্ভাবিনী। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে যুধিষ্ঠির, অম্বরীষ, ময়ূরধ্বজ, শিখিধ্বজ, পরীক্ষিৎ প্রভৃতি বহু ক্ষত্রিয় মহাপুরুষ ছিলেন, যাঁহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কি অবনতি হইয়াছিল বলিয়া মনে করিতে পারি? তাহা কখনই নয়। সুতরাং তাঁহার এই মত সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম না।

রাজা প্রতাপরুদ্রের দুই পুত্র, তাঁহারা অল্পকাল রাজত্ব করিয়া কালগ্রাসে পতিত হওয়ায়, এই রাজবংশ বিলুপ্ত হইয়া গেল। মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধর কতক দিন রাজত্ব করিলেন। তৎপর মুকুন্দ হরিচন্দনকে প্রজারা রাজা করেন। এই বংশ তিন পুরুষ রাজত্ব করিয়াছিল। এই মুকুন্দদেবের

সময়, কালাপাহাড় সুলেমানের সেনানায়ক হইয়া ১৫৬৭ খৃঃ অব্দে পুরী আক্রমণ করে এবং মুকুন্দদেবকে পরাজিত করিয়া পুরী অধিকার করে। এই যুদ্ধে মুকুন্দদেবের মৃত্যু হয়।

কালাপাহাড় কেবল রাজ্যাধিকার করিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া, জগন্নাথের মূর্ত্তি চিল্কাহ্রদ হইতে আনিয়া, তাহাকে দগ্ধ করে। উড়িষ্যাবাসী বিশার মহান্তি একজন পরম ভক্ত, এই দগ্ধ-মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া, কুজঙ্গ রাজার নিকট প্রদান করেন। তিনি নাভিস্থ ব্রহ্মমণি নূতন মূর্ত্তিতে স্থাপন করিয়া, মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। কালাপাহাডের বৃত্তান্ত অন্যত্র লিখিত হইল।

মুকুন্দদেবের মৃত্যুর পর, তাঁহার পুত্র কতক দিন রাজত্ব করেন। এই বংশ শেষ হইলে, রাজ্য মধ্যে প্রজাদের ভিতর নানারূপ আত্মকলহ উপস্থিত হয়। পরে ১৫৭৮ খ্রীঃ অব্দে প্রজারা জনার্দ্দন বিদ্যাধরের পুত্র, রামচন্দ্র দেবকে রাজা করিলেন।

রামচন্দ্রদেব বিশেষ ভাগ্যবান্। কারণ তাঁহার রাজ্যাধিকার, মোগল সম্রাট আকবরের হিন্দু সেনাপতি টোডরমল ঘোষণা করিলেন, এবং তৎপরে মানসিংহ তাঁহার সম্মান আরও বৃদ্ধি করিলেন। গঞ্জাম ইঁহার রাজত্বের অধীন করিয়া দিলেন। রাজা রামচন্দ্রদেব জগন্নাথের মূর্ত্তি কুজঙ্গ রাজার নিকট হইতে আনিয়া পুনরায়

নূতন মূর্ত্তি শাস্ত্রমত গঠন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইনি আমাদের পরম বন্ধু।

১৭৬১ খৃঃ অব্দে এই মন্দিরের ভার মহারাষ্ট্রদের হস্তে ন্যস্ত হয়। এই বারের হস্তান্তর আপোষ ভাবে হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় রাজারা জগন্নাথের মন্দির সম্বন্ধে কোনও উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় না। কিন্তু মঠের যত সম্পত্তি, তাহার অধিকাংশ মহারাষ্ট্র রাজাদের সময় প্রদত্ত হইয়াছে।

এই মন্দির ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮০২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র অধীন ছিল। এই সময় শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী সেবা পরিত্যক্ত হইয়া, বৈষ্ণব মতে (রামানন্দি মতে) সেবা আরম্ভ হয়, এবং এখন পর্য্যন্তও সেইরূপে সেবা চলিতেছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহাবাষ্ট্রদের পরাজয় হয়, এবং গভর্ণমেণ্ট এই মন্দিরের শাসনভার গ্রহণ করেন। রামচন্দ্রদেবের বংশধরগণ Superintendent স্বরূপে নিযুক্ত হন, এবং তাঁহারা ২৩৩৩৲ টাকা বৃত্তি পান। সেই হইতে অদ্যাবধি (মুকুন্দদেব পর্য্যন্ত) Governmentএর অধীনে আছে। এখন Manager নিযুক্ত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবার বন্দোবস্ত হইতেছে।

—:০:—

শ্রীমন্দিরের বিবরণ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির সমুদ্র হইতে প্রায় এক মাইল দূরে নীলাচলে অবস্থিত। মন্দিরের চারিটি দ্বার;—পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার, তাহার দুইদিকে দুইটী প্রস্তরময় সিংহ আছে; উত্তর দিকে হস্তিদ্বার; পশ্চিম দিকে খাঞ্জাদ্বার; দক্ষিণ দিকে অশ্বদ্বার। মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরকেমেঘনাদ কহে। মেঘনাদ ২৪ ফিট্ উচ্চ, ২২ ফিট্ প্রস্থ। ইহা উত্তর দক্ষিণে ৬৭৬ ফিট্ ও পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬৮৭ ফিট্। সিংহ দ্বারে একটী অরুণ স্তম্ভ আছে; স্তম্ভটী কৃষ্ণ-প্রস্তর নির্ম্মিত, দ্বাবিংশতি হস্ত উচ্চ। ইহা একটী প্রস্তর কাটিয়া খোদা হইয়াছে। এই দ্বারে প্রকাণ্ড দুই সিংহ আছে। এই দ্বারে প্রবেশ করিয়া ডান ধারে, যে মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম পতিত-পাবন। ভগবান্ তত-পাবনরূপী হইয়া দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন যাহারা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না, যথা—হাড়ি, ডোম, মেথর, ধাঙ্গড়, ম্লেচ্ছ, এই সমস্তকে কৃপা করিবার জন্য, ভগবান্ পতিত-পাবন বরাভয় হস্তে দ্বারদেশে অবস্থান করিতেছেন। বাম ধারে, সিদ্ধ হনুমান্ ও রাধাকৃষ্ণ আছেন। প্রথমে এই পতিত-পাবন দর্শন করিতে হয়। এই দ্বারটি পার হইলে, বাম দিকে একটী মন্দির পাওয়া যায়,

জগন্নাথ মন্দির
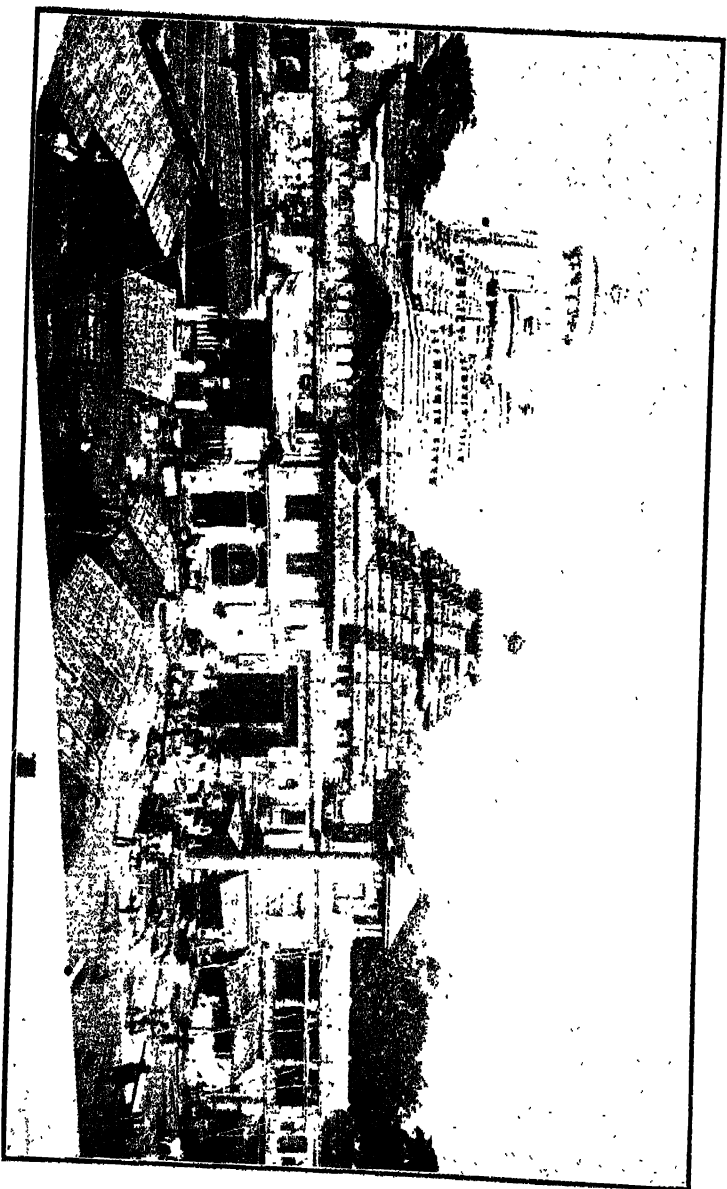
তাহাতে ৺কাশীর বিশ্বেশ্বর মহাদেব বিরাজমান। এই স্থানে রামাভিষেক নামে একটী স্থান আছে; সে স্থান হইতে কতকগুলি সিঁড়ি নামিয়া আসিয়াছে—উহাকে বাইশ পৈঠা বলে। ক্রমে উপরের দিকে উঠিয়া আর একটী দ্বার পাওয়া যায়। এই দ্বারে, খাজা, গজা ইত্যাদি মিষ্ট প্রসাদ বিক্রয় হয়। উত্তর দিকের হস্তিদ্বারে প্রবেশ করিয়া, ডান ধারে শীতলা-দেবী, সন্নিকটে সোণাকূপ ও তাহার দক্ষিণ দিকে বৈকুণ্ঠ-ধাম দেখিতে পাওয়া যায়। বৈকুণ্ঠধামে একটি মন্দির আছে। যখন জগন্নাথদেবের নূতন কলেবর হয়, তখন জগন্নাথদেবের পুরাতন বিগ্রহ এই বৈকুণ্ঠধামে রাখা হয়। এই মন্দির সর্ব্বদাই বন্ধ থাকে। মন্দিরে একটি মহাদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দিরের নিকট, মাধব নাটা অর্থাৎ মাধবীলতা আছে। বাম দিকে লোকনাথ মহাদেব ও ঈশানেশ্বর শিব মন্দির; এই স্থানের উত্তর ও পূর্ব্ব কোণে আনন্দ বাজার, এই স্থানে অন্ন মহাপ্রসাদ বিক্রয় হয়। তন্নিকটে স্নানবেদী ও চাহিনী মণ্ডপ। ইহার উত্তর দিকে অপর একটা দ্বার আছে, তাহার সম্মুখে প্রকাণ্ড দুইটি হস্তী আছে। পশ্চিমদিকে খাঞ্জা দ্বার—এই দ্বারে প্রবেশ করিয়া, বাম দিকে হনুমান্, পার্শ্বে শিবমন্দির এবং নূতন শান্তকুটীর পাওয়া যায়; দক্ষিণ দিকে সেতুবন্ধ রামেশ্বর কল্পিত স্থান। এইখানে অপর একটী দ্বার আছে, তাহা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। দক্ষিণদিকে অশ্বদ্বার,

এখানে বিরাট একটী হনুমান্ মূর্ত্তি আছে। এই দ্বারে প্রবেশ করিয়া, ডান ধারে একটী মন্দিরে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনী ও অবতারত্ব সম্বন্ধে পশ্চাৎ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। কতকগুলি সিঁড়ি পার হইলে, অপর একটী দ্বার পাওয়া যায়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির চারিভাগে বিভক্ত :—মূল-মন্দির, জগমোহন মন্দির, নাট মন্দির ও ভোগ মন্দির। মূল মন্দিরের অপর একটী নাম মণিকোঠা। সেই স্থানটী অন্ধকার পূর্ণ, সকল সময়ই প্রদীপ রাখা হয়। সেই স্থানে রত্নবেদী আছে, উহা ১৬ ফিট্ দীর্ঘ এবং ১৩ ফিট্ প্রস্থ এবং ৪ ফিট্ উচ্চ কৃষ্ণ-প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাতে লক্ষ শালগ্রাম শিলা আছেন। ইহার উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম, শ্রীশ্রীমতী সুভদ্রা ও শ্রীশ্রীসুদর্শন চক্র স্থাপিত, ও সুবর্ণাচ্ছাদিত ভূদেবী এবং রৌপ্যাচ্ছাদিত সরস্বতী দেবী, জগন্নাথরূপী মাধবদেব সহ বিরাজমানা। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দর্শনকালে রত্নবেদী পরিক্রমণ করিতে হয়। জগমোহনে থাকিয়া, সকলে প্রভুকে দর্শন করিয়া থাকেন। জগমোহনে লম্বা লম্বা দুইটী চন্দন কাষ্ঠ উত্তর দক্ষিণ প্রস্থে লোহার শিকলে বাঁধা আছে। ভিতরে সকল সময় প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। সকাল বেলা, মঙ্গল আরতির পর একবার, এবং রাত্রে একবার মণিকোঠায় প্রবেশ করিতে পারা যায়।

জগমোহনের সম্মুখে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কপাট আছে। নাট-মন্দিরে নাচ গান হইয়া থাকে। নাটমন্দিরের মধ্যেও পূর্ব্বরূপ সম্মুখে দুইটী চন্দন কাষ্ঠ লোহার শিকলে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। নাটমন্দিরে, যাহার যে ভাবে ইচ্ছা, ভজন সাধন করিতে পারেন। যদিও এস্থান কোলাহলপূর্ণ, তথাপি এ স্থানে ভজন সাধন করিলে, মনঃস্থির ও ভক্তির উদ্দীপনা হয়, এইরূপ অনেক সাধুর মত। এই মন্দিরে, ভোগ মন্দিরের সম্মুখে একটী স্তম্ভ আছে। তাহার উপর একটী গরুড় মূর্ত্তি আছে। স্তম্ভের সম্মুখে যে একটী গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমাশ্রুপতনে হইয়াছে, বলিয়া কথিত হয়। মহাপ্রভু প্রত্যহ ঐ স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন ও অজস্র অশ্রুপাত করিতেন। তিনি এইরূপে এই স্থানে থাকিয়া, অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত, শ্রীমুখ-দর্শন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর চক্ষের জলে গর্ত্ত প্রস্তুত হইয়াছে, এ কথা অনেকের নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে; কিন্তু যিনি চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিবেন, তাঁহার এ সন্দেহ থাকিবে না। তিনি জানিতে পারিবেন, মহাপ্রভুর চক্ষে যেন সুরধুনী প্রবাহিত হইত—পিচকারীর জলের মত সজোরে জল বাহির হইত। এই অশ্রু অবিরত নির্গত হওয়াতে এইরূপ গর্ত্ত হইয়াছে। গরুড় স্তম্ভের উপর হাত রাখিয়া মহাপ্রভু দর্শন করিতেন। অঙ্গুলি চিহ্ন এবং নীচে চরণচিহ্ন অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে। মহাপ্রভুর ভক্তগণ

শ্রীশ্রীচরণযুগল তুলিয়া নিয়া মন্দিরের উত্তর দিকে, একটী ছোট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাতে রক্ষা করিয়াছেন। ঐ চরণযুগল বোধ হয় সকলের পদদলিত হয় বলিয়া, অন্যত্র রাখা হইয়াছে। এখনও অনেক লোকে, এই স্তম্ভের নিকট দাঁড়াইয়া প্রথমে দর্শন করিয়া থাকে। এই স্থানে প্রদীপ দান এবং পূজাদি হইয়া থাকে। ভোগ মন্দির—এখানে জগন্নাথদেবের অন্নভোগ হইয়া থাকে। নাটমন্দিরের স্তম্ভে এবং ভোগ মন্দিরের গায়ে, অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। জগন্নাথদেবের মূলমন্দিরের চূড়া ১৯২ ফিট উচ্চ। ইহা বিষ্ণুচক্র ও ধ্বজা দ্বারা সুশোভিত। উৎকলের রাজা গজপতি বংশজ অনঙ্গভীমদেবের সময়ে, ১১১৯ শকাব্দে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির সংস্কার করা হয়। এই মন্দিরের সংস্কার কার্য্য, দেশবাসীদিগের স্থাপত্য বিদ্যার পরিচায়ক। পরমহংস বাজপেয়ী সেবা কার্য্যে নিযুক্ত হন। অনঙ্গভীমদেব পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বহুসংখ্যক দেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। জগন্নাথের সেবার জন্য ১২০ জন নর্ত্তকী আছে। ইহারা ভোগের সময় ও অন্যান্য সময়, নৃত্য করিয়া থাকে। ভোগের সময় মন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে। জগন্নাথের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে; তাহা যথাক্রমে নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা—পূর্ব্ব দিকে ১। অগ্নীশ্বর শিবমন্দির, ইহা একটী গর্ত্তের মধ্যে দর্শন করিতে হয়। এ মন্দিরের নিকট দিয়া যে রাস্তাটী

দক্ষিণ দিকে গিয়াছে, তাহা নূতন রন্ধনশালায় মিলিয়াছে। পূর্ব্ব দিকে রামজীউর মন্দির। দক্ষিণ দিকে ও পূর্ব্ব কোণে নূতন রন্ধনশালা—সেই দিকে ভাণ্ডার ও চূণাকোঠার ঘর। গঙ্গা-কূপ, যমুনা-কূপ, ময়দা ঘর, ভেট মণ্ডপ এইগুলি কিছু বাহির দিকে পড়িয়াছে। দক্ষিণ দিকে ভিতরে ২। সত্য-নারায়ণ। ৩। রাধাকৃষ্ণ। ৪। ছাইল ঠাকুর। ৫। অক্ষয় বট। ৬। গণেশের মন্দির। ৭। মার্কণ্ড মহাদেব। ৮। ইন্দ্রাণী। ৯। সর্ব্বমঙ্গলা। ১০। শিবমন্দির। ১১। গণেশ। ১২। শিব-মন্দির। ১৩। পাদপদ্ম। ১৪। জগন্নাথদেব। ১৫। রাধাকৃষ্ণ। ১৬। অনন্ত। ১৭। বাসুদেব। ১৮। মুক্তীশ্বর। ১৯। ক্ষেত্রপাল। ২০। মুক্তি-মণ্ডপ; এই মণ্ডপে বসিয়া, ব্রহ্মা জগন্নাথের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সমাপন করিয়াছিলেন। এই জন্য এই স্থান অতি পবিত্র। এখানে অত্রত্য মঠাধীশ্বর সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী ভিন্ন, অন্য কাহারও উপবেশন করিবার অধিকার ছিল না। ২১। নৃসিংহ। ২২। মদনমোহন। ২৩। পাদপদ্ম মন্দির। ২৪। রোহিণী কুণ্ড, চতুর্ভুজ ভুষণ্ডী কাক, ও চক্র আছে! রোহিণী কুণ্ড শঙ্খের নাভিদেশে অবস্থিত। কারণ-বারি দ্বারা পরিপূর্ণ। প্রলয়কালে সমুদ্রের জল বৃদ্ধি হইলে, রোহিণী কুণ্ডের কারণ-সলিল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবা, শেষে কুণ্ডেই বিলুপ্ত হইয়াছিল। এই হেতু, এই পবিত্র কুণ্ডের নাম রোহিণী কুণ্ড হইয়াছে। রোহিণী কুণ্ড এক্ষণে অদৃশ্য প্রায়, সেই স্থানে একটী চৌতারা বাঁধান স্থান দেখা যায়। এখন

রোহিণী কুণ্ডে স্নান করিবার সুবিধা নাই। ইহার জল স্পর্শ ও পান করিতে হয়। ইহার জল পান করিয়া, বৃদ্ধ কাক শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য রোহিণী কুণ্ড অতি পবিত্র তীর্থ।

মার্কণ্ডেয়ে বটে কৃষ্ণে রোহিণ্যাঞ্চ মহোদধৌ।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

২৫। সিদ্ধিদাতা গণেশ ২৬। বিমলাদেবীর মন্দির। তৎসম্মুখেই, একটী হস্তীর উপর একটী সিংহ আছে।

পশ্চিম দিকে—২৭। বাসুদেবের মন্দির। ২৮। নন্দ-গোপাল। ২৯। পাদপদ্ম। ৩০ সাক্ষীগোপাল। এই মন্দিরে চৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়্ভুজ মূর্ত্তি আছে। ৩১। গণেশ। ৩২। গোপীনাথ। ৩৩। মাখনচোর। ৩৪। সত্যভামা। ৩৫। কর্ম্মাবাই, যাহার খিচুরী প্রসিদ্ধ। কর্ম্মতিবাইএর বিবরণ পশ্চাৎ যথাস্থানে দেওয়া গেল। ৩৬। সরস্বতী। ৩৭। ষষ্ঠী। ৩৮। ভদ্রকালী। ৩৯। লক্ষ্মী, নারায়ণ। ৪০। লক্ষ্মীর মন্দির। ৪১। নীলমাধব।

উত্তর দিকে—৪২। নারায়ণের মন্দির। ৪৩। সূর্য্য-নারায়ণ। ৪৪। সূর্য্যদেব। ৪৫। রামলক্ষ্মণ। ৪৬। পাতাল-মহাদেব—ইহাকে “বলি পাতাল” বলে। ভিতরে একটী গর্ত্তের মধ্যে এই মহাদেব আছেন। স্থানটী বড় অন্ধকারপূর্ণ।

৪৭। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদপদ্ম। ৪৮। বিষ্ণু-পাদ-পদ্ম। ৪৯। কীর্ত্তন চড়কা।

কপোতেশ্বর—বিরাজমণ্ডলের ও নীলাচলের মধ্যস্থিত কুশস্থলী নামক একটী বৃহৎ স্থান আছে। সেখানে জলাশয়াদি কিছুই ছিল না। এক দিবস মহাদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের তপস্যা দ্বারা, পৃথিবীতে সকলের পূজাস্পদ হইবার ইচ্ছায়, তথায় একটী জলাশয় করিয়া দেন, এবং ফলপুষ্প দ্বারা সুশোভিত করিয়া, কুশস্থলীকে একটী মনোরম স্থান করিয়া তুলেন। প্রভু কঠোর তপস্যায় কপোতাকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন, এইজন্য, সেইস্থান কপোতেশ্বর নামে পূজিত হয়। ইহা সংসারের সুখদুঃখের একমাত্র শান্তি-নিকেতন।

পূর্ব্ব দিকে একটী রাস্তা আনন্দবাজারে গিয়াছে। উত্তর দিকে জগন্নাথের মন্দিরের সংলগ্ন একটী মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ আছেন। অপর একটী মন্দিরে সর্ব্বমঙ্গলা আছেন; এই স্থানে মন্দির বিষয়ক লেখাপড়ার কার্য্য হইয়া থাকে। জগন্নাথদেবের মূলমন্দিরের গায়ে, তিন দিকে তিনটী মন্দির আছে, দক্ষিণে বরাহ, এবং পশ্চিমে নৃসিংহ দেবের মন্দির!

বামন ও বরাহ।—বামন ও বরাহমূর্ত্তির কথা যে লিখা হইল, ইঁহারা দশ অবতারের অন্তর্ভুক্ত। বরাহ অবতারেতে ভগবান্ হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছিলেন।

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃত-শূকর-রূপ জয় জগদীশ হরে।
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত-বামন
পদনখ-নীর-জনিত-জনপাবন
কেশব ধৃত-বামন-রূপ জয় জগদীশ হরে।

পশ্চিম দিকে, মন্দিরের নীচে, একটী ছোট মন্দির আছে —তাহার নাম একাদশী মন্দির। প্রবাদ আছে যে, এইস্থানে একাদশী বাঁধা আছেন, এখানে, একাদশীর উপবাস বাধ্যকর না হইলেও, বিধবারা একাদশী করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রসাদ উপেক্ষা করিতে হইবে, এই ভয়ে অনেকে মন্দিরে যান না। ব্রাহ্মণেরা প্রসাদ দ্বারা একাদশী করিয়া থাকেন।

অক্ষয়বট।—

বটরূপধরো বৃক্ষঃ প্রলয়েঽপি ন নশ্যতি।
প্রদক্ষিণন্তু যঃ কুর্য্যাৎ দৃষ্ট্বা বৃক্ষং প্রণম্য চ।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥

এই অক্ষয় বট ভগবানের স্বরূপ, মহাপ্রলয়েতেও নষ্ট হয় না, ইহাকে দর্শন, স্পর্শন এবং প্রণাম করিলে, ব্রহ্মহত্যাদি পাতক নষ্ট হয়। শঙ্খের নাভিদেশে অবস্থিত অক্ষয়বট ভগবানের বপুঃস্বরূপ। মহাপ্রলয়ের সময়, চরাচর বিনাশপ্রাপ্ত

হইবে জানিয়া, মহাবিষ্ণুর সুখশয্যারূপী অনন্তদেব, পাতাল হইতে উত্থিত হইয়া, বটবৃক্ষরূপে স্থিতি করিতেছেন। মন্দির প্রদক্ষিণ কালে অক্ষয়বট স্পর্শ করিতে হয়।

বটকৃষ্ণ।—

মার্কণ্ডেয়ে বটে কৃষ্ণে রোহিণ্যাঞ্চ মহোদধৌ।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

বটকৃষ্ণ এবং মার্কণ্ডেয় সম্বন্ধীয় মায়ার কাহিনী, পূর্ব্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় বটবৃক্ষোপরি যে বালক মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এবং যাঁহার উদর মধ্যে প্রবেশ ও বহির্গত হইয়াছিলেন, তিনি এই বটকৃষ্ণ। বটকৃষ্ণ পাষাণ-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, অক্ষয় বটের নিম্নে অবস্থান করিতে-ছেন। তাঁহাকে দর্শন করিলে, কালভয় দূর হয়, এবং এখানে যে যাহা মানস করে, তাহা পূর্ণ হয়। অনেকে ছেলে হওয়ায় জন্য মানস করিয়া থাকে। এই বালমূর্ত্তি দেখিতে অতি মনোহারিণী।

নৃসিংহদেব—ভগবান্ নৃসিংহদেব, দশাবতারের মধ্যে চতুর্থ অবতার। গীত-গোবিন্দে ভক্ত কবি জয়দেব, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

তব কর-কমল-বরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং
দলিত-হিরণ্য-কশিপু-তনু-ভৃঙ্গং
কেশব ধৃত-নরহরি-রূপ জয় জগদীশ হরে।

বিমলা দেবী ও অক্ষয় বটের মধ্যস্থানে, মুক্তি মণ্ডপের নিকট, নৃসিংহদেব অবস্থিত। তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়। এই নৃসিংহদেব নখ দ্বারা হিরণ্য-কশিপুকে সংহার করিয়াছিলেন ও প্রহ্লাদকে হিরণ্য-কশিপু-প্রদত্ত, বিষ-প্রয়োগ, অগ্নি, জল, পর্ব্বত, সর্পদংশন, হস্তি-পদ-দলন ইত্যাদি, সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া, তাঁহার দ্বারা হরিনাম প্রচার করাইয়াছিলেন; এবং অবশেষে প্রহ্লাদের বাক্য রক্ষা করিবার জন্য, স্ফটিক স্তম্ভ হইতে নির্গত হইয়া, নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক, হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়াছিলেন।

অন্তর্ব্বেদী।—

সমুদ্রতীর হইতে অক্ষয় বটের মূল পর্য্যন্ত স্থানকে, ভগবানের অন্তর্ব্বেদী বলে। অন্তর্ব্বেদীর যে কোন স্থানে মৃত্যু হইলে, জীব মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

বটসাগরয়োর্মধ্যে মুক্তিস্থানে সুদুর্ল্লভে।
তীর্থেঽস্মিন্ খেচরে বাপি ধ্রুবং তে মুক্তিমাপ্নুয়ুঃ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নাট-মন্দিরে, গরুড়-স্তম্ভের নিকট-বর্ত্তী ভোগ-মন্দিরের গায়, কয়েকটি দেবতার মূর্ত্তি আছে, তাহার মধ্যে ঘোড়ার উপর সৈনিক-বেশধারী যে দুই মূর্ত্তি আছেন, তাঁহাদের একজন জগন্নাথ; আর একজন বলরাম। যিনি কৃষ্ণবর্ণ অশ্বারোহণে তিনি জগন্নাথ, যিনি শুভ্রবর্ণ অশ্বারোহণে তিনি বলরাম—উভয়েই যুদ্ধের সাজে সজ্জিত

হইয়া আছেন। ঢাল, তলোয়ার, ধনু ইত্যাদি প্রত্যেকের সঙ্গে আছে। এই সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী আছে যে, ভক্তকে রক্ষা করিবার জন্য, জগন্নাথ ও বলদেব যুদ্ধ করিতে সৈনিক-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ভক্তের জন্য ভগবান্ যে, সকল কার্য্যই করিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

শ্রীজগন্নাথক্ষেত্রে বহু মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে। রাজাদের মধ্যে অনেকেই মহাপুরুষদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। সেই জন্যই ভগবান্ এই স্থান, লীলাক্ষেত্রের উপযুক্ত ভূমি মনে করিয়া, অবতীর্ণ হইয়াছেন। গঙ্গাবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে, অনঙ্গ-ভীমদেব একজন প্রবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন; তিনি এই মন্দির-সংস্কার করেন। সেই বংশে নিঃশঙ্কভানুদেবের জন্ম হয়। তিনি অনেক ধর্ম্ম কার্য্য দ্বারা বিখ্যাত হইয়াছিলেন; সেই বংশের ঊনবিংশতম রাজা কপিলচন্দ্রদেব, রাজ্যবিস্তার সহকারে মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইনি মন্দিরের বাহিরের দেউল প্রস্তুত করান। কপিলদেবের প্রধানা মহিষীর গর্ভজাত অষ্টাদশ পুত্র, এবং তাঁহার ঔরসে দাসীর গর্ভজাত পুরুষোত্তমদেব নামক এক পুত্র ছিলেন। পুরুষোত্তমদেব জগন্নাথের পরম ভক্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নযোগে কপিলদেবকে আদেশ করেন যে, দাসীপুত্র পুরুষোত্তমদেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে। কপিলদেব জগন্নাথ দেবের সেই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া,

প্রকৃত অধিকারী অষ্টাদশ পুত্র থাকা সত্ত্বেও, তাঁহাদিগকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া, ১৪৭৯ খৃঃ অব্দে, পুরুষোত্তম দেবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। এই উপলক্ষে পুরুষোত্তমদেবের সহিত, অষ্টাদশ পুত্রের নানা বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপাতে, তাঁহারা পুরুষোত্তমদেবের কোন ক্ষতি করিতে পারেন নাই। পুরুষোত্তমদেব যেমন বিষ্ণুভক্ত, তদ্রূপ পণ্ডিতও ছিলেন। অষ্টাদশ পুরাণ, উপনিষদ্, তন্ত্র এই সমস্ত শাস্ত্র মন্থন করিয়া "মুক্তি-চিন্তামণি" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

মুক্তিচিন্তামণি গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—

নানাগম-স্মৃতি-পুরাণ-মহাব্ধিমধ্যাদু-
দ্ধৃত্য বুদ্ধিমথনেন হরেঃ প্রসাদাৎ।
বাক্যানি যানি বিলিখানি বিমুক্তয়েঽহং
সন্তস্তদর্থমনিশং পরিপালয়ন্তু ॥
বিনাপ্যষ্টাঙ্গযোগেন বিনাপ্যধ্যয়নানি চ।
মুক্তিচিন্তামণিস্ত্বেষ মোক্ষদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।

রাজা স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ না করিয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে প্রকৃত রাজা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি নিজেকে জগন্নাথের কিঙ্কর মনে করিয়া, রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইঁহার সময়ে ভিতরের দেউল নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বে যে মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে, এই পুরুষোত্তম

যোদ্ধ বেশে জগন্নাথ ও বলরাম এবং মাণিক্য পট্টনা নাম্নী গোপালিনীর নিকট হইতে দধি গ্রহণ

দেবকে রক্ষা করিবার জন্য, শ্রীশ্রীজগন্নাথ ঐ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা জগজ্জনকে দেখাইয়াছেন যে, "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—আমার ভক্ত কিছুতেই বিনাশ প্রাপ্ত হন না, তাঁহাকে আমি রক্ষা করি। এই রাজার সম্বন্ধীয় নিম্নলিখিত ঘটনা, ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল।

রাজা পুরুষোত্তমদেবের, কোন সময়ে কাঞ্চীনগরের রাজাকে, জয় করিবার কারণ উদ্ভব হয়। তদনুসারে তিনি যুদ্ধে যাত্রা করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীবলরাম উভয়ে পুরুষোত্তমের পক্ষে, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ ঘোটকে আরোহণ করিয়া, প্রচ্ছন্নভাবে সৈনিকবেশে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হন; রাজা তাহা কিছুই জানিতেন না। ভগবৎ-কৃপায় কর্ণাট্ প্রদেশ জয় করা হইল—কাঞ্চীনগরের রাজা পরাজিত হইলেন। জগন্নাথ ও বলরামদেব প্রত্যাবর্ত্তনকালে মাণিক্য-নাম্নী এক গোয়ালিনীর নিকট হইতে, দধি ক্রয় করেন, এবং জগন্নাথের হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়ক গোয়ালিনীর নিকট বন্ধক রাখেন। গোয়ালিনীকে বলিলেন "আমার পশ্চাতে যে রাজা আসিতেছেন, তিনিই তোমার দধির মূল্য দিয়া, অঙ্গুরী ফেরৎ নিবেন। এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন। গোয়ালিনী তদনুসারে রাজা আসিবামাত্র, সমস্ত বিবরণ বলিয়া অঙ্গুরীয়ক দেখাইল। রাজা ঐ অঙ্গুরীয়ক দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা জগন্নাথের অঙ্গুরীয়ক, এবং জগন্নাথ ও বলরাম, যোদ্ধৃবেশে

তাঁহার সহায়তা করিয়াছেন। রাজা তখন বুঝিলেন, ভগবান্ ভক্তের জন্য কতদূর কৃপা করিয়া থাকেন, এবং এই জন্যই ভগবান্ অর্জ্জুনের রথের সারথি হইয়াছিলেন। তখন রাজা ভাবে বিভোর হইলেন এবং মাণিক্যনাম্নী গোয়ালিনীকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে, ঐ গোয়ালিনীর নাম অনুসারে, অদ্যাবধি ঐ গ্রামের, মাণিক্য-পটনা নাম বর্ত্তমান আছে। মনে হয়, তদনুসারেই, মন্দির মধ্যেও শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও বলরামের যোদ্ধ্‌বেশে মূর্ত্তি, ও গোয়ালিনীর দধিভাণ্ডবাহিনী মূর্ত্তি, তিনিই অঙ্কিত করিয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তিই এই মূর্ত্তি—ভগবানের ভক্তবৎসলতার চিহ্ন-স্বরূপ বর্ত্তমান আছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিত্য পূজাপদ্ধতি।

প্রথম ভোরবেলা দ্বার খুলিয়া মঙ্গল আরতি হয়; তৎপর অবকাশ হয়, অর্থাৎ দন্তধাবন ও স্নান হয়, এবং তৎপর শিঙ্গার হয়, পরে ধুপ বা বাল্যভোগ হয়। ইহাতে ক্ষীর, নবনীত, দধি, নারিকেল, মুড়কি, মাখন, পাপরী, হংসকলী প্রদত্ত হয়। রাজভোগ—খেচরান্ন, বড়া ও পিষ্টকাদি দ্বারা হইয়া থাকে। তৎপর অন্নব্যঞ্জনাদি ভোগ হয়।

মধ্যাহ্ন-ধূপ বা দ্বিপ্রহর-ধূপ (ভোগ) যথা, তিপুরী, নারী, আরিসা, মাধুকুরী, মালপুয়া, উপাধিভোগ, ও অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রদত্ত হয়। অন্নভোগ ইত্যাদি ভোগমণ্ডপে দেওয়া হয়। সরগুয়ারি, পাখাল (পান্তা) সরবত, বড়াপিঠা, বি-ভাত হয়। পরে শিঙ্গার অর্থাৎ বেশ হয়। ইহার পর আরতি হয়,—আরতি হইয়া ৪টা পর্য্যন্ত দ্বার রুদ্ধ থাকে—এই সময়ে জগন্নাথ নিদ্রা যান। ৪টার পর জগন্নাথের নিদ্রাভঙ্গ হয়, নিদ্রাভঙ্গান্তে জিলাপী ভোগ দেওয়া হয়। সান্ধ্য-ধূপ বা অপরাহ্নভোগ, ইহা আরতি হইবার পর দেওয়া হয়। ইহাতে খাজা, গজা, মতিচুর, দধি প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য দেওয়া হয়। সন্ধ্যাভোগের পর চন্দনাদি অর্থাৎ চন্দন লেপন হয়। ইতঃপর নৈশভোগ বা বড় শিঙ্গার ভোগ। নৈশভোগের পূর্ব্বে, বেশ পরিবর্ত্তিত হইয়া নানা সুগন্ধ পুষ্পমালা দ্বারা ভূষিত হন। এই সময়ে বীণাকরের বাদ্য ও গীত-গোবিন্দ পাঠ হইয়া থাকে।

গীত-গোবিন্দ পাঠ সম্বন্ধে একটী আখ্যায়িকা আছে। এই ঘটনার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিকট গীত-গোবিন্দ পাঠ হইত না। এক সময়ে একটী স্ত্রীলোক বেগুনক্ষেতে বেগুন তুলিতেছিল আর গীত-গোবিন্দ গাহিতেছিল। গীত-গোবিন্দ জগন্নাথের এত প্রিয়, যে যেখানে গীত-গোবিন্দ পাঠ হয় বা গীত হয় সেখানে জগন্নাথ উপস্থিত হন।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তাঃ যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

এই কথার সার্থকতা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ সেই বেগুনক্ষেতে বেগুনওয়ালীর মুখে গীত-গোবিন্দ গান শুনিতে উপস্থিত হইলেন। এবং সেই বেগুনওয়ালীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হওয়াতে তাঁহার উত্তরীয় বসন ছিন্ন হইয়াছিল। এই বসন ছিন্ন হইবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া সেবক অবগত হইলেন, অর্থাৎ ভগবান্ জানাইলেন যে, এক বেগুনওয়ালী গীত-গোবিন্দ গায়িতেছিল, তৎপশ্চাৎ অনুসরণ করাতে বসন ছিন্ন হইয়াছে। "গীত-গোবিন্দ আমার অতি প্রিয়।" তখন হইতে মন্দিরে গীত-গোবিন্দ পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। গীত-গোবিন্দ-পাঠান্তে নৈশভোগ হয়—ইহাতে নানাবিধ ঘৃতপক্ব দ্রব্য, পিষ্টকাদি ও মিষ্ট সামগ্রী দেওয়া হয়। এই সময়েই রাজবাড়ীর প্রেরিত গোপালবল্লভ ভোগও দেওয়া হয়। ভোগ শেষ হইলে দেবদাসীর নৃত্য, গীত, ও বাদ্যাদি হইয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথের রাত্রি নিদ্রা হয়—ইহাকে রাত্রি পহুড় বলে। প্রাতঃকালে মঙ্গলারতির শেষে, এবং সন্ধ্যাকালেও সন্ধ্যারতির শেষে, সাধারণের মণিকোঠাতে প্রভুর দর্শনলাভ হইয়া থাকে।

জগন্নাথ ও বলরামের পূজা বিষ্ণুমন্ত্রে এবং সুভদ্রাদেবীর পূজা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্ত্রেতে হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীবলদেবের ধ্যান—

বলঞ্চ শুভ্রবর্ণাভং শারদেন্দুসমপ্রভম্।
কৈলাসশিখরাকারং ফণাবিকটবিস্তরম্॥

নীলাম্বরধরং স্নিগ্ধং বলং বলমদোদ্ধতম্ ।
কুণ্ডলৈকধরং দিব্যং মহামুষলধারিণম্ ।
মহাবলং বলধরং রৌহিণেয়ং বলং প্রভুম্ ॥

শ্রীশ্রীসুভদ্রামাতার ধ্যান—

সুভদ্রাং স্বর্ণপদ্মাভাং পদ্মপত্রায়তেক্ষণাম্ ।
বিচিত্র-বস্ত্র-সংচ্ছন্নাং হারকেয়ূর-শোভিতাম্ ॥
বিচিত্রাভরণোপেতাং মুক্তাহার-বিলম্বিতাং ।
পীনোন্নত-কুচাং রম্যামাদ্যাং প্রকৃতিরূপিকাম্ ॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাত্রীঞ্চ ধ্যায়েত্তামম্বিকাং পরাম্ ॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথের ধ্যান—

পীনাঙ্গং দ্বিভুজং কৃষ্ণং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্ ।
মহোরস্কং মহাবাহুং পীতবস্ত্রং শুভাননম্ ॥
শঙ্খচক্রগদাপাণিং মুকুটাঙ্গদভূষণম্ ।
সর্ব্বলক্ষণ-সংযুক্তং বনমালা-বিভূষিতং ॥
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-বিদ্যাধরোরগৈঃ ।
সেব্যমানং সদাদারুং কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ।
ধ্যায়েন্নারায়ণং দেবং চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদং ॥

সুদর্শনের ধ্যান—

সুদর্শন নমস্তেঽস্তু বিষ্ণুশস্ত্র নমোঽস্তু তে ।
নমস্তুভ্যং, নমস্তুভ্যং, নমস্তুভ্যং, নমোনমঃ ॥

পূজার বিধান, তান্ত্রিক এবং বৈদিক উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া বিহিত হইয়াছে। কাজেই, এখানে কোন সম্প্রদায়েরই ভেদাভেদ নাই। এখানে শাক্ত বৈষ্ণবের মারামারি নাই। প্রসাদের মাহাত্ম্য সর্ব্বজনস্পৃষ্ট হইলেও নষ্ট হয় না; সুতরাং নীচজাতিতে, যে হেয় জ্ঞান, তাহা এখানে নাই। শ্রীশ্রীজগন্নাথের মূর্ত্তি, প্রসাদমাহাত্ম্য এবং সর্ব্বজাতিতে সমভাব দেখিয়া, ইঁহাকে ব্রহ্ম বস্তুরই প্রতিকৃতি বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মের কোন মূর্ত্তি নাই, তিনি নিরাকার বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছেন। এখানে, সেই ব্রহ্ম পদার্থকেই নিরাকার বলিয়া পূজা করা হইয়াছে। সমস্ত অবতারের মূর্ত্তিই ব্রহ্মের স্বরূপ; কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্ত্তি, তাহা হইতে কিছু বিভিন্ন আছে—এই মূর্ত্তিত্রয়ের হস্তও নাই, পদও নাই। এই মূর্ত্তি যেরূপভাবে গঠিত, তাহাতে সাধারণ লোকে মনে করে, এবং এরূপ জনশ্রুতিও আছে যে, এই মূর্ত্তিত্রয় সম্পূর্ণ গঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই, মূর্ত্তিনির্ম্মাণ-গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করা হইয়াছিল, তজ্জন্যই হস্তপদ-বিহীন, অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক, তাহা নহে, শাস্ত্রও তাহা বলে না। "অপাণিপাদো যবনো-গৃহীতা" এই শ্রুতিরই প্রমাণস্বরূপ হস্তপদ অসম্পূর্ণ করা হইয়াছে। পরন্তু এই মূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই, বিরাট-ভাবের আভাস হৃদয়ে প্রতিফলিত হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের চক্ষু দর্শন করিলেই, একটী মহান্ ভাবের উদয়

হয়, তাহা যাঁহারা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন, এই মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার আভাস পাওয়া যায়, যথা—

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যম্
অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্ত-হুতাশ-বক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তং॥

শাস্ত্রও এই বিরাট আকারের প্রতিমূর্ত্তিরই সাক্ষ্য দিতেছে। এই সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দারুময় মূর্ত্তি, ভগবানের বিরাট আকারের প্রতিমূর্ত্তি (representation) বলিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে। ইহা শিল্পীর সুকৌশলতার অভাব, অথবা বৌদ্ধ প্রতিমূর্ত্তির যন্ত্র নহে। কাহারও কাহারও মতে, এই মূর্ত্তি ওঁকারের যন্ত্র-স্বরূপ। ওঁকার ত্রিগুণাত্মক বলিয়া, ব্রহ্মবস্তু তিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, এই তিন মূর্ত্তি পরমাত্মা, জীবাত্মা ও মায়ার প্রতিকৃতি। হস্তপদ নাই, ইহার অর্থ যে তিনি নিষ্ক্রিয়। যে বৃক্ষ ভাসিয়া আসিয়াছিল, তাহা ব্রহ্মস্বরূপ, সেই বৃক্ষ হইতেই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা নির্ম্মিত হইয়াছেন; সুতরাং সেই ব্রহ্ম পদার্থই তিনভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। আমরা ইঁহাদিগকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির

প্রতিনিধি বলিয়া মনে করি। গীতা অনুসারে, ভক্তি অর্থাৎ সুভদ্রা মধ্যবর্ত্তী হইয়াছেন।

মন্দিরের সেবকমণ্ডলী।

মন্দিরের সেবকমণ্ডলীর বর্ণনা এবং মন্তব্য, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের "জগন্নাথ মাহাত্ম্য" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা গেল, তজ্জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

এই মন্দিরে ৩৬টী সেবক, ৩৬টী বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত আছেন—এই জন্য ইঁহাদিগকে ছত্রিশ-নিয়োগ বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান নিয়োগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। পাণ্ডা নিয়োগ—ইঁহারা জগন্নাথদেবের পূজা কার্য্য করেন।

২। পশুপালক নিয়োগঃ—অর্থাৎ ইঁহারা ভগবানের বেশ করিবার জন্য, পুষ্পাদি রক্ষাপ্রযুক্ত, শুদ্ধ ভাষায় "পুষ্পপালক", অথবা পশুদেবতা, তাঁহাদের রক্ষা করা প্রযুক্ত, পশুপালক নামে অভিহিত।

৩। সূপকার নিয়োগ—ইহারা প্রভুর পাক কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

৪। প্রতিহারী নিয়োগ—বহির্দ্বারের রক্ষণাবেক্ষণ ইহাদের কার্য্য।

৫। খুণ্টিয়া নিয়োগ—ইহারা মন্দিরান্তর্ব্বর্ত্তী কপাট সকলের রক্ষক।

৬। গরাবড়ু নিয়োগ—ইহারা সমস্ত দেবতাদিগের আবশ্যকীয় জল যোগায়।

৭। বিমানবড়ু নিয়োগ—সংস্কৃতে বিমানবেড় নিয়োগ, ইহারা প্রভুর যাত্রা সময়ে বিমান বহন করে।

৮। দইতা নিয়োগ—ইহারা "ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য" বিশ্বাবসু বংশীয়। ইহারা দেবতার কলেবর পরিবর্ত্তন ও পাহণ্ডি বিজয় প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

৯। বিদ্যাপতি নিয়োগ—ইহারা দেবতার দয়িতা-দিগের সহিত সমস্ত কার্য্য এবং অনবসর সময়ে পূজা সম্পাদন করে—ইহারা বিদ্যাপতি বংশীয়।

১০। ভিতর ছেউ নিয়োগ—ইহারা মন্দিরের ভিতরের দ্বার সকল মুদ্রাচিহ্ন দিয়া বন্ধ করে এবং সময়ে সময়ে কার্য্য বিশেষে দেবতার পূজাও করে।

১১। সেকাপ নিয়োগ—ইহারা মন্দিরের যাবতীয় পদার্থের রক্ষক।

১২। তটাউ নিয়োগ—ইহারা মন্দিরের যাবতীয় কার্য্যের লেখক।

১৩। দেউলকরণ নিয়োগ—ইহারা মন্দিরে আয় ব্যয় লিখক।

১৪। উড়িষ্যার রাজ-নিয়োগ ঃ—ইঁহারাও একটী নিয়োগরূপে পরিগণিত। ইঁহারা স্নানপূর্ণিমা প্রভৃতি সময়ে কতক সেবাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

১৫। মুদিরথ নিয়োগ—সংস্কৃত নাম মুদ্রাহস্ত। ইঁহারা রাজার অনুপস্থিতি সময়ে, রাজকীয় কার্য্য সকল প্রতিনিধি-স্বরূপে নির্ব্বাহ করেন। এইরূপ নিয়োগ সমূহের কার্য্যাবলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে ; সমস্ত বর্ণনা করিলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইবে বলিয়া, এইস্থানে ক্ষান্ত হইতে হইল।

পাঠকগণ দেখুন, আধুনিক গভর্ণমেণ্ট কার্য্যনির্ব্বাহের যেরূপ বন্দোবস্ত করিতেছেন, অদ্য হইতে বহু বৎসর পূর্ব্বে পুরীস্থ মন্দিরের কার্য্যনির্ব্বাহের বন্দোবস্ত তদপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয় না! আর একটী বিশেষত্ব দেখুন, অধুনা সকল রাজকীয় বিভাগে বহু কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য তত্ত্বাবধারক নিযুক্ত হইয়াছেন, তথাপি অনেক স্থানে বিশৃঙ্খলা দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আবহমান কাল হইতে পুরীর পরিচর্য্যাকারকগণ শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন, যেন প্রত্যেক ব্যক্তি স্ব স্ব কার্য্যে অনুরাগসহকারে উপস্থিত হইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ করে ; কারণ যে ব্যক্তি যে কার্য্যে নিযুক্ত, সে ব্যতীত, অন্য দ্বারা সে কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না, অতএব, সকলে নিজ নিজ কার্য্যে তৎপর থাকে।

মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র মহাশয় নিয়োগদিগের

বন্দোবস্ত সম্বন্ধে প্রশংসা করিয়া, যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। এইরূপ সুশৃঙ্খলতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল পুরুষকারের দিক দিয়া যাঁহারা দেখিতে যান, তাঁহাদের পক্ষে এই মন্তব্যই ঠিক ; কিন্তু আমরা ইহার উপর আর কিছু যোগ না করিলে, এই মন্তব্য সম্পূর্ণ সমীচীন হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে পারি না। যেখানে কেবল পুরুষকারের দ্বারা কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, দেখিতেছি—সে শক্তি বহুদিন স্থায়ী হয় না, কতদিন পর্য্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে চলে, তৎপরে আর সেরূপভাবে চলে না, নানারূপ গোল বাধিয়া যায়। এখানে যে আবহমান কাল হইতে, এইরূপ সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চলিয়া আসিতেছে, তাহার কারণ কেবল পরিশ্রমের বিভাগ সুশৃঙ্খলরূপে পর্য্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই মনে করিব, না আরও কিছু আছে? আমরা যোগ করিতে চাই—শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কৃপা, জগন্নাথদেবের নিজের প্রতিজ্ঞা, পুরীবাসী সেবকদিগের ভক্তি ও বিশ্বাস। শ্রীশ্রীজগন্নাথ ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন যে, পরার্দ্ধকাল এখানে বাস করিবেন, সুতরাং তাঁহার কার্য্য তিনিই করেন, "লোকে বলে করি আমি।" তাহাতেই এত সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে।

দ্বিতীয় কারণ এই, জগন্নাথের সেবকগণ লেখা পড়া কিছুই জানেন না, বুদ্ধিও তাঁহাদের তেমন তীক্ষ্ণ নয়। কিন্তু

একটি জিনিষ তাঁহাদের যেমন আছে, তাহা অন্যের নাই—ইহা জগন্নাথের প্রতি তাঁহাদের অচলা ভক্তি। এই জিনিষ দ্বারা জগন্নাথকে একেবারে তাঁহারা আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন—এই জিনিষ যে সময়ে তাঁহারা হারাইবেন, তখন দেখিবেন, আমাদের পুরুষকারের যতরূপ বন্ধনরজ্জু সমস্তই শিথিল হইয়া যাইবে।

মহাপ্রসাদ ও নির্ম্মাল্য-মাহাত্ম্য

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ ও নির্ম্মাল্য মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে মুখবন্ধে সামান্যরূপে বর্ণন করিয়াছি, এখন বিশেষরূপেও স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করিতেছি। মহাপ্রসাদ যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাকশালায় থাকে, অথবা মন্দিরে পূজারি কর্ত্তৃক আনীত হয়, তখনও মহাপ্রসাদ বলিয়া গণ্য হয় না। নিবেদন হওয়ার পর হইতেই, ইহা মহাপ্রসাদ বলিয়া গণ্য হয়, তখন আর তাহাদের স্পৃষ্টদোষ থাকে না। ইহার প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

পদ্মপুরাণে—

তত্রান্নপাচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা জনার্দ্দনঃ।
তস্মাৎ তদন্নং বিপ্রর্ষে দৈবতৈরপি দুর্ল্লভম্॥

এখানে লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং পাক করেন, স্বয়ং বিষ্ণু তাহার ভোক্তা; এই অন্ন অতি পবিত্র, দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ।

বিষ্ণুপুরাণে—

নৈবেদ্যং জগদীশস্য অন্নপাকাদিকঞ্চ যৎ।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচারস্তু নাস্তি তদ্‌ভক্ষণে দ্বিজ ॥

হে দ্বিজ! জগন্নাথকে অন্নপানাদি যাহা উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার নাই।

অতিপাতক-পাপানি মহাপাপানি যানি চ।
তানি সর্ব্বাণি নশ্যন্তি জগন্নাথান্নভক্ষণাৎ ॥

অতিপাতক, মহাপাতকাদি সমস্ত পাপ, জগন্নাথের অন্ন ভক্ষণ করিলেই নাশ প্রাপ্ত হয়।

জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং মহাপাতকনাশনং।
ভক্ষণাৎ ফলমাপ্নোতি কপিলাকোটিদানজং ॥

জগন্নাথের নৈবেদ্য-ভক্ষণে মহাপাতক নাশ হয়, এবং কোটি গোদানের ফল হয়।

ন কালনিয়মো বিপ্রা ব্রতে চান্দ্রায়ণে তথা।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভুঞ্জীয়াৎ যদীচ্ছেন্মোক্ষমাত্মনঃ ॥

(গরুড় পুরাণে) মহাপ্রসাদ ভক্ষণের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। চান্দ্রায়ণ ব্রতেরও কোন কালনিয়ম নাই। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তি মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইবামাত্র, কোন বিচার না করিয়া ভক্ষণ করিবে।

বিষ্ণুপুরাণে—

জগন্নাথস্য নৈবেদ্যং নাস্তি সংস্পৃষ্ট-দূষণং।
সকৃৎ ভক্ষণমাত্রেণ পাপেভ্যো মুচ্যতে পুমান্॥

জগন্নাথের প্রসাদেতে সংস্পৃষ্টদোষ হয় না; একবার প্রসাদ ভক্ষণ মাত্রেই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

স্কন্দপুরাণে—

মহাপবিত্রং হি হরের্নিবেদিতং
নিযোজয়েদ্ যঃ পিতৃদেবকর্ম্মসু।
তৃপ্যন্তি তস্মৈ পিতরঃ পুরা তথা
প্রযান্তি লোকং মধুসূদনস্য তে॥

হরিকে নিবেদিত অন্ন অতি পবিত্র, পিতৃকর্ম্মে ও দেবকর্ম্মে উৎসর্গ করিলে, সমস্ত পিতৃকুল ও দেবতাগণ তৃপ্তিলাভ করেন, এবং তাঁহারা ভগবদ্ধামে গমন করেন।

কুক্কুরস্য মুখাদ্‌ভ্রষ্টং মমান্নং যদি জায়তে।
ব্রহ্মাদ্যৈরপি তদ্‌ভক্ষ্যং ভাগ্যতো যদি লভ্যতে॥

ভগবান্ বলিতেছেন, যদি আমার নিবেদিত অন্ন কুকুরের মুখ হইতে পতিত হয়, এবং ব্রহ্মাদি দেবগণ যদি তাহা সৌভাগ্যক্রমে লাভ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদেরও ভক্ষণীয়।

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
দুর্জ্জনেনাপি সংস্পৃষ্টং সর্ব্বমেবাঘনাশনং॥

শুষ্ক হউক, অথবা পর্য্যুষিত হউক, অথবা এক দেশ হইতে অন্য দেশে নীত হউক, অস্পৃশ্য জাতি দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলেও সেই মহাপ্রসাদে সমস্ত পাপ নাশ হয়, এবং তাহার মাহাত্ম্য কখনও হ্রাস হয় না।

এই মহাপ্রসাদ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে, একটী উপাখ্যান কথিত আছে। কথিত আছে যে, একটি আচারনিষ্ঠ বেদপারগ ব্রাহ্মণ, সপরিবারে জগন্নাথ-দেবের দর্শনার্থ জগন্নাথ ক্ষেত্রে উপস্থিত হন; এবং যথাবিধি শাস্ত্রোক্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করেন। পণ্ডিত মাত্রেই কিছু যুক্তি-শাস্ত্রের পক্ষপাতী। তাঁহারা মহাপ্রসাদ সম্বন্ধেও নানা কূট তর্ক উপস্থিত করিয়া, সকলের সম্বন্ধে মহাপ্রসাদ গ্রহণীয় কিনা, এবং শাস্ত্রসিদ্ধ কিনা, তাহা বিচার না করিয়া ছাড়েন না। এই ব্রাহ্মণ সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। তাঁহার বিচারে মহাপ্রসাদ তাঁহার পক্ষে ভক্ষণীয় নয় বলিয়া ঠিক করিলেন। তিনি জানেন না যে, এই স্থান শ্রুতি স্মৃতি পুরাণের অতীত।

দক্ষিণোদধিতীরস্থং দারুব্রহ্ম সনাতনং।
বিনা সাংখ্যং বিনা যোগং দর্শনাৎ মুক্তিদং ধ্রুবম্॥
শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত-নিয়মা বিদ্যন্তে নেহ পার্থিব॥

তিনি এই শাস্ত্র অবগত ছিলেন না, সুতরাং তিনি তাঁহার গণ্ডীর ভিতরেই রহিয়া গেলেন। তিনি আর মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন না। কিন্তু অচিরাৎ তিনি কুষ্ঠ

রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। বিচার করিয়া বুঝিতে পারেন না, এইরূপ পাপজ ব্যাধি তাঁহার কেন হইল—তিনি এখানে আসিয়া, এমন কি মহাপাতক করিলেন, যে জন্য এরূপ ব্যাধি তাঁহার হইতে পারে। এইরূপ চিন্তা করিয়া রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় স্বপ্ন দেখিলেন যে, মহাপ্রসাদ অবজ্ঞার জন্য তাঁহার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। তজ্জন্যই তাঁহার এই ব্যাধি। এখানে বিধিশাস্ত্রের প্রাধান্য নাই—এটী প্রেমের ক্ষেত্র—রাগানুগামার্গে ইহার ভজন। সুতরাং তিনি যে বিধিশাস্ত্র অনুসারে বিচার করিয়া প্রসাদ অবজ্ঞা করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার মহাপাতক হইয়াছে। তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন যে, তিনি যদি এই অন্ন মহাপ্রসাদ ভক্তিসহকারে পুনরায় গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই তিনি রোগমুক্ত হইবেন। তৎপরদিনই অতি শ্রদ্ধার সহিত প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া, তিনি সেই দুশ্চিকিৎস্য রোগ হইতে মুক্ত হইলেন। এটী যে প্রেমের ক্ষেত্র—বিধিমার্গ অনুসারে ভজন হয় না, তাহার আর একটী গল্প উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, যখন জগন্নাথে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সঙ্গে বহু ভক্তমণ্ডলী উপস্থিত হইয়াছিলেন। পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাপ্রভুর একজন পরম ভক্ত। তিনি একদিন শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব দর্শন করিতে যাইয়া, দেখেন জগন্নাথকে যত বস্ত্র

দেওয়া হইয়াছে, তাহার কোনখানিই ধৌত করিয়া দেওয়া হয় নাই। শাস্ত্র অনুসারে তাহা অবৈধ হইয়াছে। এ বিষয়ে তিনি অন্যান্য ভক্তগণের সহিত আলোচনা করেন। রাত্রিতে তিনি শুইয়া আছেন, এমন সময় নিদ্রাযোগে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব আবির্ভূত হইয়া, ক্রমাগত তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিতেছেন, এবং বলিতেছেন যে, তোমার এখনও এ জ্ঞান হইল না যে, জগন্নাথক্ষেত্র বিধিশাস্ত্রের অতীত। জাগিয়া দেখেন তাঁহার গণ্ডদেশ চপেটাঘাতে ফুলিয়া গিয়াছে। পরদিন প্রাতঃকালে অন্যান্য ভক্তগণ তাঁহার নিকট দেখা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন—কিন্তু তিনি সেদিন বহির্ব্বাটীতে আসিলেন না। তৎপর অনেকে ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিয়া তথ্য অনুসন্ধান করিলেন। তখন তিনি তাঁহাদিগকে গত রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া, তাঁহার গণ্ডদেশ যে ফুলিয়া গিয়াছে তাহা দেখাইলেন। তখন সকলেই জগন্নাথের যথেষ্ট কৃপা বলিয়া মনে করিলেন, এবং এই ক্ষেত্র বিধি নিষেধের অতীত স্থান বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইল। এইরূপ গল্প অনেক আছে। স্থানান্তরে কর্ম্মাবাইয়ের খিচুরীর উপাখ্যান উল্লিখিত হইয়াছে—তাহাতেও বিধি-মার্গের নিন্দা এবং প্রেমমার্গের প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দ্বাদশ মাসের উৎসব।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দ্বাদশ মাসে, যে যে উৎসব হইয়া থাকে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। বিস্তারিত বিবরণ পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে। বৎসরের প্রথম হইতে গণনা করিতে হইলে, বৈশাখ মাসে যে যাত্রা হয়, তাহাই প্রথম ধরিতে হয়; সেই হিসাবে চন্দনযাত্রাই প্রথম হয়। চন্দনযাত্রাকে প্রথম ধরিয়া উৎসবগুলির নাম এখানে লিপিবদ্ধ করা হইল। কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব প্রথমতঃ যে তারিখে, কি যে তিথিতে স্থাপিত হন, সেই অনুসারেও একরূপ গণনা করা হয়; তাহা হইলে স্নানযাত্রা প্রথম হইবে। পাঠক, যদি মনে করেন যে, স্নানযাত্রা সর্ব্বপ্রথম হওয়া উচিত, তাহা হইলে চন্দনযাত্রা সর্ব্বশেষে হইবে। জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা তারিখে, তাঁহার স্মৃতির জন্য স্নান-যাত্রা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনেকে এই ব্যাপারকে প্রথম ধরিয়া, দ্বাদশ মাসে, দ্বাদশ যাত্রা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কেহ কেহ চন্দন যাত্রা হইতেও আরম্ভ করিয়াছেন।

যাত্রার নাম।—১। চন্দনযাত্রা, অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে আরম্ভ হইয়া ২১ দিন থাকে; ২। রুক্মিণী-হরণ, জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্ল একাদশী তিথিতে হইয়া থাকে, ৩। স্নানযাত্রা;

৪। রথযাত্রা; ৫। ঝুলনযাত্রা; ৬। জন্মাষ্টমী; ৭। কালীয় দমন; ৮। রাসযাত্রা; ৯। গজোদ্ধারণবেশ; ১০। মাঘী-পূর্ণিমা; ১১। দোলযাত্রা; ১২। শ্রীরামনবমী; ১৩। দমনকভঞ্জিকা।

ইতঃপর—১৪। শয়ন একাদশী; ১৫। পার্শ্ব পরিবর্ত্তন; ১৬। উত্থান একাদশী; ১৭। দক্ষিণায়ণ; ১৮। উত্তরায়ণ; ১৯। প্রাবরণ; ২০। পোষ্যপূজা। এই কয়েকটী যাত্রা সমস্ত গ্রন্থের অনুমোদিত নয়। কোন্‌টী যাত্রা এবং কোন্‌টী উৎসব, তাহা নির্ণয় করা কিছু কঠিন। সুতরাং যাত্রা ও উৎসব একত্রেই দেওয়া হইল। যাত্রা উৎসবের অন্তর্গত হইতে পারে; সেই জন্য সমস্তই উৎসব বলিলে, আর কোন গোল থাকে না। রথযাত্রা এবং স্নানযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন যাত্রায়, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা যান না। মদনমোহন ইঁহাদের প্রতিনিধিরূপে যাইয়া থাকেন।

চন্দনযাত্রা—মদনমোহন, পঞ্চ পাণ্ডব সহ, নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলী করেন। এই উৎসবে চন্দন লেপন করা হয় বলিয়াই, ইহার নাম চন্দনযাত্রা।

রুক্মিণী-হরণ—শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রুক্মিণীকে বিমলার মন্দির হইতে হরণ করিয়া নেন। এই উৎসব জ্যৈষ্ঠ শুক্ল একাদশীতে অনুষ্ঠিত হয়।

স্নানযাত্রা—ইহা জগন্নাথের জন্মতিথি বলিলেই হয়। জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতে এই যাত্রা হইয়া থাকে। রোহিণীকুণ্ডের

জল দ্বারা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে স্নান করান হয়। এই উৎসবে বহুলোকের সমাগম হয়।

রথযাত্রা—আষাঢ় মাসের শুক্ল দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা হইয়া থাকে। প্রথমতঃ বলরামের রথ, পরে সুভদ্রার রথ ও তৎপরে জগন্নাথের রথ মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া, ঐ দিনেই গুণ্ডাবাড়িতে পৌঁছে। রথযাত্রা সমস্ত যাত্রার শ্রেষ্ঠ, এবং এই উপলক্ষে বহুলোক সংঘট্ট হইয়া থাকে। রথযাত্রার পুণ্য শ্রুতিও বিশেষ আছে, এবং লোকের বিশ্বাসও এই যে, "রথে তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।" এই ব্যাপার ৯ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়।

ঝুলনযাত্রা—শ্রাবণ মাসের শুক্ল একাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা তিথি পর্য্যন্ত পাঁচদিন ঝুলনযাত্রা হইয়া থাকে। মুক্তিমণ্ডপে মদনমোহন যাত্রা করিয়া থাকেন।

জন্মাষ্টমী—ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। জন্মোৎসব উপলক্ষে অনেক নৃত্যগীত হইয়া থাকে।

কালীয়দমন—শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণ একাদশীতে মদনমোহন মার্কণ্ড সরোবরে, সর্পের উপর কালীয়দমন উৎসব করিয়া থাকেন।

রাসযাত্রা—কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমা তিথিতে হইয়া থাকে। এই সময়ে অনেক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

গজোদ্ধারণবেশ—পৌষমাসে হয়। ভগবান্ যে পশুদিগের প্রার্থনাও শুনিয়া থাকেন, পিপীলিকার পায়ের নূপুরধ্বনিও

যে তাঁহার কর্ণগোচর হয় এবং ইতর প্রাণী পর্য্যন্তও যে তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হয় না, তাহার দৃষ্টান্ত স্থল গজোদ্ধারণবেশ। এটী একটী পুরাণোক্ত গল্প—এক সময়ে একটী গজ নদীতে স্নান করিবার জন্য নামিয়াছে, এমন সময় একটী কুম্ভীর আসিয়া তাহার পায়ে আক্রমণ করে। গজ এবং কুম্ভীরে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অন্য সমস্ত গজ, একত্রে সহায়তা করিয়া, কুম্ভীরকে ছাড়াইয়া আনিতে পারিল না—গজ ক্রমশঃই অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন সে অনন্যো-পায় হইয়া, ভগবান্ নারায়ণের শরণাপন্ন হইল। ভক্তবৎসল ভগবান্ তৎক্ষণাৎ গজকে উদ্ধার করিলেন। কুম্ভীরও ভগবৎ-স্পর্শে মুক্ত হইয়া গেল। উভয়েই শাপগ্রস্ত হইয়া পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিল। শাপমুক্ত হইয়া, তাঁহারা যথাস্থানে গমন করিলেন।

মাঘীপূর্ণিমা—মদনমোহন সমুদ্রজলে স্নান করেন এবং তৎপর পূজিত হন।

দোলযাত্রা—এই উৎসবও খুব জাঁকজমকের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হয়। মদনমোহন দোলবেদীতে যাইয়া থাকেন। এই সময়েও বহুযাত্রীর সমাগম হয়। ঠাকুরকে ফাগ্ বা আবীর দেওয়া হয়।

শ্রীরামনবমী—চৈত্র শুক্লা নবমীতে মদনমোহনকে রামবেশে সাজাইয়া পূজা দেওয়া হয়।

দমনকভঞ্জিকা—চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীতে জগন্নাথবল্লভ-বাগানে মদনমোহনের পূজা হয়।

শয়ন-একাদশী—আষাঢ়মাসের শুক্লা একাদশীতে হইয়া থাকে।

পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন একাদশী—ভাদ্র শুক্লা একাদশীতে হইয়া থাকে।

উত্থান-একাদশী— কার্ত্তিকমাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে হইয়া থাকে।

সংক্ষেপতঃ—এই সকল উৎসবের কথা লিখিত হইল। এই সমস্ত ছাড়া আরও অনেক উৎসব আছে।

পুরীর প্রসিদ্ধ মঠ ও অন্যান্য স্থান সমূহ।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের উৎসবের কথা লিখিত হইল; এখন পুরীর মধ্যস্থিত যে সকল মঠ বা প্রসিদ্ধ স্থান ও তীর্থ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

১। বড়ছাতা—জগন্নাথের মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারস্থিত সিংহদ্বারের সংলগ্ন, উত্তরদিকে সাধুদিগের আখ্ড়া।

২। রাজবাড়ী—বড় ডাণ্ডের অর্থাৎ বড় রাস্তার উত্তর অগ্রসর হইলে, পূর্ব্বপার্শ্বে পুরীর রাজারবাড়ী পাওয়া যায়।

৩। শুভনারায়ণের মঠ—এই মঠে শুভনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা জগন্নাথকে পাওয়ার জন্য, শুভ-নারায়ণকে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা অতি প্রাচীন স্থান।

৪। জগন্নাথবল্লভ মঠ—এই মঠের ভিতর প্রকাণ্ড বাগান আছে। এখানে মদনমোহন যাইয়া অনেক লীলা করিয়া থাকেন।

৫। নরেন্দ্র সরোবর—এই সরোবরে চন্দন যাত্রা হয়। সরোবরটী অতি বৃহৎ।

৬। জটীবাবার মঠ—ইহা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি-স্থান। মন্দিরটি অতি সুন্দর।

৭। মাসীমার বাড়ী—এখানে জগন্নাথদেবের মাসীমার মন্দির আছে।

৮। গুণ্ডাবাড়ী—এই স্থানে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা, রথের পরে ৯ দিন অবস্থান করেন। ইহা অতি পবিত্র তীর্থ। ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার স্ত্রী গুণ্ডিচা-রাণীর নাম অনুসারে গুণ্ডিচা বাড়ী নাম হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহাকে গুঞ্জবাড়ী বলা হইয়া থাকে।

৯। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার যজ্ঞীয় গরুর ক্ষুর হইতে এই সরোবর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা অতি পুণ্য-ক্ষেত্র—"ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ স্নাত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে।"

১০। মার্কণ্ডেয় সরোবর—মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, ভগবান্ এখানে সদা অধিষ্ঠিত আছেন জানিয়া, এবং তাঁহার মায়ার

তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া, এখানেই তপস্যার স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহর্ষির সুবিধার জন্য, এই সরোবর করিয়া দিয়াছিলেন। রাজা কুণ্ডল-কেশরী ১৮২০ খৃঃ অব্দে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এখানে অষ্ট মাতৃকা আছেন এবং মার্কণ্ডেশ্বর শিব আছেন। এই সরোবরে স্নান, ও জগন্নাথ দর্শন করিতে হয়। এখানে পিতৃ-পুরুষের পিণ্ডদান হইয়া থাকে। মার্কণ্ডেয়-সরোবরে স্নান করিলে পুনর্জ্জন্ম হয় না।

১১। চক্রতীর্থ।—এই তীর্থ পুরী ষ্টেশনের নিকট, বাকী মোহানায় সমুদ্র হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। এখানে প্রথমতঃ জগন্নাথ-নির্ম্মাণ জন্য, নিম্ব কাষ্ঠ ভাসিয়া লাগিয়াছিল। এই জন্য এই ক্ষেত্র অতি পবিত্র। এইখানে বলরাম দাস নামে এক ভক্ত, বালুর মঠ করিয়া; জগন্নাথের আরাধনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য এখানে বালুর মন্দির প্রস্তুত করিতে হয়। এখানে চক্র-নারায়ণ ও হনুমান্ আছেন।

১২। সমুদ্র—অতি পবিত্র তীর্থ। মন্দির হইতে এক মাইল দূরে, দক্ষিণে অবস্থিত। সমুদ্রে স্নান করিয়া, জগন্নাথ দর্শন করিলে, পুনর্জ্জন্ম হয় না। এখানে শ্রাদ্ধ ও ফলদান করা হয়।

১৩। স্বর্গদ্বার—এখানে ব্রহ্মা স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহাকে স্বর্গদ্বার বলে। অথবা এই

স্থানে স্নান করিলে, স্বর্গে যাওয়া যায় বলিয়া, স্বর্গের দ্বার-স্বরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। এখানে বিদুরাশ্রম, স্বর্গদ্বার-সাক্ষী হনুমান্, সুদামাপুরী, নানক এবং কবীরের মঠ আছে। নানক এবং কবীর উভয়েই পরম ভক্ত ছিলেন। কবীরের অনেক দোহা আছে। নানক-পন্থী মঠেতে একটি কুয়া আছে, তাহাকে গুপ্ত-গঙ্গা বলে। নানকের পুস্তক পূজা হইয়া থাকে। কবীরের মালা ও কাষ্ঠপাদুকা পূজিত হয়।

১৪। শঙ্কর-মঠ।—এই মঠে শঙ্করাচার্য্যের প্রস্তর-নির্ম্মিত অতি সুন্দর মূর্ত্তি আছে। এখানে শঙ্করাচার্য্যের মতাবলম্বী সাধুরা বাস করেন; এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনা হয়। শঙ্করাচার্য্যের জীবনী পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে। ইহাকে গোবর্দ্ধন মঠ বলিয়া থাকে। ইহা শঙ্করাচার্য্যের স্থাপিত চারি মঠের এক মঠ।

১৫। টোটা-গোপীনাথ—এখানে পদ্মাসনে আসীন গোপীনাথ মূর্ত্তি আছেন। প্রবাদ আছে যে, এই মূর্ত্তির ভিতরে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এখনও পাণ্ডারা পাঁচ সিকা লইয়া, জানুর ভিতরে ফাটাস্থান দেখাইয়া থাকে। এখানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে গদাধরের ভাগবত-পাঠ শুনিতেন। এখানে বলরাম, গৌর, নিতাই ও অদ্বৈত মহাপ্রভুর প্রতিমূর্ত্তি আছে।

১৬। হরিদাস মঠ—ব্রহ্ম হরিদাসের সমাধি স্থান। বিস্তারিত বিবরণ স্থানান্তরে লিখিত হইবে। এখানে

গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, তিন প্রভুর মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

১৭। রাধাকান্তের মঠ—এখানে রাধাকান্ত স্থাপিত আছেন। এখানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের গম্ভীরা লীলা হইয়াছিল। তাহার বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে, এইটিই কাশী মিশ্রের বাড়ী।

১৮। সিদ্ধ-বকুল—হরিদাস জগন্নাথে আসিয়া, এখানে বাস করেন। এখানে বকুল গাছ আছে, তাহার কেবল মাত্র বাকল অবশিষ্ট আছে। এই বৃক্ষের বিবরণ পশ্চাৎ লিখিত হইবে। এই স্থানও শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাক্ষেত্র।

১৯। লোকনাথ—এখানে লোকনাথ শিব বিরাজ করিতেছেন। মন্দির হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। শিবরাত্রি ছাড়া শিবলিঙ্গ সর্ব্বদা সমুদ্র-জলে মগ্ন থাকেন। জগন্নাথের লোকেরা ইঁহাকে অত্যন্ত ভয় করে। শিবরাত্রির সময় এখানে প্রকাণ্ড মেলা হয়।

যমেশ্বর শিব—শ্রীমন্দিরের অর্দ্ধ মাইল দূরে, দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। যমরাজার দ্বারা স্থাপিত বলিয়া, ইঁহাকে যমেশ্বর শিব বলে।

২১। কপাল-মোচন—ব্রহ্মার পঞ্চ মুণ্ডের এক মুণ্ড এখানে পতিত হয় বলিয়া, ইহার নাম কপালমোচন হইয়াছে।

২২। অলাবুকেশ্বর—ইহা ললাটেন্দুকেশরী কর্ত্তৃক

স্থাপিত। প্রবাদ আছে যে, এখানে ইঁহার পূজা দিলে অপুত্রা পুত্রবতী হয়।

২৩। শ্বেতগঙ্গা—ইহা একটী সরোবর। ইহার জল স্পর্শ করিলে, সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্বেত-মাধব এখানে বিরাজিত।

২৪। সার্ব্বভৌমের মঠ—শ্বেতগঙ্গার পরেই, সার্ব্ব-ভৌমের মঠ। ইহাকে গঙ্গামাতার মঠ বলে। এখানে সার্ব্বভৌমকে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ পশ্চাৎ দ্রষ্টব্য।

২৫। পুরী গোসাইয়ের কূপ—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ভক্ত পরমানন্দ পুরী এই কূপ খনন করান। কিন্তু বহুদূর খোঁড়ার পরেও এই কূপে জল উঠে না। মহাপ্রভু ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কূপ কেমন হইয়াছে? তিনি উত্তর করিলেন অভাগীয়া কূপ, জল উঠে নাই। মহাপ্রভু ঐ কূপ পরিক্রমণ করিয়া, গঙ্গাস্তব পাঠ করিলেন। তৎপর দিন দেখা গেল যে, কূপ জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তখন সকলেই বুঝিলেন যে, গঙ্গাদেবী এই কূপেতে আবির্ভূতা হইয়াছেন, এবং এই জল অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া, সকলে কূপের জলে স্নান করিলেন, এই কূপ অতি পবিত্র স্থান।

——০—

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের বাহিরের অশ্লীল ছবির আধ্যাত্মিক ও নানারূপ ব্যাখ্যা।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের বাহিরে নানারূপ অশ্লীল মূর্ত্তি দেখা যায়। এই সকল মূর্ত্তি, কেবল শিল্পনৈপুণ্য দেখাইবার জন্য, গঠিত হইয়াছে, কি ইহার অভ্যন্তরে কোনও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা চিন্তার বিষয়। বর্ত্তমান কালের রুচিতে, পাশ্চাত্য অনুকরণে, কোন কোন বাগানে উলঙ্গমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইবার জন্যই, নাকি এইরূপ করা হয়। কিন্তু আমাদের চক্ষে এরূপ দৃশ্য বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হয়। এইরূপ জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে, যে সমস্ত অশ্লীলমূর্ত্তি দেখা যায়, সেগুলিও আমাদিগের নিকট অপ্রীতিকর সন্দেহ নাই; কিন্তু আমাদের মনে হয়, ইহাতে কোন নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব নিহিত আছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব যে মণিকোঠার ভিতরে আছেন, তাহাও উদ্দেশ্য-ব্যঞ্জক।

ভগবান্ গুহাশায়ী কূটস্থ। আমাদের দেহে, অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পাঁচ কোষ আছে। প্রথমত অন্নময় কোষ, তৎপর প্রাণময়, তৎপর

মনোময়, তৎপর বিজ্ঞানময় ও সর্ব্বশেষে আনন্দময় কোষ। এই আনন্দময় কোষে পরমাত্মারূপী ভগবান্ বাস করিতেছেন। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে মণিকোঠার অভ্যন্তরে স্থাপিত করা হইয়াছে। সেই জন্যই বুঝি স্থানটী অতি নিভৃত। বাহিরের চতুর্দ্দিকটী আমাদের অন্নময় কোষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই মন্দিরের চারিটী কোঠা আছে। বাহিরের দিক্ অন্নময় কোষের সহিত তুলনা করা হইল, মণিকোঠাও আনন্দময় কোষের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এখন তিনটী কোঠা অবশিষ্ট রহিল—ভোগমন্দির, নাটমন্দির ও জগমোহন মন্দির। এই তিনটী কোঠার সহিত, যদি আর তিনটী কোষের তুলনা দ্বারা সামঞ্জস্য করা যায়, তাহা হইলে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হইতে পারে। এখন চিন্তা করিয়া দেখা যাউক, এ বিষয়ে কত দূর তুলনা করা যাইতে পারে। ভোগমন্দিরের সহিত প্রাণময় কোষের তুলনা করিতে হইবে। স্থূলতঃ দেখিতে গেলে, ভোগমন্দিরের সহিত প্রাণময় কোষের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না, কিন্তু একটু সূক্ষ্ম ভাবে বিবেচনা করিলে, বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। ইহা দেখিতে গেলে, প্রথমতঃ প্রাণময় কোষটী কি তাহা বুঝিতে হয়। এই কোষে আমাদের দেহস্থ পঞ্চবায়ুর অবস্থিতি স্থান। প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ, ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিতং

প্রাণময়কোষো ভবতি। (বেদান্তসার)—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পাঁচটি বায়ু আমাদের দেহে বর্ত্তমান। প্রাণো নাম প্রাগ্গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী, অপানো নাম অবাগ্গমনবান্ পায্বাদিস্থানবর্ত্তী, ব্যানো নাম বিশ্বগ্গমনবানখিলশরীরবর্ত্তী, উদানঃ কণ্ঠস্থানীয় ঊর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণবায়ুঃ, সমানঃ শরীরমধ্যগতাশিতপীতান্নাদিসমীকরণকরঃ, সমীকরণন্তু পরিপাককরণং রসরুধিরশুক্রপুরীষাদিকরণং। এই প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখিতেছি—প্রাণ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী; অপানবায়ু গুহ্য স্থানবর্ত্তী; ব্যান—সর্ব্বশরীরব্যাপী, উদান বায়ু কণ্ঠস্থানীয় ঊর্দ্ধগমন ও উৎক্রমণ বায়ু, ও সমান বায়ু শরীর মধ্যগত অন্নপীতাদি পরিপাককারী বায়ু। এই সমস্ত বায়ু দ্বারা আমাদের দেহের সমস্ত ক্রিয়া হইয়া থাকে। নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া প্রাণ বায়ু দ্বারা হয়, অপান ক্রিয়া অপানবায়ু দ্বারা হইয়া থাকে; ব্যান বায়ু দ্বারা সমস্ত শরীরস্থ রক্তসঞ্চালনাদি ক্রিয়া হইয়া থাকে, উদান বায়ুদ্বারা আমরা উদ্গীরণ প্রভৃতি ক্রিয়া করিয়া থাকি; সমান বায়ু দ্বারা আমাদের শরীরের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্ত পদার্থের সমীকরণ হইয়া থাকে (অর্থাৎ পরিপাক হইয়া থাকে)—রস, রুধির, শুক্র, পুরীষাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রাণময় কোষের ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম—এখন দেখি ভোগমন্দিরের সহিত ইহার কি সাদৃশ্য আছে। পক্কশালা বা পাকমণ্ডপ হইতে ভোগ পাক হইয়া এই মন্দিরে নেওয়া হয়। এই ভোগ মন্দিরটী

পক্কশালার সহিত একত্র করিয়া তুলনা করিলেই, সুবিধা হয়। পক্কশালায় পাক হইয়া ভোগমন্দিরে নিয়া, ভোগ নিবেদিত হয়। নিবেদিত হওয়ার পরে, নানাস্থানে ইহা বিলী হইতে থাকে ;—কতক রাজবাড়ীতে যায়, কতক মঠে যায়, কতক আনন্দবাজারে যায়, ও কতক খরিদ্দারেরা নেয়। এইরূপে সমস্ত অন্ন বিলী হইয়া যায়। সুতরাং ভোগ-মন্দিরও একটী যন্ত্র বিশেষ—এখানে উৎপন্ন হইয়া বিলীকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে। সমীকরণ ক্রিয়ার সহিত ইহার তুলনা করা যাইতে পারে। শরীরস্থ যন্ত্র বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া, যেরূপ অন্নপাকাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে, এখানেও সেইরূপ ভোগ আদি সমস্ত প্রস্তুত হইয়া, বিলী হইতেছে। অন্নাদি আহার্য্য সামগ্রী, যেমন একস্থানে একত্রিত হইয়া, নানা যন্ত্র দ্বারা নানাস্থানে বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এখানেও সেইরূপ ভোগ নানাস্থানে পরিচালিত হইতেছে। এই অবস্থা বিবেচনা করিয়া, আমরা প্রাণময় কোষকে ভোগমন্দিরের সহিত তুলনা করিলাম। এখন নাটমন্দিরের সহিত মনোময় কোষের তুলনা করিতে হইবে। মনোময় কোষেতে সমস্ত মন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত ক্রিয়া করিয়া থাকে—মনস্তু কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সন্মনোময়কোষো ভবতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি—বাক্-পাণি-পাদ-পায়ূপস্থানি। কর্ম্মে-ন্দ্রিয়ের সহিত মনের ক্রিয়া এই কোষেতে হইয়া থাকে। এখন, নাটমন্দিরে কি কার্য্য হয়, তাহা দেখা যাউক।

নাটমন্দিরে নৃত্যগীতাদি এবং ধ্যানধারণা প্রভৃতি হইয়া থাকে। ধ্যানধারণাদি মনের কার্য্য। এখানে নৃত্যগীতাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ক্রিয়া হইয়া থাকে। ধ্যান মনের কার্য্য, সুতরাং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মনের ক্রিয়া এইস্থানে হইতেছে দেখিতে পাই। অতএব, নাটমন্দিরকে মনোময় কোষের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

এখন, বিজ্ঞানময় কোষের সহিত, জগমোহনের তুলনা করিতে হইবে। বিজ্ঞানময় কোষেতে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধির ক্রিয়া হইয়া থাকে—বুদ্ধিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি। এই কোষের পর আনন্দময় কোষ। এই কোষ হইতে জীব জীবত্ব ছাড়িয়া ব্রহ্মত্বলাভের পন্থা প্রসারণ করিতে থাকে। এদিকে জগমোহনে গেলেই, ঠাকুর দর্শন হয়—জগমোহনে পৌঁছিতে পারিলে, মণিকোঠায় প্রবেশ করিতে, আর কোন গোল থাকে না। গোল ততক্ষণ, যতক্ষণ জগমোহনের দরজা খোলা না থাকে। এই জন্য বিজ্ঞানময় কোষের সহিত জগমোহনের বেশ তুলনা হইতে পারে।

এখন আমাদের পাঁচটি কোষের সহিত মন্দিরটির তুলনা করা হইল। এই ভাবেতে গ্রহণ করিলে, এই ছবিগুলির ব্যাখ্যা হইতে পারে। যে সাধক গুহাশায়ী পরমাত্মরূপী ভগবানকে লাভ করিতে চান, তাঁহাকে অন্নময় কোষ অর্থাৎ দেহজনিত সমস্ত রূপবিকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক,

স্রকচন্দনাদি বিষয়ভোগ বাসনা, এমন কি স্বর্গাদি সুখভোগে বীতস্পৃহ হইয়া, বেদান্তে যাহাকে—ইহামুত্র ফলভোগ-বিরাগ বলে,—সেই বিরাগ অবলম্বন করিয়া, ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। এই মন্দিরের সঙ্গে তুলনায় দেখিতে পাই যে, বাহিরের মূর্ত্তি সকল, সেই ভোগবাসনার পরিচায়ক।

এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া, জগন্নাথ দর্শন করিতে হইলে, এই সমস্ত বাহিরের মূর্ত্তিতে উপেক্ষা করিয়া, প্রবেশ করিতে হয়। সংসারে যাহারা ভগবৎ-তত্ত্ব-বিমুখ, তাহারা ভোগ-বিলাসেই রত থাকে, তাহাদের আর দেহাভ্যন্তরস্থিত চৈতন্যরূপী ভগবদ্দর্শনে ইচ্ছা জন্মে না। সেইরূপ, যাঁহারা জগন্নাথ দর্শন করিতে চান না, তাঁহারা বাহিরেব চিত্রই দর্শন করিবেন। এইরূপ অনেক লোক দেখা যায় যে; জগন্নাথ দর্শন না করিয়া, কেবল বাহিরের কারুকার্য্য দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন; তাহাতে একবার মন আকৃষ্ট হইলে, আর ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। ভগবদ্-ভক্তের ইহা একটি পরীক্ষা স্থল। ঐ সকল বাহ্যিক প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারিলে, একবার মনকে অন্তর্ম্মুখী করিতে পারিলেই, আর কোন ভয় থাকে না; তখন সাধক, অনায়াসেই ভগবদ্দর্শনে কৃতার্থ হইয়া যান।

দেখুন ভক্তগণ, ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে হইলে, বহু পরীক্ষা অতিক্রম করিতে হয়; তাই আবার বলি, শ্রীমন্দি-রের বাহিরের শিল্প-বিন্যাস-দর্শকদের এই পরীক্ষা স্থল।

দর্শকগণ, আপনারা মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, মনঃ স্থির করিয়া, একাগ্র ভাবে ধ্যান করিতে করিতে গমন করিবেন! দেখিবেন নামের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা—একবার ঠাকুরকে মনের ভিতর আনিতে পারিলেই, আর বাহিরের কোন বস্তুতেই স্পর্শ করিতে পারিবে না। সাবধান, বাহিরের ঐ সকল মূর্ত্তি দেখিবার জন্যই, যেন ব্যগ্রতা না জন্মে, তাহা হইলেই বিপদে পড়িবেন।

এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে আরও বিভিন্ন মত আছে। মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র মহাশয়, তাঁহার জগন্নাথ মাহাত্ম্য গ্রন্থে ঐ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরাও সেই কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করিতেছি। কেহ কেহ বলেন, এই অশ্লীল মূর্ত্তি মন্দিরে থাকিলে বজ্রপাত নিবৃত্তি হয়। ইহা যুক্তি দ্বারা সমর্থন করা কঠিন। ইহা দ্বারা বজ্রপাত নিবারণ হইতে পারে না, এরূপ মতও সমর্থন করা যায় না; কারণ শাস্ত্রে যখন প্রমাণ রহিয়াছে, তখন অস্বীকার কি করিয়া করি। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে, অনেক সময় যাহা অসম্ভব মনে করি, তাহাও সম্ভব হইতে পারে। শাস্ত্রকারেরা ত্রিকালজ্ঞ, দূরদর্শী, সুতরাং সে মত আমরা উপেক্ষা না করিয়া, তাহারও প্রমাণ উদ্ধৃত করিলাম।

অগ্নিপুরাণ ১০৪ অধ্যায়

অধঃ শাখা-চতুর্থাংশে প্রতীহারৌ নিবেশয়েৎ।
মিথুনৈরথবল্লীভিঃ শাখাশেষং বিভূষয়েৎ॥

বৃহৎ-সংহিতায়াং।
মিথুনৈঃ পত্রবল্লীভিঃ প্রমথৈশ্চোপশোভয়েৎ।
(অত্র মিথুনং নাম স্ত্রীপুরুষ-যুগলং)
জ্যোতিশ্চন্দ্রিকা-টীকায়াং—বজ্রপাতশঙ্কয়া ইন্দ্রাণ্যাদ্যা বন্ধাদেয়া ইতি।

কেহ বলেন, যে সকল অশ্লীল মূর্ত্তি মন্দিরের গায়ে দেখা যায়, তাহা অপরাধীদিগের মূর্ত্তি। মন্দির স্থান সকলের দৃষ্টিগোচর হইবে বলিয়া, এই স্থানে সেই মূর্ত্তি রাখা হইয়াছে। অপর কেহ বলেন, বৌদ্ধদিগের এ মন্দিরে প্রবেশ বন্ধ করিবার জন্যই, এই সকল অশ্লীল মূর্ত্তি রাখা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, যে সকল কুলোক আপনাদিগকে পাপী মনে করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে চায় না, তাহাদিগকে অভয় দিবার জন্য, এ সকল মূর্ত্তি মন্দিরের গাত্রে স্থাপিত হইয়াছে। পাপীদিগকে ইহাদ্বারা জানান হইয়াছে যে, তোমরা যতই কেন পাপী হও না, মোহান্ধকারে নিমজ্জিত হও না—জগন্নাথ তোমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য পতিতপাবন নাম ধারণ করিয়াছেন, জগন্নাথ অভয় দিতেছেন—কোন ভয় নাই। আবার কেহ বলেন, কোন কামুক রাজার অধীনে এই মন্দির ছিল, তাঁহার রুচি অনুসারে এই সকল মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। অন্য কেহ বলেন, আত্মা কূটস্থ, স্থূল দেহের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই।

দেহের কার্য্য যেরূপ হউক না কেন, তিনি নির্ব্বিকার। আর একটী মত এই যে, চিত্তস্থিরতা পরীক্ষা করিবার জন্য, এই সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। এই সকল মূর্ত্তিতে যাঁহাদের মন আকৃষ্ট না হইবে, তাঁহারাই দারুময় ব্রহ্মের অধিকারী। এইরূপ বিভিন্ন মত, বিভিন্ন রুচি অনুসারে প্রকাশ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে কোন কোন মত, আমরা যে মত পোষণ করিয়াছি, তাহা অনেক পরিমাণে সমর্থন করিতেছে। এখন পাঠকদের উপর ভার রহিল, তাঁহারা ভালমন্দ বিবেচনা পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন।

পূজ্যপাদ পরমভক্ত স্বর্গীয় বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়, এই মন্দিরের বাহিরের অশ্লীলতা ব্যঞ্জক যে সকল মূর্ত্তি আছে, তাহার যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিলাম—

"একদিন জনৈক নীতি পরায়ণ সাধু গোস্বামী প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে কতকগুলি অশ্লীলতা-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে কেন?' তদুত্তরে গোস্বামী প্রভু বলিলেন,—শাস্ত্রকর্ত্তৃগণ কিছুই বাদ দিয়া লেখেন নাই। জীবপ্রকৃতির নিম্নস্তরে যত প্রকারের কুৎসিত ভাব লুক্কায়িত আছে, তাহাই দেখান হইয়াছে মাত্র। আবার ঐ স্তর অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলে, জীব ক্রমশঃ কি প্রকার সুন্দর উচ্চাবস্থা লাভ করিতে পারে, রূপকছলে তাহাও দেখান হইয়াছে। মন্দিরের বহির্দ্দেশে, নিম্ন স্তরেই

ঐ সকল মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে, কিন্তু কয়েক স্তর উপরেই নানাপ্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি, তারপর ভগবানের অবতার ও লীলা-ব্যঞ্জক মূর্ত্তি, সর্ব্বোপরি শ্রীশ্রীজগন্নাথের মূর্ত্তি প্রকটিত করা হইয়াছে, এবং মন্দিরের অভ্যন্তরে, কোথাও ঐ প্রকার চিত্রের স্থান দেওয়া হয় নাই।"

(শ্রীমদাচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর—সাধনা ও উপদেশ)

আমার বন্ধুপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু নীলমাধব বসু, হাইকোর্টের উকিল মহাশয়ের মত এই যে, এই সমস্তই জগতের চিত্র—ভাল, মন্দ, বৃক্ষ, নদী, জীব, জন্তু, সমস্ত বিষয়ই চিত্রিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা জগতের চিত্র। বাহিরে জগতের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—ভিতরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কূটস্থ চৈতন্য-স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন।

দারুময় মূর্ত্তি বৌদ্ধ যন্ত্র কি না ?

কেহ কেহ বলেন যে, এই মূর্ত্তি বৌদ্ধ মূর্ত্তি ছিল ; তৎপরে হিন্দুরা এই মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তখন হইতে হিন্দুভাবে ইহার পূজা হইতেছে। ইতঃপূর্ব্বে বৌদ্ধেরা এই মূর্ত্তি পূজা করিত। এই কথা সম্ভবপর নহে, কারণ ভারতবর্ষে বহু বৌদ্ধ মন্দির আছে, তাহার কোনটাই হিন্দুরা গ্রহণ

করেন নাই। বিশেষতঃ বৌদ্ধদের কেন্দ্র স্থান গয়াক্ষেত্রে অত্যাপি বুদ্ধমূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। সেখানে হিন্দুরাই আধিপত্য করিতেছেন, অথচ সেই বুদ্ধমূর্ত্তিকে তাঁহারা দেবতা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাই বলি, হিন্দুদের এমন কি দরকার ছিল যে, বৌদ্ধমূর্ত্তিকেই তাঁহাদের পূজা করিতে হইবে, এবং তদনুসারে বহু শাস্ত্র-জাল করিতে হইবে। এরূপ বাক্যের কোন সারবত্তা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পণ্ডিতবর মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র জগন্নাথ-মাহাত্ম্য নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন; তাহাতে সমীচীন যুক্তি প্রদর্শন করিয়া, এই সকল মত খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা অন্য যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া, আর অধিক পর্য্যালোচনা করিলাম না।

এই মূর্ত্তি যে পূর্ণব্রহ্মের প্রতিকৃতি, এবং ইহা যে বহু-শাস্ত্রানুমোদিত, ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি নয়, তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। আবার বলিতেছি, ইহা ভগবানের বাক্য যে, তাঁহাকে সহজে দেখা যায় না। তিনি যে পর্য্যন্ত চক্ষুদান না করিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহ বুঝিতে পারিবে না। অর্জ্জুন তাঁহার নিয়ত সঙ্গী, তথাপি তাঁহাকে তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তাই গীতাতে বলিতেছেন—

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥

তখন, ভগবান্ তাঁহার স্বরূপ দেখাইলেন—

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমংরূপমৈশ্বরম্
অনেক-বক্ত্রনয়ন-মনেকাদ্ভুত-দর্শনম্ ।
অনেক-দিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥

এই বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিয়া, অর্জ্জুন বলিতেছেন—

অনেক-বাহূদর-বক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্ ।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥

* * * * *

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি ।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥

অর্জ্জুন এইরূপ দেখিয়া, অতীব ভীত হইয়া, পুনরায় তাঁহাকে স্তব করিতেছেন—

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তুতে দেববর প্রসীদ
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥

অর্জ্জুন তখন, তাঁহার এই উগ্রমূর্ত্তির স্বরূপ জানিতে চাহিলেন, এবং কি ইচ্ছায় যে এই রূপ ধরিয়াছেন, তাহাও জানিতে চাহিলেন। ভগবান্ বলিলেন, লোকক্ষয়ের জন্যই আমার এই রূপ, লোক সকলের সংহার করিবার জন্যই, ইহলোকে প্রবৃত্ত রহিয়াছি। তুমি কিছুই কর না, সমস্তই আমি করিয়া থাকি।

ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।

তখন অর্জ্জুন, সমস্ত তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন। তখন বলিলেন—

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥

অর্জ্জুন তখন স্তব করিতেছেন, পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছেন এবং বলিতেছেন—তুমিই পুরাণ পুরুষ, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সর্ব্বেশ্বর, তোমাকে যে আমি "হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখা" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি, ইহার কারণ আমি তোমার অনন্ত মহিমা বুঝিতে পারি নাই, তাই ভালবাসার ভাবে, তোমাকে আমি এইরূপে সম্বোধন করিয়াছি। এখন পাঠক বুঝিতে পারেন, ইহা তাঁহারই বিরাট-রূপ, অর্জ্জুনের দৃষ্ট বিশ্বরূপের প্রতিকৃতি। আর আমাদের যে সুন্দর

শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি তাহা ভালবাসার মূর্ত্তি, এই দুই রূপই অর্জ্জুনের দ্বারা ভগবান্ ব্যক্ত করাইয়াছেন। এই বিরাট্ রূপ—এই কল্পতরু দারুব্রহ্ম রূপের নিকট, যিনি যেরূপ দেখিতে চান, তাঁহাকে সেই রূপেই দেখা দেন। যদি কেহ ভাল-বাসার মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণরূপ, কিম্বা রামরূপ, কিম্বা অন্যান্য অবতারের মূর্ত্তি দেখিতে চান, তিনি এই মূর্ত্তির ভিতর দিয়াই, তাহা দেখিতে পাইবেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই মূর্ত্তির ভিতরে শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শন করিয়াছেন,—কেহ গণেশরূপ দেখিয়াছেন, কেহ রামরূপ দেখিয়াছেন। সুতরাং এই রূপ, নিরাকার এবং সাকার, উভয় রূপেরই প্রতিকৃতি।

:০:-

কালাপাহাড়।

কালাপাহাড়ের নাম আপনারা সকলেই অবগত আছেন। ইনি হিন্দুদের অনেক দেবদেবী মূর্ত্তি ভগ্ন করেন ও অনেক মন্দির বিধ্বস্ত করেন। কালাপাহাড় জগন্নাথকেও অব্যাহতি দেন নাই; কালাপাহাড়ের বৃত্তান্ত, এখন পর্য্যন্তও নিশ্চিত ভাবে বাহির হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার পূর্ব্ব নাম ছিল কালাচাঁদ; আবার কেহ বলেন নিরঞ্জন ভট্টাচার্য্য নামে জনৈক ব্রাহ্মণ, শেষে কালাপাহাড় নামে পরিচিত হন। কেহ কেহ বলেন, ইনি পূর্ব্বে রাজু নামে

অভিহিত হইতেন। কামরূপে ইনি পোড়াঠাকুর ও কালযবন নামে খ্যাত।*

যাহা হউক, যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তিনি একজন ব্রাহ্মণকুমার ছিলেন, মুসলমান নবাব সুলেমানের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া, তিনি পরিশেষে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই নবাব-কন্যা কোন সময়ে, পুরুষবেশে ইহার চাকরী প্রার্থনা করেন। তিনি নবযুবককে বেশ বুদ্ধিমান্ বিবেচনা করিয়া চাকরীতে নিযুক্ত করিলেন। এক সময়ে কালাপাহাড় এক মুসলমান জমিদারের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। সেই মুসলমান তাঁহাকে গুপ্তভাবে ছোরা নিক্ষেপ করে। ছদ্মবেশী নবাব কন্যা, ঐ ছোরা, আঘাত করিবার পূর্ব্বেই, ধরিয়া ফেলে। ইহাতে কালাপাহাড় বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে ঈপ্সিত পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত হন। নবাব-কন্যা তখন, তাঁহার গুপ্তবেশ পরিত্যাগ করিয়া, সুলেমানের কন্যা বলিয়া পরিচয় দেন, এবং তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তৎপর, তিনি মুসলমান-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নবাব কন্যাকে বিবাহ করেন। ইহার পর, তিনি দায়ুদের প্রধান সেনাপতি হন, এবং কামাখ্যা,

---

* শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের সামাজিক ইতিহাস অনুসারে, ইনি রাজসাহী নিবাসী বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ কুমার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

কাশী-বিশ্বেশ্বরের মন্দির সকল ভগ্ন ও বিধ্বস্ত করেন। ১৫৯৫ খৃঃ অব্দে তিনি উড়িষ্যা অভিযান করেন। সেই যুদ্ধে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব নিহত হন। তৎপর, কালাপাহাড় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে পোড়াইতে চেষ্টা করেন। পাণ্ডারা এই কথা শুনিয়া জগন্নাথদেবকে চিল্কাহ্রদে গড়পাড়িকোদে লুকাইয়া রাখেন। কালাপাহাড় সেখান হইতে, ঠাকুরকে আনিয়া, অগ্নিতে দগ্ধ করিবার চেষ্টা করেন। সে সময় পাণ্ডাদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। কিন্তু পাণ্ডারা ঠাকুরকে রক্ষা করিতে পারেন না। ইহার পর, যে কোন প্রকারেই হউক, বেসর মহান্তি, ঐ ঠাকুর অৰ্দ্ধদগ্ধাবস্থায় প্রাপ্ত হন; এবং তাঁহাকে কোন নিভৃত স্থানে নিয়া রাখেন। বিশ বৎসর পরে, খুড্দার রাজা রামচন্দ্র দেব, প্রভু জগন্নাথের ব্রহ্মমণি লইয়া, নিম্ব কাষ্ঠের মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে ব্রহ্মমণি স্থাপন করতঃ, এই মন্দিরে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পাণ্ডাদের সহিত যুদ্ধে কালাপাহাড় আহত হন, এবং তাহা হইতেই শেষে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মুসলমানদের ইতিহাস অনুসারে কালাপাহাড় ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে মোগলবাহিনীর তোপে ভূতলশায়ী হইয়া নিহত হন। এই কালাপাহাড় এবং মুসলমানদের ইতিহাসের কালাপাহাড় এক কিনা, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। এই দুইটির সামঞ্জস্য করিতে হইলে, কালাপাহাড়ের দুইবার আক্রমণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। ১৫৩৫ খৃঃ অব্দে যখন

কালাপাহাড় আক্রমণ করেন, তখন কেবলমাত্র মুকুন্দদেবকে পরাজিত করিয়াই চলিয়া যান, সে বারে আর পুরীতে আসেন না। তৎপর ১৫৮৬ খৃঃ অব্দে মুকুন্দদেবের পুত্র গৌড়ীয় গোবিন্দের রাজত্বকালে, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, কালাপাহাড় পুরী লুণ্ঠন এবং জগন্নাথকে দগ্ধ করেন। সেই যুদ্ধেতেই আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময়ে আকবরের সৈন্যের সহিত দায়ুদ খাঁর সেনা-নায়ক কালাপাহাড় প্রভৃতির সহিত কটকে যুদ্ধ হয়। তাহাতে কালাপাহাড গোলার আঘাতে ভূতলশায়ী হন বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় পাণ্ডাদের আঘাত পূর্ব্বে হইয়া, গোলার আঘাত পরে হয়। এই উভয় আঘাতই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। জগন্নাথের উপর এইরূপ ব্যবহারই তাঁহার মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।

—০—

জগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে গিয়া, জগন্নাথের মন্দিরের বহির্ভাগে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই মূর্ত্তিটি কেন এখানে সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা জানিবার জন্য স্বভাবতঃ কৌতূহল জন্মে। এই মূর্ত্তিটি কাহার এবং

ইহার তত্ত্ব জানিবার জন্য সকলেরই আগ্রহ জন্মিতে পারে। এই আগ্রহ পরিতৃপ্তির জন্য, এই বস্তুটি কি, তাহার অবতারণা করা আবশ্যক—আরও প্রয়োজন এই যে, জগন্নাথের লীলার সহিত এই জিনিষটির এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সম্বন্ধে যদি বিশেষ রূপে উল্লেখ করা না যায়, তাহা হইলে, শ্রীজগন্নাথদেবের প্রকৃত মাহাত্ম্যেরই অসম্পূর্ণতা থাকে। প্রায় অর্দ্ধেক লীলার সহিত এই মূর্ত্তিটির সম্বন্ধ রহিয়াছে, সুতরাং এই বস্তুটি কি, তাহা দেখিবার জন্য, আমরা নিম্নে তাহার বৃত্তান্ত উল্লেখ করিলাম।

—o—
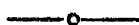
সার্ব্বভৌমের ষড়্ভুজ-মূর্ত্তিদর্শন ও নবদ্বীপে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সংক্ষিপ্ত জীবনী।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ।
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বল-রসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং।
হরিঃ পুরট-সুন্দরদ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিতঃ।
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

অস্যার্থঃ। যে উন্নতোজ্জ্বল ভক্তি-রসাস্বাদ হইতে জীব সুদীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল, সেই পরম বস্তু প্রদানার্থ,

করুণাপরবশ হইয়া, কলিতে অবতীর্ণ, দিব্যোজ্জ্বল-সুবর্ণ-কান্তি শ্রীহরি শচীনন্দন, তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদ-কমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবং।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণ-চৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণ-পাদান্ সহগণ-ললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

আমরা মন্দিরে যে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি। তিনি সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিতে পুরীধামে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জন্যই এই ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করেন। এদেশের লোকেরা শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে ভাল করিয়া জানেন না, সুতরাং তাঁহার একটু সংক্ষিপ্ত জীবনী থাকা আবশ্যক। ১৪০৭ শকে ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে, নবদ্বীপে শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ব্ভে, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার জন্মমাত্র, চতুর্দ্দিক হইতে বহুলোক আসিতে লাগিল—সমস্ত দেবগণ নরদেহ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, তজ্জন্যই তখন অনেক লোকের ভিড় হইয়াছিল। চৈতন্য চরিতামৃত হইতে ইহার একটী প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি—

চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণ-প্রেম-মুগ্ধ হইয়া।
ব্রহ্মা শিব শনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥

কৃষ্ণনাম লইয়া নাচে প্রেম-বন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদ আসি মনুষ্য প্রকাশে ॥

চৈতন্যদেবের অঙ্গকান্তি গৌর বলিয়া, তাঁহার গৌরাঙ্গ নাম হইয়াছিল। তিনি বাল্যকালে চঞ্চলপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি শৈশবকাল হইতেই, অসামান্য বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই, তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত হন, এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে পরাজিত করেন। ন্যায়শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ অদ্বিতীয় পণ্ডিত রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার সমপাঠী ছিলেন। (এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়) কিন্তু মহাপ্রভুর প্রতিভার নিকট, রঘুনাথের প্রতিভা নিষ্প্রভ হইয়াছিল। মহাপ্রভুর বিদ্যার আলোচনা আর বেশী দিন চলিল না। অল্পদিন পরেই, তাঁহার পিতার পিণ্ডদান করিবার জন্য গয়াধামে যান। সেই স্থানেই তাঁহার জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত হয়। সেখানে, ঈশ্বর পুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং তাঁহার নিকট দীক্ষিত হন। দীক্ষিত হওয়ার পর হইতেই, তিনি একেবারে অন্যরূপ হইয়া গেলেন। দিবারাত্র ভগবৎ-চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান আর থাকিত না। হরিনামেতে একেবারে পাগল হইয়া গেলেন—

গয়াধামে ঈশ্বর পুরী কিবা মন্ত্র দিল।
সেই হইতে গোরা মোর পাগল হইল ॥

(অমিয় নিমাই চরিত)

কয়েকদিন পরে, গৌরাঙ্গদেব দেশে ফিরিলেন, তখন আর সেই বিদ্যা চর্চ্চা রহিল না; দিন রাত্রি, কেবল হরি নামেই তিনি বিভোর হইয়া থাকিতেন। শচীমাতা পুত্রের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া মনে করিলেন, নিমাই হয় পাগল হইয়াছে, না হয় তাঁহার বড় পুত্র বিশ্বরূপের মত সংসার ছাড়িয়া যাইবে। এই ভাবিয়া, অদ্বৈত মহাপ্রভু, শ্রীবাসাচার্য্য এবং অন্যান্য পাড়ার বৃদ্ধদিগকে ডাকাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন; তাঁহার নিমাইএর কি হইয়াছে? অদ্বৈত, শ্রীবাসাচার্য্য এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ; তাঁহার ভাব দেখিয়া, অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের শুভদিন উপস্থিত মনে করিলেন। কারণ চৈতন্যের মত পণ্ডিত তাঁহাদের সম্প্রদায় ভুক্ত হইলে, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। সকলেই শচীমাতাকে আশ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। এই নবযুগের প্রথম আরম্ভ! এখন হইতে শ্রীবাসাচার্য্যের বাড়ী হইল অভিনয়ক্ষেত্র। সারাদিন রাত্র শ্রীবাসের বাড়ীতে হরিনামের বিরাম নাই। মহাপ্রভু কোন দিন বাড়ীতে যান, কোন দিন তাহাও ঘটে না। বৃদ্ধা মাতা, যুবতী স্ত্রী, কাহারও সহিত আর সম্পর্ক রহিল না। অহর্নিশ কেবল হরিনামকীর্ত্তনে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, চতুর্দ্দিক হইতে ভক্তমণ্ডলী দলে দলে আসিয়া জুটিতে লাগিল। সন্ন্যাসী প্রভু নিত্যানন্দ,

ব্রহ্মহরিদাস, মুরারিগুপ্ত, পুরুষোত্তমাচার্য্য, শ্রীধর, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভৃতি বহুভক্ত নানা দিগ্‌দেশ হইতে, নদীর ন্যায় সাগরোপম মহাপ্রভু চৈতন্য দেবেতে সম্মিলিত হইলেন। ভূগর্ভ ও লোকনাথ আসিলেন। তাঁহারা আসিবামাত্র, মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে চির-পরিচিতের ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন। অতঃপর, তাঁহাদিগকে লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের জন্য পাঠাইলেন। এদিকে, নবদ্বীপে কাজীকে উদ্ধার করিলেন; জগাই মাধাই উদ্ধার হইল। প্রভু বিষ্ণু-খট্টায় বসিলেন; এই ঈশ্বরভাবে অষ্ট প্রহর ছিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর পূজাগ্রহণ করিলেন, অনেক ভক্তকে কৃপা করিলেন। তৎপর শ্রীবাসের মৃতপুত্রের জীবন সঞ্চার করিলেন, এবং তাহার দ্বারা, কে কাহার পিতা, কে কাহার পুত্র, এইরূপ উপদেশ দেওয়ার পর, মৃতপুত্রকে বিদায় দিলেন। আবার যখন মানুষভাব ধারণ করিলেন, তখন দীন হীন কাঙ্গালভাবে সকলের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। এখন যে শ্রীবাসাঙ্গনে আনন্দোৎসব হইতেছিল, তাহা আর বেশী দিন রহিল না, হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হইল। কৃষ্ণবিরহে শ্রীমতীর যে ভাব হইয়াছিল, সেই ভাব হৃদয়ে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তিনি হঠাৎ নীরব হইলেন।

> এই যে ধনী কৃষ্ণ কথা কইতেছিল
> কথা কইতে কইতে নীরব হ'ল ॥

মহাপ্রভু হৃদয়ের ভাব নিতাইকে উথারিয়া বলিতেছেন, যথা—

আমার মন যেন আজ কেরেরে কেমন
আমায় ধর নিতাই—
জীবকে হরিনাম বিলাতে লাগল যে ঢেউ প্রেম-নদীতে
সেই তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া যাই।
যে দুঃখ আমার অন্তরে ব্যথিত কেবা, ক'ব কারে
জীবের দুঃখে আমার হিয়া বিদারিয়া যায়।
আমার সঞ্চিত ধন ফুরাইল জীবোদ্ধার নাহি হ'ল
ঋণের দায়ে আমি এখন বিকাইয়া যাই।

এই ভাবে শ্রীমুখ মলিন হইয়া গেল; কেবল ভাবেন জীবোদ্ধার হইল না। সকলেই বুঝিতে পারিলেন, প্রভু আর সংসারে থাকিতেছেন না। বৃদ্ধা মাতা, যুবতী ভার্য্যা এবং সুখের গৃহ, ত্যাগ না করিলে, কেহ তাহার ধর্ম্ম লইবে না, এই ভাবিয়া, একদিন শেষ রাত্রিতে মাতা ও স্ত্রীকে জন্মের মত দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া, ভক্তদের অজ্ঞাতে গৃহত্যাগ করিয়া, কাটোয়াতে কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। চাচর কেশ মুড়াইলেন, নটবর বেশ ছাড়িয়া, ডোর কৌপীন ও দণ্ডধারণ করিলেন। কাটোয়া হইতে শান্তিপুরে ভক্তগণসহ ফিরিলেন। ভক্তগণের ইচ্ছা প্রভুকে নদীয়ায় রাখেন, কিন্তু তাহা হইল না।

সন্ন্যাসী বেশে প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গ

U. RAY & SONS

প্রভু মাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া যাইবেন,—কিন্তু গৃহে যাইবেন না, স্ত্রীর সহিত দেখা করিবেন না। সুতরাং মাতাকে শান্তিপুরে আনিতে হইল। অদ্বৈত প্রভুর গৃহে কয়েকদিন থাকিয়া, মায়ের ইচ্ছা অনুসারে পুরীধামে গমন করিলেন। নিত্যানন্দ প্রমুখ কয়েকজন ভক্ত সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার আর কাহারও দিকে লক্ষ্য নাই, কেবল জগন্নাথ ধ্যান করিতে করিতে চলিলেন। অবশেষে পুরীধামে উপস্থিত হইয়া, জগন্নাথের চক্র দর্শন করিলেন। তখন তিনি পাগল হইয়া, মন্দিরাভিমুখে ছুটিলেন, ভক্তগণ পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন। প্রভু এক দৌড়ে মহাপ্রভুর মন্দিরের অভ্যন্তরে, মণিকোঠার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিবেন, এই অভিপ্রায়ে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন, এমন সময় জগন্নাথের সেবকগণ বাধা দেওয়ায়, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শরীরে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের বিকার হইতে লাগিল। এদিকে ছড়িদারগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল, এমন সময়ে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য (বাসুদেব ভট্টাচার্য্য) তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি চৈতন্য মহাপ্রভুর তেজঃপুঞ্জ শরীর, সন্ন্যাসীবেশ, নবীন বয়স, দিব্য কান্তি, সাত্ত্বিক-ভাব-পরিপূর্ণ আকৃতি, মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখিয়া, ছড়িদারদিগকে সরাইয়া দিলেন; এবং এই নবীন সন্ন্যাসীকে তাঁহার বাসায় নিয়া যাওয়ার জন্য, সকলকে আদেশ করিলেন।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মন্দিরের কর্ত্তাবিশেষ, মন্দিরের সমস্ত কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ছিল। তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রের দ্বার-পণ্ডিত, এবং ধর্ম্মবিষয়ের পরামর্শ-দাতা ছিলেন। ৺কাশী-ধামে প্রকাশানন্দ, যেমন বেদে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, সেইরূপ বাসুদেব সার্ব্বভৌমও ষড়্ দর্শনে ভারতবর্ষে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। মিথিলা হইতে ইনিই সমস্ত ন্যায় শাস্ত্র মুখস্থ করিয়া আনিয়া, নবদ্বীপে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইতি-পূর্ব্বে এদেশে ন্যায়শাস্ত্রের কোনও পুস্তক ছিল না, মিথিলাতে পুস্তক রাখিয়া দিত। ইনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাসায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, প্রভুর মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে, এবং ভক্তগণও তখন মিলিত হইয়াছে। তখন সকলেই একটু শান্ত হইলেন। ভট্টাচার্য্যের সহিত শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আলাপ আরম্ভ হইল। আলাপের দ্বারা সার্ব্বভৌম বুঝিলেন, সন্ন্যাসী ভক্ত ও বুদ্ধিমান্, পণ্ডিতও বটে, দীনতাও যথেষ্ট, কিন্তু দোষের মধ্যে এই যে বেদান্ত পড়া নাই। তজ্জন্য তিনি সন্ন্যাসীকে বেদান্ত পড়িতে উপদেশ দিলেন—তিনিও পড়িতে স্বীকার করিলেন। সাত-দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বেদান্ত পড়াইলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী কোন কথাই বলেন না দেখিয়া, সার্ব্বভৌম কিছু বিরক্ত হইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "সাতদিন পর্য্যন্ত তোমাকে পড়াইলাম কিন্তু কোন কথাই জিজ্ঞাসা কর না, এবং বুঝিলে কিনা তাহাও বুঝিতে পারিলাম না।" তখন প্রভু উত্তর করিলেন।—

"প্রভু কহে সূত্রের অর্থ বুঝিয়ে নির্ম্মল।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি মন হয়ত বিকল॥"
(চরিতামৃত)

মূল সূত্রের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি, কিন্তু তুমি যে ব্যাখ্যা করিতেছ, তাহা বুঝি না।

সূত্রের মুখ্য অর্থ না কয় ব্যাখ্যান।
কল্পনার্থে তুমি তাহা কর আচ্ছাদন॥

এই কথারপর রীতিমত বিচার আরম্ভ হইল। সার্ব্বভৌম নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য—

ভট্টাচার্য্য পূর্ব্ব পক্ষ অপার করিল।
বিতণ্ডা চ্ছল নিগ্রহাদি অনেক উঠাইল॥
সব খণ্ডি প্রভু নিজ মত সে স্থাপিত করিল॥
ভগবান্ সম্বন্ধ ভক্তি অবিধেয় হয়ে।
প্রেমে প্রয়োজন বেদে তিন বস্তু কয়ে॥
সৎ চিৎ আনন্দময় ঈশ্বর স্বরূপ।
তিন অংশে চিৎশক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী সদংশে সন্ধিনী।
চিদংশে সম্বিৎ তারে কৃষ্ণ-জ্ঞান মানি॥
অন্তরঙ্গা চিৎ-শক্তি তটস্থা জীব-শক্তি।
বহিরঙ্গা মায়া তিনে করে প্রেম-ভক্তি॥

ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভু চিৎ-শক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান, পরম সাহস॥

এইরূপ বিচারের পর ভট্টাচার্য্য ক্রমশঃই নির্জীব হইয়া আসিলেন, এবং ক্রমশঃই বিস্মিত হইতে লাগিলেন। প্রভু শ্রীমৎ-শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া বলিলেন—

আচার্য্যের দোষ নাই ঈশ্বর আজ্ঞা হইল।
অতএব কল্পনা করি নাস্তিক শাস্ত্র কইল॥

তথাহি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে পঞ্চবিংশত্যধ্যায় সপ্তম শ্লোক। চৈতন্যচরিতামৃতে—

মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে।
ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥

হে দেবি, কলিযুগে আমিই ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া, মায়াবাদরূপ অসৎ শাস্ত্র বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্র প্রচার করিব।

যদিও ভট্টাচার্য্য বুঝিতেছেন যে, তাঁহার পক্ষ দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে, তথাপি তখন পর্য্যন্ত তর্ক ছাড়েন নাই। এখন—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

এই শ্লোক নিয়া মহা বিচার আরম্ভ হইল। প্রভু বলিলেন' এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আপনিই অগ্রে করুন—

প্রভু কহে তুমি অর্থ কর তাহা শুনি।
পাছে আমি করিব অর্থ যেবা কিছু জানি॥

তখন ভট্টাচার্য্য তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে ক্রটী করিলেন না, বহুবিধ মত উঠাইয়া, নানাবিধ ব্যাখ্যা করিলেন। ভট্টাচার্য্য মনে করিলেন, এই শ্লোকের আর কোনরূপ ব্যাখ্যা হইতে পারে না, দেখি এবার নবীন সন্ন্যাসী কি কহেন। তখন প্রভু বলিলেন, "তুমি পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছ ; ইহা ব্যতীত শ্লোকের অন্য অর্থ আছে।" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্যকৃত নববিধ ব্যাখ্যা স্পর্শ না করিয়া, একেবারে নূতন রকমে ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন, এবং এইরূপে অষ্টাদশ প্রকারে অর্থ করিলেন।

শুনি ভট্টাচার্য্যের মনে হইল চমৎকার।
প্রভুকে কৃষ্ণ জানি করে আপনা ধিক্কার॥

তখন মনে ভাবিলেন, ইঁহার ভক্তগণ যে, ইঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে, তাহাই কি ঠিক ? এই আলোচনায় সারানিশি কাটাইলেন ; মনে ভাবিলেন, যদি সন্ন্যাসী আমাকে শ্রীরামাবতারের দ্বিভুজ, শ্রীকৃষ্ণাবতারের দ্বিভুজ, শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের দ্বিভুজ দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে অবতার বলিয়া মানিব। প্রভাত হইল, মহাপ্রভু প্রসাদ-হস্তে সার্ব্বভৌমের নিকটে উপস্থিত হইয়া, মহাপ্রসাদ দিলেন। সার্ব্বভৌম "শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা

দূরদেশতঃ" ইত্যাদি বচন আওড়াইয়া, মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। ইত্যবসরে মহাপ্রভু দ্বিভুজ হইতে ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সার্ব্বভৌম ঐরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। প্রভু সার্ব্বভৌমকে কৃপা করিয়া তথা হইতে বাসায় ফিরিয়া গেলেন। সার্ব্বভৌমও জন্মের মত গৌররূপেতে ডুবিলেন, এবং মনপ্রাণ সমস্ত অর্পণ করিলেন। সার্ব্বভৌমের এখন গৌরগত প্রাণ। তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা পাঠকগণ, তাঁহার নিজকৃত শ্লোক পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে ষষ্ঠাঙ্কে দ্বাত্রিংশাঙ্কধৃতৌ সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকৃত-শ্লোকৌ।

বৈরাগ্যবিদ্যা-নিজভক্তিযোগঃ
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-শরীর-ধারী।
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে।
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং শ্রীচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

যে অদ্বিতীয় পুরাণ পুরুষ, বৈরাগ্য বিদ্যা ও ভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে দেহধারী হইয়া

প্রকাশিত হইয়াছেন, আমি সেই প্রভুর শরণাপন্ন হইলাম। যে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-নামা প্রভু, কালদোষে প্রনষ্ট নিজ ভক্তিযোগ, পুনঃ প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পদারবিন্দে আমার মনোভৃঙ্গ অতিশয় গাঢ়রূপে অবস্থান করুক।

সার্ব্বভৌমের প্রণীত আরও কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

উজ্জ্বল-বরণ-গৌরবর-দেহং
বিলসতি নিরবধি ভাববিদেহং।
ত্রিভুবন-পাবন কৃপয়া লেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥
অরুণাম্বরধর-সুচারুকপোলং
ইন্দুবিনিন্দিত-নখচয়রুচিরং।
জল্পিত-নিজগুণ-নাম-বিনোদং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং॥
বিগলিত-নয়ন-কমলজল-বারণ
ভূষণ-নবরস-ভাব-বিকারণঃ।
গতি অতি মন্থর নৃত্য বিলাসন
তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ং॥
চঞ্চল-চারু-চরণ-গতিরুচিরং
মঞ্জির-রঞ্জিত-পদযুগ-মধুরম্॥

চন্দ্র-বিনিন্দিত-শীতল-বদনং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥

ভূষণ-ভূরজ অলকা-বলিতং
কম্পিত-বিম্বাধরবর-রুচিরং।
মলয়জবিরচিতং উজ্জ্বলতিলকং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥

নিন্দিত-অরুণ-কমলদল-নয়নং
আজানুলম্বিত-শ্রীভুজযুগলং।
কলেবর-কৈশর-নর্ত্তক-বেশং
তং প্রণমামি চ শ্রীশচী-তনয়ং ॥

নব-গৌরবরং নব পুষ্পশরং
নবভাব-ধরং নবোল্লাস্যকরং।
নবহাস্য-করং নবহেমবরং
প্রণমামি শচীসুত-গৌরবরং ॥

নবপ্রেমযুতং নবনীতসুচং
নববেশকৃতং নবপ্রেমরসং।
নবধাবিলাসং সদা প্রেমময়ং
প্রণমামি শচীসুত-গৌরবরং ॥

হরিভক্তিপরং হরিনামধরং
পরজপ্যকরং হরিনামপরং।

নয়নে সততং প্রেম সংবিশতং
প্রণমামি শচীস্বত-গৌরবরং ॥
নিজভক্তিকরং প্রিয়চারুতরং
নট-নর্ত্তন-নাগরী-রাজগুণং।
পুলকামিনী মানসোল্লস্ত-করং
প্রণমামি শচীসুত-গৌরবরং ॥

সার্ব্বভৌম করযোড়ে বলিলেন, "প্রভো, গোপীনাথ (সার্ব্বভৌমের ভগিনীপতি) আমাকে তোমার পরিচয় বলিয়াছিলেন, কিন্তু আমার তর্কনিষ্ঠ মনে তাহা বিশ্বাস হইল না। আমি তাই তোমাকে উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম। প্রভো, আমার অপরাধ কি? তুমি নানা লীলা কর, এখন মনুষ্যরূপ ধরিয়া, কপট সন্ন্যাসী হইয়া, আমার নিকট আসিয়াছ, আমি তোমাকে কিরূপে চিনিব? তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তুমি গোপন থাকিবে—আমি কিরূপে তোমার সে রহস্য ভেদ করিব? আমি তর্কনিষ্ঠ, তোমাকে চিনিতে প্রমাণ চাহিলাম, তাহা পাইলাম না। কিন্তু তুমি কৃপালু আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া, আমার নিকট প্রকাশ হইতে ইচ্ছা করিলে। আমার তর্কনিষ্ঠ মন—প্রমাণের প্রয়োজন, তাই প্রমাণ দিলে। স্পর্শমণিকে কেহ চিনিতে পারে না, চিনিতে হইলে উহাদ্বারা লৌহকে স্পর্শ করাইতে হয়। প্রভো, আমি তর্ক করিয়া যে লৌহপিণ্ড

হইয়াছিলাম, আমাকে স্পর্শন দ্বারা, যখন পরিবর্ত্তন করিলে, তখনই আমি চিনিতে পারিলাম যে তুমি স্পর্শমণি।"
(অমিয় নিমাই চরিত)

সার্ব্বভৌম কহিল প্রভুভক্ত একজন।
মহাপ্রভু সেবা বিনা নাহি অন্যমন॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ লয় এই নাম॥

(চৈতন্যচরিতামৃতরঙ্গ

(যথা চরিতামৃতে)

সার্ব্বভৌম বলে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে আমার সম্পদ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥
কাঁহা বহির্মুখ-তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গ।
কাঁহা এই সখ্য-সুধা-সমুদ্র-তরঙ্গ॥
শুনিয়া হাসেন প্রভু আনন্দিত মনে।
ভট্টাচার্য্যে কৈল প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গনে॥

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দ্বাদশ মাসের যাত্রা উৎসব।

জগন্নাথের দ্বাদশ যাত্রা সকলই মোক্ষদায়ক, এই যাত্রা-কালে জগন্নাথকে দর্শন করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়।

দৃষ্ট্বা কৃষ্ণং নরো নত্বা মোক্ষং প্রাপ্নোতি দুর্ল্লভং।
পাপৈর্ব্বিমুক্তঃ শুদ্ধাত্মা কল্পকোটিশতোদ্ভবৈঃ॥

স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা ব্যতীত, সমস্ত যাত্রাই, শ্রীশ্রীমদন-মোহনদেব, প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

১। চন্দন যাত্রা।

যঃ পশ্যতি তৃতীয়ায়াং কৃষ্ণং চন্দন-চর্চ্চিতং।
বৈশাখস্য সিতে পক্ষে সঃ যাত্যচ্যুত-মন্দিরং॥

এই যাত্রায় ভগবানকে চন্দন লেপন করা হয় বলিয়া ইহার নাম চন্দন যাত্রা। বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়াতে শ্রীকৃষ্ণকে চন্দন চর্চ্চিত অবস্থায় দর্শন করিলে, বৈকুণ্ঠধামে গমন করে। শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অনুসারে, ইহা এক দিনের ব্যাপার বলিয়া দেখা যায়, কিন্তু এখানে একুশ দিন স্থায়ী হয়। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ হইয়া, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে শেষ হয়।

প্রতি দিবস দুই প্রহর ভোগের শেষে, যাত্রা-ভোগ করা যায়। পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাল্কিতে শোভা পাইতে থাকেন। মদনমোহনদেব লক্ষ্মী ও ধরাদেবীর সহিত মণিবিমানে বিরাজিত হইয়া, যথাক্রমে অগ্রপশ্চাতে বিমানারূঢ় পঞ্চ মহাদেবের সহিত, নরেন্দ্র সরোবর সমীপে গমন করেন। পঞ্চমহায়দবকে পঞ্চ পাণ্ডব বলিয়া থাকে। সেবকগণ রৌপ্যচামর ব্যজন ও স্বর্ণ ছত্র ধারণ করিয়া থাকেন, এবং বহু ভক্ত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সেই সময়ে বড় ডাণ্ডী (পুরীর একটী প্রধাম রাস্তা) এক অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করে। তথায় শ্রীশ্রীজগন্নাথের বিশ্রাম নিমিত্ত স্থানে স্থানে চালাঘর নির্ম্মিত হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে "পংক্তিভোগ" অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রীমদনমোহন-দেব অন্যান্য দেবতা সহ, ক্রমে ভোগ দর্শন করিয়া, সরোবরসমীপে উপস্থিত হন। দুইটী নৌকাতে একটী করিয়া চাপ নির্ম্মিত হয়, এবং ইহার চারিদিকে চারিটী স্তম্ভ স্থাপিত হয়। ইহার উপর মণ্ডপ নির্ম্মিত হয়। চন্দ্রাতপ ও নানাবিধ বস্ত্র দ্বারা চাপদ্বয় সুশোভিত করা হয়। ইহার একটীতে মদনমোহনের চিহ্ন-স্বরূপ শুক্লবস্ত্র-নির্ম্মিত আচ্ছাদন দেওয়া হয়। অপরটীতে রামকৃষ্ণের পরিচায়ক-চিহ্ন রক্তবস্ত্র-নির্ম্মিত আচ্ছাদন দেওয়া হয়। এক চাপে মদনমোহন, লক্ষ্মী ও ধরাদেবী, এবং অন্য চাপে রামকৃষ্ণ ও পঞ্চমহাদেব বিরাজমানহন প্রথম চাপে দেবদাসী ও

নরেন্দ্র সরোবরস্থ মন্দির

U. RAY & SONS.

দ্বিতীয় চাপে "পৌল্লা" অর্থাৎ নর্ত্তক-বালক নৃত্যগীত করে। চাপদ্বয়ে, নরেন্দ্র-সরোবরের চতুঃপার্শ্বে, দিবসে একবার এবং রাত্রিতে তিনবার পরিভ্রমণ করেন। ঐ চাপদ্বয় সহিত এক নৌকাতে তৈলঙ্গী বাদ্যবাদকগণ আরোহণ করিয়া, বাদ্য বাদন করে। ভক্তগণ চামর হস্তে লইয়া, চাপের উপর প্রভুর সেবা করেন। এদিকে সরোবরের চতুঃপার্শ্ব দিয়া হস্তী তাহায় শুণ্ডের দ্বারা চামর লইয়া, শোভাযাত্রায় মদনমোহনকে চামর ব্যঞ্জন করিতে করিতে যাইতে থাকে। দিবস-চাপের পর মদনমোহনপ্রভৃতি দেববৃন্দ স্ব স্ব চন্দন-কুণ্ডে জলক্রীড়া শেষ করেন।

নরেন্দ্র সরোবরের অপর একটী নাম চন্দনতলা। সরোবরটী অতি সুন্দর এবং সুবিস্তীর্ণ—চতুর্দ্দিকে পাথরের সিঁড়ি আছে। মাঝখানে ছোট একটী মন্দির আছে এঃ মন্দিরের নাম গঙ্গাদেবীর মন্দির। দক্ষিণ দিকে একটী বড় মন্দির আছে, ঐ মন্দিরে ঠাকুরকে রাখা হয়। এই স্থানে চন্দন-কুণ্ড আছে, কুণ্ডের মধ্যে প্রায় তিন দণ্ড অবস্থানের পর, সেবক পশুপালকগণ জলক্রীড়া শেষ করাইয়া, প্রথম দশ দিবস পর্য্যন্ত প্রতিদিন পুষ্প ও হীরক স্বর্ণাদি-খচিত ভূষণ-সমূহের দ্বারা প্রভুকে সুশোভিত করেন। তৎপরে পৌল্লার অর্থাৎ বালকদের নৃত্য হয়, তৎসঙ্গে পাখোয়াজ বাজান হয়। বালকের নৃত্য এবং গীত অতি সুমধুর—দেবদাসীদের নৃত্য অপেক্ষা বালকের নৃত্য অনেক ভাল। বঙ্গদেশের নৃত্যের

মত ইহাদের নৃত্যের ধরণ নহে ; তাহা না হইলেও ইহা বেশ মনোরম। এই পীল্লার নাচ দেখিবার জন্য অনেক লোক সমবেত হয়। দেবদাসীর নৃত্য এখন ভাল বলিয়া বোধ হয় না।

এক সময় এই দেবদাসীদিগকে রামানন্দ রায় নৃত্য শিখাইতেন। কি ভাবে নৃত্য করিলে, জগন্নাথদেব সন্তুষ্ট হইবেন, তাহা তিনি বুঝিতেন, তদনুসারে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। ব্রজগোপীরা যেরূপে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের নিকটে নৃত্যগীত করিতেন, সেইভাব উদ্দীপনা করিবার জন্য দেবদাসীদিগকে শিক্ষা দিতেন। তিনি নিজে জগন্নাথ-বল্লভ নামক নাটক প্রস্তুত করিয়া, তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। এক সময়ে, প্রদ্যুম্ন মিশ্র মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণ-ভক্তিতত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করেন। তিনি তাঁহাকে শ্রীরায় রামানন্দের নিকট যাইতে উপদেশ দেন, এবং বলেন তাঁহার নিকট আমি কৃষ্ণ-ভক্তি শিক্ষা করিয়াছি। তদনুসারে প্রদ্যুম্নমিশ্র রায় রামানন্দকে দর্শন করিতে যান ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না, শুনিলেন তিনি দেবদাসীদিগকে গান শিক্ষা দিতেছেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত অভক্তির সঞ্চার হইল ; তিনি ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর দল মধ্যে রায় রামানন্দের এইরূপ ব্যবহার ভাল নয় বলিয়া, আভাষ প্রকাশ করেন। মহাপ্রভু তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, রায় রামানন্দই কেবল এইরূপ ব্যবহারের অধিকারী; আমিও

অধিকারী নই। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর বাক্য—

নির্ব্বিকার দেহ মন কাষ্ঠ পাষাণ সম।
আশ্চর্য্য তরণীস্পর্শে নির্ব্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি অপ্রাকৃত দেহ তাহার॥

রামানন্দের কোন ইন্দ্রিয় বিকার নাই, তাহার বিকার-শূন্য দেহ। অতএব, তোমরা রায় রামানন্দের প্রতি সন্দেহ করিও না। আমি তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা পাইয়াছি, সুতরাং তাঁহার নিকট কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা কর। তৎপর প্রদ্যুম্নমিশ্র পুনরায় তাঁহার নিকট যান এবং তাঁহার সহিত কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। রায় রামানন্দের কৃষ্ণভক্তি দেখিয়া তাহার সন্দেহ বিদূরিত হয়।

"সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই,"—যে ভাবে আগে নৃত্য হইত সে ভাব আর নাই, কাজেই এখন দেবদাসীদের নৃত্য দেখিয়া সেরূপ আনন্দ হয় না, বরং পাঁল্লার নাচই একটু ভাল বলিয়া বোধ হয়। পাঁল্লার নাচ শেষ হইলে ঠাকুরকে রাত্রি চাপে লইয়া যাওয়া হয়। এই চাপের শেষে প্রভু পূর্ব্ববৎ বিমানোপরি আরূঢ় হইয়া, সঙ্গীদিগের সহিত মন্দিরাভিমুখে গমন করেন। রাত্রি-চাপের সময় সরোবরের চতুর্দ্দিকে দীপমালা স্থাপিত হয়, তখন দীপশিখা জলে প্রতিবিম্ব

হইয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। প্রত্যাগমন সময়ে ভগবান্ স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া যান। সেই সময়ে যে অলৌকিক শোভা দৃষ্ট হয়, তাহা ভক্তহৃদয় ব্যতীত আমাদের মত লোকের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। পথ মধ্যে ছয়টী স্থানে দেবদাসী ও নর্ত্তক বালক প্রভুর সমক্ষে নৃত্য করে। এই যাত্রায় একাদশ দিবস হইতে প্রভুর বেশ পরিবর্ত্তন করা হয়। এই সময়ে প্রভু "কৃষ্ণাবতার" বেশে ভূষিত হন, অর্থাৎ পূতনা বধ প্রভৃতি সম্পাদন করার সময়ে যে যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সেই বেশ ধারণ করেন। এই যাত্রা মাধুর্য্য-রসোদ্দীপক এবং বহু দিবস ব্যাপক।

এই যে নানারূপ বেশে মদনমোহনকে সাজান হয়, তাহা অতিসুন্দর, এবং নিত্য নূতন সাজ হয় বলিয়া, সকলেরই তাহাতে ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হয়। যদিও চন্দন যাত্রা দীর্ঘ-কালব্যাপী, তথাপি লোকের বিরক্তির কারণ হয় না। যতই দিন যাইতে থাকে, ততই লোকের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে, এবং লোক সংঘট্টও বাড়িতে থাকে।

সাজ শেষ হইলে পর ভোগ হয়। এখানে অন্নভোগ হয় না, কেবল মালপুয়া, লুচি ও অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্য ভোগ দেওয়া হয়। এই ভোগকে ছানামণ্ডি বলে,—মালপুয়ার মত তত মিষ্ট হয় না, কিন্তু মালপুয়ার অপেক্ষা সুস্বাদু হয়। এই ভোগ শেষ হইলে, পুনরায় নৌকা বিহার করিয়া, মন্দিরে ১২টা ১টার পূর্ব্বে আসেন না।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভুর জলক্রীড়ার সময়ে, নগরবাসিগণ নরেন্দ্র-সরোবরে সন্তরণ, ও অবগাহন করিয়া, সুবাসিত চন্দন ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরকে সুশোভিত করেন, ও নানারূপ কীর্ত্তন করিতে থাকেন। সরোবরে মনুষ্য মস্তক ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না; তখন সকলে এতদূর উন্মত্ত হয় যে, কুম্ভীরের ভয় পর্য্যন্ত থাকে না,—কুম্ভীর সকলও কোন হিংসা করে না।

এই চন্দন যাত্রা উপলক্ষে-নরেন্দ্র সরোবরে শ্রীশ্রীচৈতন মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে কিরূপ জলক্রীড়া করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

চন্দনযাত্রা উপস্থিত। এই সময় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিনিধি শ্রীশ্রীমদনমোহন সঙ্গীগণ সহ চন্দন তলায় সরোবরে জলক্রীড়া করিতে যাইতেছেন, এদিকে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব তাহার সঙ্গোপাঙ্গ নিয়া ঐ সরোবরে জলকেলি করিতে চলিলেন। এই সময়ে নবদ্বীপ হইতে অদ্বৈত মহাপ্রভুপ্রমুখ শ্রীবাসাদি বহুভক্তগণ আসিতেছেন। দূর হইতে কীর্ত্তনের শব্দ শুনিয়া মহাপ্রভু তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই উভয় দলের মিলন হইল। এই দুই দলের মিলন কিরূপ হইল তাহা চৈতন্য ভাগবত যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিমাই চরিত হইতে উদ্ধৃত করিলাম।—

দূরে অদ্বৈতেরে দেখি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডবৎ॥

শ্রীঅদ্বৈত দূরে দেখি নিজ প্রাণনাথ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিল প্রণিপাত॥
অশ্রুকম্প স্বেদ মূর্চ্ছা পুলক হুঙ্কার।
দণ্ডবৎ বই কিছু নাহি দেখি আর॥
এইমত দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
দুই গোষ্ঠী একত্রে মিলিল ভালমতে॥
বৈষ্ণব গৃহিণী যত পতিব্রতাগণ।
দূরে থাকি প্রভু দেখি করয়ে রোদন॥

ইহার পর সকলে মিলিয়া নরেন্দ্র সরোবরে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভুর এত আনন্দ হইয়াছে যে তাহা ধারণ করিতে পারিতেছেন না। বাল্যভাবেতে সরোবরে ঝম্প প্রদান করিলেন, প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণও ঝাঁপ দিলেন। ভক্তগণ সকলেই মহাপ্রভুর ভাবে বিভোর হইয়া বালকভাবে জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভু বৃদ্ধ হইয়াও বালক সাজিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, ও অদ্বৈত মহাপ্রভুতে ঘোরতর জল ছিটাছিটি আরম্ভ হইল। প্রেমের শক্তি এই যে বৃদ্ধকেও বালক করিয়া তুলে। তখন সমস্ত ভক্তের ভিতরে এই ভাব ব্যাপ্ত হইল এবং বাল্যকালের নানারূপ জলক্রীড়া হইতে লাগিল,—কয়া কয়া খেলা আরম্ভ হইল।

গৌরদেশে জলকেলি আছে কয়া নামে।
সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলা প্রথমে॥

কয়া কয়া বলি করতালি দেন জলে।
জলবাদ্য বাজান বৈষ্ণব সকলে।

তখন বৃন্দাবনের ভাব মনে পড়িল—

গোকুল শিশুর ভাব হইল সবার।
প্রভুও হইল গোকুলেন্দ্র অবতার॥
বাহ্য নাহি কারো সবে আনন্দে বিহ্বল।
নির্ভয়ে গৌরাঙ্গদেহ সবে দেন জল॥

পুরীবাসীগণ এই ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এই নূতন দৃশ্য আর কখনও দেখেন নাই। এদিকে ভট্টাচার্য্যও আসিয়া এই দলে জুটিলেন। ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপের সমাগত ভক্তগণের পরিচয় ভালরূপ জানেন না; শ্রীগোপীনাথ রাজা প্রতাপরুদ্রকে সমস্ত পরিচয় বলিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমদন-মোহনদেব যেমন তাহার সঙ্গী লইয়া চন্দনযাত্রা করিতেছেন, মহাপ্রভুও সেইরূপ নবদ্বীপাগত ভক্তগণ সঙ্গে নিয়া নানারূপ আনন্দ করিতেছেন। এখন যে পুরীবাসীগণ চন্দন সরোবরে সন্তরণ করেন, হয়ত মহাপ্রভুর সময় হইতেই এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে; অথবা সেই প্রথা অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ যেরূপ নানাস্থানে ভোজন করিয়া থাকেন, মহাপ্রভুও নবদ্বীপাগত ভক্তগণের বাড়িতে ভোজন করিতে লাগিলেন।

জটিয়া বাবার মঠ।

নরেন্দ্র-সরোবরের উত্তর পাড়ে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি আছে; এই দেশে ইহাকে জটীয়া বাবার মঠ বলে। চন্দনযাত্রার সময়ে এই মঠে ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে। আশ্রমটী বড়ই সুন্দর,—বাগান আছে, একটী মন্দির আছে, তাহার মধ্যে ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সমাধি আছে ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি আছে। উক্ত গোস্বামী মহাশয় এখানে অনেক দান করিয়া ছিলেন, সে জন্য এখানে দাতা বলিয়া খুব প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ১৩০৬ সনের ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পরদিন অপরাহ্ণ সোমবারে সমাধি দেওয়া হয়। ১২৪৮ সালের শ্রাবণমাসে ঝুলন পূর্ণিমা দিবসে তাঁহার জন্ম হয়। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে তিরোভাবের দিনে এখানে উৎসব হয়। পুরুষ এবং স্ত্রীলোক উভয়েই এখানে আসেন। উৎসবের দিন শ্রীশ্রীহরি সংকীর্ত্তন হয় এবং ব্রাহ্মণ ভোজন হয়। একদিবস কাঙ্গালী ভোজন হয়। ইঁহার শান্তিপুরে অদ্বৈত বংশে জন্ম হয়। ইনি বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন; তৎপর কোন সিদ্ধপুরুষের কৃপা লাভ হয়, সেই হইতে তিনি পুনরায় হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার ভক্তির ভাব অত্যন্ত

প্রবল ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের বক্তৃতাতে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। তিনি একজন উচ্চ সাধক ছিলেন।

২। স্নানযাত্রা।

শনকাদীন্ প্রতি জৈমিনিরুবাচ—

জ্যৈষ্ঠে-স্নানং ভগবতো যে পশ্যন্তি মুদান্বিতাঃ।
ন তে ভবাব্ধৌ মজ্জন্তি যাতায়াতশ্রমাতুরাঃ॥
বুদ্ধ্যবুদ্ধিকৃতঃ পুংসামনাদিপাপসঞ্চয়ঃ।
তৎক্ষণান্নাশমায়তি পশ্যতাং স্নপনং হরেঃ॥

জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রাকালে ভক্তি সহকারে ভগবানকে দর্শন করিলে আর তাহাকে পুনরায় সংসারে নিমজ্জিত হইতে হয় না। হরির স্নান দর্শন করিলে জ্ঞান ও অজ্ঞান-কৃত অনাদি কাল সঞ্চিত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—

জ্যৈষ্ঠ্যাং প্রাতস্তনে কালে ব্রহ্মণা সহিতঞ্চ মাং।
রামং সুভদ্রাং সংস্নাপ্য মম লোকমবাপ্নুয়াৎ॥
স্নাপ্যমানন্তু যঃ পশ্যেৎ মাং সদা নৃপসত্তমঃ।
দেহবন্ধমবাপ্নোতি ন পুনঃ তু পুরুষঃ॥

জ্যৈষ্ঠমাসে স্নানযাত্রাকালে আমাকে সুভদ্রাকে ও বলরামকে যাঁহারা স্নান করান, তাঁহারা আমার লোক প্রাপ্ত হন। হে নৃপসত্তম! আর যিনি আমাকে স্নাপ্যমান

অবস্থাতে দর্শন করেন তাঁহার আর পুনরায় দেহ বন্ধন হয় না।

জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই তিথিতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার প্রথম প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সুতরাং এইটী জগন্নাথের জন্মতিথি বলা যাইতে পারে। জন্মতিথির স্মরণার্থে এই স্নান অনুষ্ঠিত হয়। ইহার ফলশ্রুতিও পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময়ে স্বয়ং জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রা এই মূর্ত্তিত্রয়কে পাহুণ্ডি-বিজয় করাইয়া স্নান বেদীতে স্থাপন করান হয়। প্রাতঃকালে "নীলাদ্রি মহোদয়োক্ত" বিধি অনুসারে মুদিরথের দ্বারা (সেবাইত শ্রেণী বিশেষ) পূর্ব্ব দিনের অধিবাসিত জলে প্রভুর স্নান অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরে হস্তিসমবেশ (অর্থাৎ গণেশ বেশ) দ্বারা প্রভুকে ভূষিত করা হয়। উক্ত বেশ অতি প্রাচীন নহে।

এই স্নান উপলক্ষে বহুলোক সমবেত হয়। যাঁহারা রথযাত্রায় আসিবেন, তাঁহারা অনেকেই এই সময়ে আসিবার চেষ্টা করেন ; স্থানীয় লোকও অনেকে সমবেত হন। অনেক ভদ্রমণ্ডলী চতুর্দ্দিকের ছাদ ভাড়া করিয়া ভগবানের স্নান দর্শন করেন। এই সময়ে জগন্নাথ বড়ই কৃপালু—সমস্ত লোকের সঙ্গেই কোল দিয়া থাকেন। জগন্নাথের সঙ্গে কোল দিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হয়, এইজন্য স্নানের পরে অত্যন্ত লোকের ভিড় হইয়া থাকে।

মাদলা পঞ্জিকা ও জনশ্রুতির দ্বারা জানা যায় যে কাঞ্চীরাজা তাহার পদ্মাবতী নাম্নী কন্যাকে পুরীর রাজা পুরুষোত্তমদেবের সহিত বিবাহ দিবার নিমিত্ত স্নানযাত্রার সময় পুরীতে আসিয়াছিলেন। তিনি গণপতি ভক্ত থাকায় জগন্নাথদেবের প্রসাদ সেবন করিতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু স্নানবেদীতে দর্শন করিবার সময় প্রভুকে গণপতিরূপে দেখিয়া অন্নপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভু উক্ত দিবসে উক্তবেশে ভূষিত হন। সেই দিবসেই কাঞ্চী রাজার সহিত যুদ্ধের বীজ রোপিত হয়। ঐ দিবস পুরীর রাজা সুবর্ণ সম্মার্জ্জনীতে স্নানবেদী মার্জ্জন করেন। এই শাস্ত্রোক্ত বিধির বশবর্ত্তী হইয়া রাজা পুরুষোত্তম উক্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করিবার সময় কাঞ্চীরাজ তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া কন্যা সমর্পন না করিয়া স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পুরীরাজ এই বিষয় জানিতে পারিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

কাঞ্চীরাজের সম্বন্ধে যে জনশ্রুতি আছে তাহা কতদূর সত্য বলিতে পারি না! যিনি ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছেন, এবং যাহার ভক্তি প্রভাবে ভগবান গণেশরূপ ধারণ করিয়াছেন, তিনি যে পুরীর রাজা সুবর্ণ মার্জ্জনী-দ্বারা জগন্নাথের রাস্তা পরিস্কার করিতেছেন বলিয়া এইটীকে নীচ কার্য্য মনে করিবেন, ইহা মনে হয় না। যিনি ভক্ত হইবেন, তাঁহার বরং এইরূপ কার্য্য দেখিয়া আনন্দই

হইবে। সামান্য লৌকিক আচার নিয়া এই ক্ষেত্রে এইরূপ মহৎ লোকের এইরূপ ইতর জনোচিত ব্যবহার শোভা পায় না। বিশেষতঃ গণেশ বেশ সম্বন্ধে অন্য ভক্তের উপাখ্যান রহিয়াছে। একই গণেশ বেশ সম্বন্ধে দুইটী উপাখ্যান তাহাও সন্দেহ জনক। যাহা হউক যেরূপ জন প্রবাদ আছে তাহাই লেখা গেল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের গণেশ বেশ সম্বন্ধে যে অন্য একটী জনশ্রুতি আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

এই গল্পদ্বারা ভগবান দেখাইলেন যে,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"

ভগবান্ জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া ভক্ত যাহা চান তাহা পূরণ করেন।

কর্ণাট দেশে এক ভক্ত ছিলেন, তিনি ভগবানকে গণেশ রূপে ভজনা করিতেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, ভগবান দারুব্রহ্ম হইয়া নীলাচলে বাস করিতেছেন, তাঁহাকে দর্শন করিলেই ব্রহ্মদর্শন হইবে। ইহা শুনিয়া তিনি বহুকষ্টে পুরীতে উপস্থিত হইলেন। পুরীতে উপস্থিত হইয়া তিনি জগন্নাথ দর্শন করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি ইষ্টদেবতাকে যে ভাবে পূজা করিতেন, সেভাবে জগন্নাথকে দেখিতেছেন না, অর্থাৎ জগন্নাথকে গণেশরূপে দেখিতেছেন না। যাঁহারা ইষ্ট নিষ্ঠ ভক্ত, তাঁহারা ইষ্ট ভিন্ন অন্য কোনরূপ দেখিতে চান না। ইহার একটী উদাহরণ নিম্নে দিতেছি।

একসময়ে দ্বাপর যুগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাতে রুক্মিণী সহ বিলাসভবনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমান তাঁহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন মনে করিলেন হনুমান আমার এইরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে না, সুতরাং আমার রামরূপ ধরিতে হইবে। ভক্তাধীন ভগবান শ্রীশ্রীরুক্মিণী দেবীকে তৎক্ষণাৎ সীতা-দেবীর রূপ ধারণ করিতে বলিলেন। সেই সময় উভয়ে রামসীতা সাজিয়া ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তখন হনুমান বলিলেন—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদে পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামঃ কমললোচন॥

যদিও আমি জানি, আমার রামচন্দ্র এবং পরমাত্মা-রূপী ভগবান্ অভেদ, তথাপি রামচন্দ্রই আমার যথা সর্ব্বস্ব।

এইরূপ ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র গরুড়কে বিষ্ণুরূপ দেখাইয়া-ছিলেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ তাহার ইষ্টরূপ না দেখিতে পাইয়া ফিরিয়া চলিলেন। এদিকে ভগবান্ দেখিলেন তাহার ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু নামের কলঙ্ক হয় এবং "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—ইত্যাদি তাঁহার শ্রীমুখ-নিসৃত বাক্যেরও বিরোধ ঘটে, সেই জন্য ভক্তকে ফিরাইবার জন্য পাণ্ডাদিগকে আদেশ করিলেন। আদেশানুসারে

পাণ্ডারা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভগবানের আদেশ জ্ঞাপন করাইল। ব্রাহ্মণ তখন পাণ্ডাদের মুখে ভগবানের আদেশ শ্রবণ করিয়া আনন্দে মগ্ন হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন জগন্নাথদেব ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে তাঁহার নিজবেশ ছাড়িয়া গণেশ বেশ ধারণ করিলেন। ভক্ত তাহার ইষ্টরূপ দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন। ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিলেন, তুমি যে ভক্তবৎসল, বাঞ্ছাকল্পতরু তাহা ভক্তদিগকে দেখাইবার জন্য তোমাকে চিরদিন এই দিনে এই বেশ ধারণ করিতে হইবে। ভগবান্ তাহাই স্বীকার করিয়া ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। সেই হইতে স্নান যাত্রার দিন এই বেশ হইয়া থাকে।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী বিরচিত "ভক্তের জয়" পুস্তকে গণপতি ভট্টের সম্বন্ধে এইরূপ একটী উপাখ্যান অন্যরূপে বিবৃত আছে, সেই জন্য এখানে বিস্তারিত লিখিত হইল না।

পাণ্ডাগণ বলেন, স্নানযাত্রার পর জগন্নাথের জ্বর হয় এবং ঔষধাদি ও পাচন সেবন করেন; তখন অন্ন ভোগ করা হয় না। এই পাচন অতি সুমধুর।

এই সময়ে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন করিবার জন্য নবদ্বীপ হইতে অদ্বৈত প্রমুখ ভক্তগণ উপস্থিত হইতেন। চন্দনযাত্রার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রথ পর্য্যন্ত নবদ্বীপাগত ভক্তগণ সকলেই থাকিতেন। তাঁহারা মহাপ্রভুর সহিত

কীর্ত্তন আনন্দে এবং মহা প্রভুকে ভোজন করাইয়া ৩।৪ মাস মহাপ্রভুকে নিয়া উৎসবানন্দে কাটাইতেন। এই স্নান যাত্রা উপলক্ষে মহাপ্রভু কোন বিশেষ লীলা করিয়াছেন, এরূপ উল্লেখ কোন গ্রন্থে পাই না। যখন প্রত্যহই মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে ব্যাপৃত থাকিতেন, তখন এই প্রধান উৎসবের দিনে যে তাহার কোন বিশেষ লীলা হয় নাই, তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। নবযৌবনে, নেত্রোৎসবে, রথে—সমস্ত ব্যাপারে তাহার বিশেষ সংস্রব দেখা যায়।

৩। রুক্মিণী-হরণ।

ইহা জৈষ্ঠ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে হয়। এইদিন মদনমোহন রুক্মিনীকে হরণ করিয়া অক্ষয়বটের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিবাহ করেন। ইহা স্নানযাত্রার পূর্ব্বের একাদশীতে হয়। রুক্মিণী-হরণ উপলক্ষে তুই দল হয়—কৃষ্ণপক্ষের এক দল ও শিশুপাল পক্ষের এক দল। দেবদাসীরা শ্রীমতী রুক্মিণীর সখী স্থানীয়া। শ্রীমতী রুক্মিণী বিমলা দেবীর গৃহে পূজা দিতে আসেন; পূজাদিয়া যখন বাহিরে আসেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া রথে নিয়া আসেন। ইহাতে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করেন—তখন উভয় দলে যুদ্ধ হয়, এবং শিশুপাল পরাজিত ও বন্দী হন। তখন বলরাম আসিয়া শিশুপালকে ছাড়িয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রুক্মিণীকে লইয়া গিয়া রাত্রে বিবাহ করেন।

৪। গুণ্ডিচা মার্জ্জন।

স্নানযাত্রার পরে রথযাত্রার পূর্ব্বে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গুণ্ডিচামার্জ্জন করিয়া ছিলেন। মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়া ভক্তগণ সঙ্গে নানারূপ লীলা করিয়াছিলেন; তন্মধ্যে গুণ্ডিচা মার্জ্জন একটী প্রধান লীলা। মহাপ্রভুর নীলাচলে যাওয়ার পূর্ব্বে এই লীলা ছিল না। মহাপ্রভু এই লীলা নূতন প্রবর্ত্তন করিলেন। "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" তাহা এই দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলেন। মহাপ্রভু, তুলসী পড়িছা, কাশীমিশ্র ও সার্ব্বভৌম—এই তিনজনকে ডাকাইয়া বলিলেন, "রথযাত্রার পূর্ব্বদিন শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির পরিষ্কৃত ও মার্জ্জিত করিতে হইবে; অতএব আপনারা মন্দির মার্জ্জনারূপ সেবাটী আমাকে দিউন।" ইহাতে সকলে হাহাকার করিয়া বলিলেন যে, এরূপ নীচ সেবা প্রভুর পক্ষে শোভা পায় না, তবে যদি নিতান্তই প্রভুর ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে কাজেই প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতেই হইবে। অতএব বহুতর ঘট ও সম্মার্জ্জনী আনয়ন পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরে রাখা হইল। প্রভু পরদিন প্রভাতে তাহার পারিষদগণ লইয়া মহানন্দে মুহুর্ম্মুহু হরি-ধ্বনি করিতে করিতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এই হরি মন্দির মার্জ্জনারূপ লীলা, প্রভু পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপেও একবার করিয়াছিলেন। প্রভুর নবদ্বীপের ও নীলাচলের তিন চারিশত ভক্ত মন্দিরে সমবেত হইলেন; তখন ভক্তি

গুণ্ডিচা বাড়ী

U. RAY & SONS.

উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক ভক্তকে স্বীয় শ্রীহস্তে চন্দন মাখাইলেন ও মালা পরাইলেন। ভক্তগণ শ্রীকরস্পর্শে ভক্তিধন প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

আপনার হস্তে প্রভু চন্দন লইয়া।
ভক্তসবে পরাইল অতি প্রীত হইয়া॥
ঈশ্বর প্রসাদ মাল্য দিলেন গলায়।
আনন্দে বিহ্বল সবে চৈতন্য কৃপায়।
করেতে শোধনী ভক্তগণ চারিদিকে।
মত্তগজগতি প্রভু চলিলেন আগে॥

মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে মন্দির পরিস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই মন্দির পরিস্কৃত হইলেই তখন জল আনিবার আজ্ঞা হইল।

কত শত লোক জল ভরে সরোবরে।
ঘাটে স্থল নাহি কেহ কূপে জল ভরে॥
পূর্ণ কুম্ভ লইয়া আসে শত ভক্তগণ।
শূন্য ঘট লইয়া যায় আর শত জন॥
ঘটে ঘটে ঠেকি কত ঘট ভাঙ্গি গেল।
শত শত ঘট তাহা লোকে আনি দিল॥
জল ভরি ঘট ধোয়ে করে হরিধ্বনি।
কৃষ্ণ হরিধ্বনি বিনু আর নাহি শুনি॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ করি করে ঘট সমর্পন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি করে ঘটের প্রার্থন॥
যেই যেই করে সেই কহে কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ নাম হইল তাহা সঙ্কেত সর্ব্বকাম॥
প্রেমাবেশে কহে প্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম।
একেলা করেন প্রেমে শত জনের কাম॥

(চরিতামৃত।)

এইরূপে সমস্ত মন্দির ধৌত করা হইল—

চন্দ্রোদয় নাটক বলেন—

এইরূপ গৃহ মার্জ্জি কৈল প্রসন্ন শীতল।
আপনি চরিত্র যেন আপন অন্তর॥

অর্থাৎ প্রভুর অন্তর যেরূপ পবিত্র ও শীতল, মন্দির সেইরূপ পরিস্কার ও জল দ্বারা ধৌত করিয়া শীতল ও পবিত্র করিলেন।

যথা চন্দ্রোদয়ে—

গুণ্ডিচা মার্জ্জন করি আনন্দেতে গৌরহরি
স্বরূপাদি ভক্তগণ লইয়া।
আরম্ভিলা সংকীর্ত্তন, আনন্দেতে ত্রিভুবন
ধ্বনি উঠে ব্রাহ্মাণ্ড ভেদিয়া॥
স্বরূপের উচ্চগীতে প্রেমের তরঙ্গ উঠে।

ইত্যাদি—

তাহার পর প্রভু উত্তণ্ড নৃত্য আরম্ভ করিলেন।
মহা উচ্চ সংকীর্ত্তনে আকাশ ভরিল।
প্রভুর নৃত্যে ভূমিকম্প হইল॥

ইতঃপর সকল ভক্তগণে জলক্রীড়া হইল। ইহাতেও চন্দনযাত্রার সময় যেরূপ মহাপ্রভু ও ভক্তগণ জলক্রীড়া করিয়াছিলেন, এখানে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে সেইরূপ করিলেন। তৎপর সকলে বনভোজনে বসিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পুলিন ভোজনের কথা মনে পড়িল; মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হইলেন। চতুর্দ্দিকে হরিধ্বনি হইতে লাগিল! এইভাবে ডুবিয়া সকলে ভোজনে বসিলেন। এই বন ভোজনের দৃষ্টান্ত অদ্যাপিও মহোৎসবে দেখা যায়; সেই অনুকরণেই বর্ত্তমান সময়ে মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব নাই, অদ্বৈত নাই, নিতাই নাই, সে প্রেম নাই—সে স্থানে এখন বসান হয় আসন—৬৪ মহান্তের ৬৪টী আসন হইয়া থাকে। মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত হরিনাম সেই মহোৎসবে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদিও মহোৎসবে মহাপ্রভুর সময়ের জীবন্ত ভাব কিছুই নাই, তথাপি মহোৎসব বড়ই আনন্দপ্রদ। আর একটী জিনিষ দেখিতে পাই তাহাও মহাপ্রভুর প্রদত্ত বলিয়া মনে হয়। মহোৎসবেতে হিন্দুজাতি মাত্রেতে একত্রে বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ করে তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি দেখা যায় না। এইরূপ ব্যবহার অন্য কোন ব্যাপারে দেখা

যায় না। সুতরাং এটীও মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বলিয়াই মনে করিতে হইবে।

এখনও গুণ্ডিচা-বাড়িতে প্রতি বৎসর উক্ত নিয়মানুসারে বৈষ্ণবগণ গুণ্ডিচা মার্জ্জন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে স্নানযাত্রার পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথের ১৫ দিবস দর্শন হয় না। নির্ব্বাচিত অমাবস্যার দিন "নবযৌবন" দর্শন হয়। প্রতিপৎ দিবসে প্রভুর নেত্রোৎসব বিধি অনুষ্ঠিত হয়।

৫। নবযৌবন।

১৫ দিন অদর্শনের পর অমাবস্যার দিন নবযৌবন দর্শন হয়। নবযৌবনের অর্থ এই যে শ্রীশ্রীজগন্নাথের অঙ্গরাগ করা হয়। বৎসরের পরে বোধ হয় এই নূতন অঙ্গরাগ করা হয়; সুতরাং মূর্ত্তি নবকলেবর ধারণ করেন, এই জন্যই এই দর্শনকে নবযৌবন দর্শন কহে। ১৫ দিনে অদর্শনের পরে জগন্নাথকে দর্শন করিতে পাইয়া লোকের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়।

এই জন্য এই সময়ে অত্যন্ত লোকের ভির হইয়া থাকে। যখন সর্ব্বসাধারণেরই এতদূর উৎকণ্ঠা, তখন মহাপ্রভুরও কতদূর উৎকণ্ঠা হইয়াছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি সমস্ত ভক্তগণ লইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে চলিলেন। মহাপ্রভু মণিকোঠায় দর্শন করিতে যান না, গরুড় স্তম্ভের নিকট দাড়াইয়া নয়নে নয়ন দিয়া প্রভুকে দর্শন করিতে-

ছিলেন। অশ্রুজলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল—নিত্যই এইরূপ হইত। অদ্য অনেক দিনের পরে দর্শন হওয়াতে কত কথাই বলিতেছেন,—যেন জগন্নাথের সহিত আলাপ করিতেছেন; এবং অনেক দিন তাঁহাকে ছাড়িয়া রহিয়াছেন বলিয়া রাধার ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, যেন সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—

আমার নাগর যায় পরঘর
আমার আঙ্গিনা দিয়া।
সই, কেমনে ধরিব হিয়া।

আবার জগন্নাথের দিকে তাকাইয়া বলিতেছেন, "তুমি যে বোঝ না, তোমাকে যদি আঁখির নিমেষে না হেরি, তাহা হইলে প্রাণে মরিয়া যাই; তুমি কি নিষ্ঠুর—কেমন করিয়া আমাকে এত দিন ছাড়িয়া রহিলে!"

আঁখির নিমেষে যদি নাহি হেরি
তবে যে পরাণে মরি।
তুমি যে আমার পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥ (চণ্ডীদাস)

আবার মনে মনে ভাবিতেছেন, তিনি ত কেবল আমার নাথ নন্। তখন বিল্বমঙ্গলের শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধুঃ
হে কৃষ্ণ হে চপল করুণৈকসিন্ধুঃ।

হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরামঃ
কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ॥

আবার বলিতেছেন—

"বঁধু কি আর বলিব আমি।
জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণপতি হইও তুমি ॥"
"তোমার চরণে আমার পরাণে বাঁধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া এক মন হইয়া নিশ্চয় হইলাম দাসী ॥

তৎপরে আবার ভক্তভাবে বলিতেছেন, যথা বিল্বমঙ্গলের শ্লোক—

দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোক কাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥

যদিও তিনি জগন্নাথকে কৃষ্ণভাবে দর্শন করিতেছেন, তথাপি বলিতেছেন, "তোমাকে কবে দেখিব ?" ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার দেখার পিপাসা মিটিতেছে না। যথা—(চণ্ডীদাস)

জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু।
নয়ন না তিরপিত ভেল ॥
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু।
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল ॥

অথবা—সেই ব্রজের ভাবে, সেই বেতসীকুঞ্জতরুতলে

দেখা পাইতেছেন না, কাজেই তাহার ব্রজের ভাবের পরিতৃপ্তি হইতেছে না।

সেই তুমি সেই আমি সেই নব সঙ্গম।
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন॥ (চরিতামৃত)

এখন দেখুন দেখি পাঠকবর্গ, যদি মহাপ্রভুর সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথের সংযোগ না করিতাম, তাহা হইলে এই অপূর্ব্ব ভাব কোথা হইতে পাইতেন, এ অপূর্ব্ব মহিমা কে কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইত,—এ অনন্ত প্রেমের উৎস কে খুলিয়া দিতে পারিত?

৬। নেত্রোৎসব

ইহা প্রতিপদ দিবসে অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চদশ দিবস অদর্শনের পর সেই দিবস তিনি জগজ্জনের নেত্রগোচর হইবেন। শাস্ত্রের কথা এই যে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্নান করিয়া পঞ্চদশ দিবস পর্য্যন্ত নিভৃতে মহালক্ষ্মীর সহিত দিন যাপন করেন; তৎপরে নেত্রোৎসব হয়। নেত্রোৎসব দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথ নয়ন গোচর হইলে জগন্নাথকে দর্শন করিয়া সকলে উৎকণ্ঠিতনেত্রে নয়নের তৃপ্তি সাধন করেন বলিয়া ইহার নাম নেত্রোৎসব। নয়নের প্রকৃত তৃপ্তিসাধন অথবা উৎসব ইহা অপেক্ষা আর কি হইতে পারে? যাহা দেখিলে আর কিছু দেখিবার দরকার হয় না, একেবারে নয়ন 'তিরপিত' হইয়া যায়, তাহাই প্রকৃত নেত্রোৎসব।

যং লব্ধ্বা পুমান্ তৃপ্তো ভবতি, অমৃতো ভবতি, সিদ্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি।

নিপীয় যস্য পীযূষং ন স্পৃহা চান্যবস্তুষু।

যে বদন দর্শন করিলে এই অবস্থা হয়, তাহাকেই বলি নেত্রোৎসব, এবং তাহাই বলি দর্শন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রাধাভাবে বিভোর হইয়া কিরূপ দর্শন করিতেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

কৃষ্ণকে দর্শন করিয়া শ্রীমতী রাধিকার কিরূপ ভাব হইত তাহা চণ্ডীদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

শ্যামের বদনের ছটার কিবা ছবি।
কোটী মদন জনু জিনিয়া শ্যামের তনু
উদয়িছে যেন শশী রবি॥
সই কিবা সে শ্যামের রূপ—
নয়ন জুড়ায় চেয়ে।
হেন মনে লয় যদি লোক ভয় নয়
কোলে করি যেয়ে ধেঞে॥

আর একটি পদ এই—

বরণ দেখিনু শ্যাম জিনিয়া ত কোটী কাম
বদন জিতল কোটী শশী।
ভাঙ ধনুভঙ্গি ঠাম নয়নকোনে পুরে বান
হাসিতে খসয়ে সুধারাশি॥

সই এমন সুন্দর বড় কাণ।
হেরিয়ে সেই মুরতি　　সতী ছাড়ে নিজ পতি
তেয়াগিয়া লাজভয় মান॥
এ বড় কারিকরে　　কুঁদিলে তাহারে
প্রতি অঙ্গ মদনের শরে।
যুবতী ধরম　　ধৈর্য্য ভুজঙ্গম
দমন করিবার তরে॥
অতি সুশোভিত　　বক্ষ বিস্তারিত
দেখিনু দর্পনাকার।
তাহার উপরে　　মালা বিরাজিত
কি দিব উপমা তার॥
নাভির উপরে　　লোমলতা বলি
সাপিনী আকার শোভা।
ভুরুর বলনী　　কামধনু জিনি
ইন্দ্র ধনুকের আভা॥
চরণ নখরে　　বিধু বিরাজিত
মনির মঞ্জির তায়।
চণ্ডিদাস হিয়া　　সেরূপ দেখিয়া
চঞ্চল হইয়া যায়॥

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও নেত্রোৎসব দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথের বদন কমল দর্শন করিয়া রাধাভাবে বিভোর হইয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তগণ লইয়া আনন্দে দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন।

হেরি গোরা নীলাচল নাথ।
নিজ পারিষদগণ সাথ॥
বিভোর হইল গোপী ভাবে।
কহে কিছু করিয়া আক্ষেপে॥
আমি তোমায় না দেখিলে মরি।
পালটি না চাও তুমি ফিরি॥
ছলছল অরুণ নয়ন।
বিরস আজ সরস বদন॥
বিভোরিতে গোরা ভাব হেরি।
কহে কিছু দাস নরহরি॥

এইরূপে প্রভু—

মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত কৈল শ্রীমুখ দর্শন।
স্বেদ, কম্প, ঘর্ম্ম অঙ্গে বহে অনুক্ষণ॥

তখন ভক্তগণ প্রভুকে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহাকে বাসায় আনিলেন।

নবযৌবন অমাবস্যাতে হয়; নেত্রোৎসব বিধি প্রতিপদে অনুষ্ঠিত হয়। নবযৌবনের বিষয় অমিয়-নিমাইচরিত

অথবা চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ দেখিতেছি না; নেত্রোৎসব বিধির উল্লেখ দেখিতেছি। নবযৌবন বিধিটী নূতন প্রবর্ত্তিত কিনা তাহা বলা যায় না। যদি নবযৌবন বিধি সে সময়ে থাকিয়া থাকে তাহা হইলে মহাপ্রভু নেত্রোৎসব অপেক্ষা নবযৌবনের দিনই অধিক পরিমাণে ব্যাকুলতার ভাব দেখাইয়াছেন মনে করিতে হইবে। আর উভয় দিনেই এই ভাব হইলেও কিছু দোষ হয় না, কারণ তিনি ভাব-নিধি,—তাঁহার কোন সময়ে কোন ভাব উদয় হইতেছে তাহা কেহ বর্ণনা করিতে পারে না। কোন সময়ে তিনি রাধা সাজিয়া ভৎর্সনা করিতেছেন আবার পরক্ষণেই ভক্তিতে গদগদ হইয়া কৃষ্ণের চরণ-যুগল ধারণ করিতেছেন; আবার নিজেই কৃষ্ণ সাজিয়া এক সময়েতেই ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া নিজের পায় নিজে প্রণাম করিতেছেন।

পরদিবস রথযাত্রা। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব রথে চড়িবেন, এই আনন্দে প্রভুর সারারাত্রি নিদ্রা নাই।

প্রভুর হৃদয়ানন্দ সিন্ধু উথলিল।
উন্মাদ ঝঞ্ঝার বায়ু তৎক্ষণে উঠিল॥

(চরিতামৃত)

প্রতিপৎ দিবসে প্রভুর নেত্রোৎসব হইলে, তৎপর দিবস দ্বিতীয়া তিথির প্রাতঃকালে "খেচরান্ন" ভোগ শেষ করিয়া রথাভিমুখে প্রভুর পাহুণ্ডি-বিজয় করা হয়। এই যাত্রার নাম

গুণ্ডিচা যাত্রা। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পট্টমহিষীর নাম গুণ্ডিচা থাকায়, সেই অনুসারে এই যাত্রার নামকরণ হইয়াছে। এই যাত্রার নামান্তর নন্দীঘোষ বা পতিতপাবন যাত্রা, অথবা রথযাত্রা।

৭। রথযাত্রা।

"রথেন্তু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।"
যে পশ্যন্তি রথে যান্তং দারুব্রহ্ম সনাতনং।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলং তেষাং প্রকীর্ত্তিতং॥
জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণেতি যো বদেৎ।
গুণ্ডিচা মণ্ডপং যান্তং কৃষ্ণং ভক্তিসমন্বিতঃ॥
স মর্ত্ত্যো গর্ভবাসস্য ন চ দুঃখমবাপ্নুয়াৎ॥

এই শাস্ত্রোক্ত বচন অনুসারে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাহাত্ম্য রথযাত্রা উপলক্ষে বিশেষ দৃষ্ট হয়। এই সময়ই নানাদেশ হইতে বহু যাত্রিকের সমাবেশ হইয়া থাকে, এবং যতরূপ উৎসব হইয়া থাকে তন্মধ্যে রথযাত্রা সর্ব্বপ্রধান। এই সময়ে যত যাত্রিক আসে, এরূপ লোক সংঘট্ট আর কখনও হয় না—আনন্দও অপরিসীম হইয়া থাকে।

ইহা নবদিনাত্মক যাত্রা, অর্থাৎ দ্বিতীয়া হইতে দশমী পর্য্যন্ত স্থায়ী। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা ইহাদের প্রত্যেকের জন্য এক একটী রথ প্রতি বৎসর নূতন করিয়া
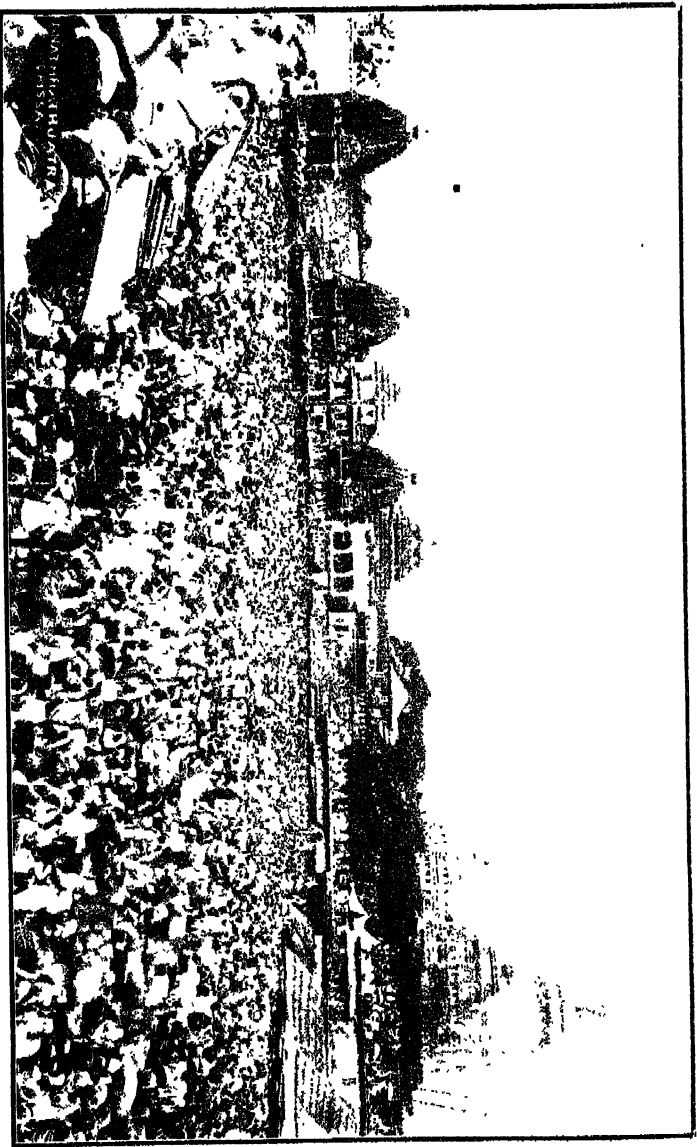
রথযাত্রা

নির্ম্মিত হয়। গুণ্ডিচা যাত্রার প্রথম দিবসে রথ সমস্ত সিংহদ্বারে উপস্থিত করা হয়। রথযাত্রার সময়, জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীকে রথে তুলিয়া মন্দির হইতে এক মাইল দেড় মাইল দূরস্থিত উদ্যানগৃহ গুণ্ডিচা মন্দিরে আনা হয়।

জগন্নাথ মন্দিরের পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বারের সম্মুখ দিয়া উত্তরদিকে যে একটী প্রশস্ত রাস্তা গিয়াছে, এই রাস্তার নাম "বড় দাণ্ড" বা রথের রাস্তা—এই রাস্তা গুণ্ডিচা মন্দির ও ইন্দ্রদ্যুম্ন পর্য্যন্ত গিয়াছে। রথের সময় এই রাস্তা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। রাস্তার দুইধারে যত দালানের ছাদ আছে, তাহাও পরিপূর্ণ হইয়া যায়। এই সময়ে যাহাদের মন্দিরের নিকট বাড়ী আছে, তাহারা বিশেষ লাভবান হয়; এমন কি বৎসরের ভাড়াতে যাহা লাভ না হয় তাহা অপেক্ষা অধিক পাইয়া থাকেন। অনেক পূর্ব্ব হইতে এই সব কোঠা কি ছাদ সংগ্রহ করিতে হয়। সামান্য একটি কোঠার ভাড়া ৫০৲ টাকা হইতে ১০০৲ টাকা প্যর্যন্ত হইয়া থাকে, এমন কি তাহা অপেক্ষাও অধিক হয়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ১২টা ১টার সময় রথে আসেন। সকাল বেলায় দর্শকগণ যাহার যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করেন। যাহারা ছাদে বসিবেন, তাহাদের তাড়াতাড়ি যাইতে হয়। রাস্তা হইতে যাহারা দেখিবেন, তাহাদের সকাল বেলা যাইতে হয় না; কিন্তু যাহারা রথারোহণ

সময়ে ঠাকুরকে দর্শন করিতে চান, তাহাদের প্রাতঃকালেই যাইতে হয়। সেখানে স্থানের পরিমাণ অল্প, লোক সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পুলিশ্-সাহেব পুলিশ দলবল সহ উপস্থিত থাকেন। এই সময়ে সকলেই উৎকণ্ঠার সহিত বসিয়া থাকেন—কতক্ষণে ঠাকুর আসিবেন। ঘণ্টা বাজিলেই মনে হয় এই বুঝি ঠাকুর আসেন—আবার নিরাশ হইতে হয়। এইরূপে আশায় এবং নিরাশায় বহু সময় কাটিয়া যায়। নব অনুরাগিনী প্রেমিকা যেমন ভালবাসার পাত্র কতক্ষণে আসিবেন এই উৎকণ্ঠায় কালযাপন করে,—রথস্থ জগন্নাথ দেখিবার জন্য সমস্ত লোকও সেইরূপ উৎকণ্ঠিত ভাবে কাটাইতে থাকে। প্রথমতঃ বলরাম রথে আসেন, তৎপর শ্রীসুভদ্রা দেবী, অবশেষে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব আসেন—উঠিবার পূর্ব্বে রথ পরিক্রমণ করিয়া তৎপরে রথে আরোহণ করেন। ঠাকুর রথে আরোহণ করিলে পর, সাধারণ যাত্রিক—তন্মধ্যে অধিকাংশই পশ্চিমা বা পুরীবাসী যাত্রিক, জগন্নাথ দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। এক দিকে পুলিশ শৃঙ্খলা রাখিবার জন্য তাহাদিগের গতি প্রতিরোধ করিতেছে, অপরদিকে পুলিশ-আক্রমণ হইতে পলাইয়া গিয়া কেহ বা আহত হইয়া দর্শন করিতেছে। এই দৃশ্য এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কাল অভিনীত হয়। ইহার পরে রথ চলে। এই সময়ে বহু কীর্ত্তন হইতে থাকে; তন্মধ্যে ৺চরণ দাস বাবাজির দল প্রধান।

রথের প্রথম দিবস অত্রত্য বহুসংখ্যক আদিম বাসীদিগের সাহায্যে রজ্জু বন্ধনে জগন্নাথ ও বলরামকে রথে উত্তোলন করা হয়। সুভদ্রাদেবীকে ক্রোড়ে করিয়া রথে আরোহণ করান হয়। যে সকল লোক দ্বারা জগন্নাথ ও বলরামকে রথে তোলা হয়, তাহাদিগকে দয়িতা বলে। দয়িতাগণ এই সময়ে সর্ব্বে সর্ব্বা। এই সমস্ত রথের উচ্চতা যথা—জগন্নাথদেবের রথ ২৩ হাত উচ্চ, বলরামের রথ ২২ হাত উচ্চ, এবং সুভদ্রাদেবীর রথ ২১ হাত উচ্চ। জগন্নাথদেবের রথের ষোড়শ চাকা, ইহাকে নন্দীঘোষ রথ বলা যায়; ইহার জন্য ষোড়শ শত বেঠিয়া আবশ্যক। (যাহারা রথ টানে তাহাদিগকে বেঠিয়া বলে।) বলরামের রথের চতুর্দ্দশ চাকা—ইহাকে তালধ্বজ বলা হয়। সুভদ্রা দেবীর রথে দ্বাদশ চাকা, ইহাকে দবদলন রথ বলা হয়। উপরোক্ত রথদ্বয়ের আকর্ষণ নিমিত্ত যথাক্রমে চতুর্দ্দশ শত ও দ্বাদশ শত বেঠিয়া আবশ্যক হয়। প্রত্যেক রথের চক্র সংখ্যানুসারে রথ রজ্জু ব্যবহার করা হয়। রজ্জু নারিকেলের ছোবড়ায় নির্ম্মিত। প্রত্যেক রজ্জু প্রায় একশত হস্ত লম্বা। অধুনা বেঠিয়ার সংখ্যা অনেকাংশে কম হইয়াছে।

স্নানযাত্রা হইতে গুণ্ডিচাযাত্রা শেষ হওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বাবসু বংশীয়—যাহাদিগকে দয়িতা নিয়োগ বলে, তাহাদের অধিকার; এবং বিদ্যাপতিবংশীয়েরা—যাহাদিগকে

পতি বলে তাহারা পূজা কার্য্য সম্পন্ন করে। প্রতিষ্ঠা বিধির পর সমস্ত রথ নানাবিধ পট্টবস্ত্রে ও ভূষণে সুসজ্জিত করা হয়।

এখন পাঠকদিগকে একটু পূর্ব্বকার অবস্থা শুনিতে হইবে। রাজা প্রতাপরুদ্র এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব রথের সময়ে কিরূপ করিতেন তাহা শুনাইতেছি।—আহা, এই রথযাত্রার সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের কতই না ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল! শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আনন্দে বিহ্বল, ভাবে বিভোর; প্রাতঃস্নান করিয়া সমস্ত ভক্তগণ সহ তাঁহারা একেবারে জগন্নাথের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবার রথের মহাসজ্জা! রাজা প্রতাপরুদ্র প্রভুর অনুগত। প্রভুর সন্তোষের জন্য এবার রথের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইয়াছে। ভগবানের রথ নানা বর্ণের বস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত হইয়াছে, তাহাতে নানা বর্ণের পতাকা উড়িতেছে। মহা কলরবের সঙ্গে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। এই সময়ে সেবকগণ শ্রীবিগ্রহ ধরিয়া মহা উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথকে রথের উপর আরোহণ করাইলেন।

রথ চলিল, দর্শকগণ দুই পার্শ্বে পদব্রজে চলিলেন। এসময়ে আমাদের মহাপ্রভু কি করিতেছেন দেখা যাউক। যথা অমিয় নিমাই-চরিত—

অপরূপ রথের সাজনি।
তাহে চড়ি যায় যাদুমণি॥

রথারূঢ় শ্রীশ্রীজগন্নাথ
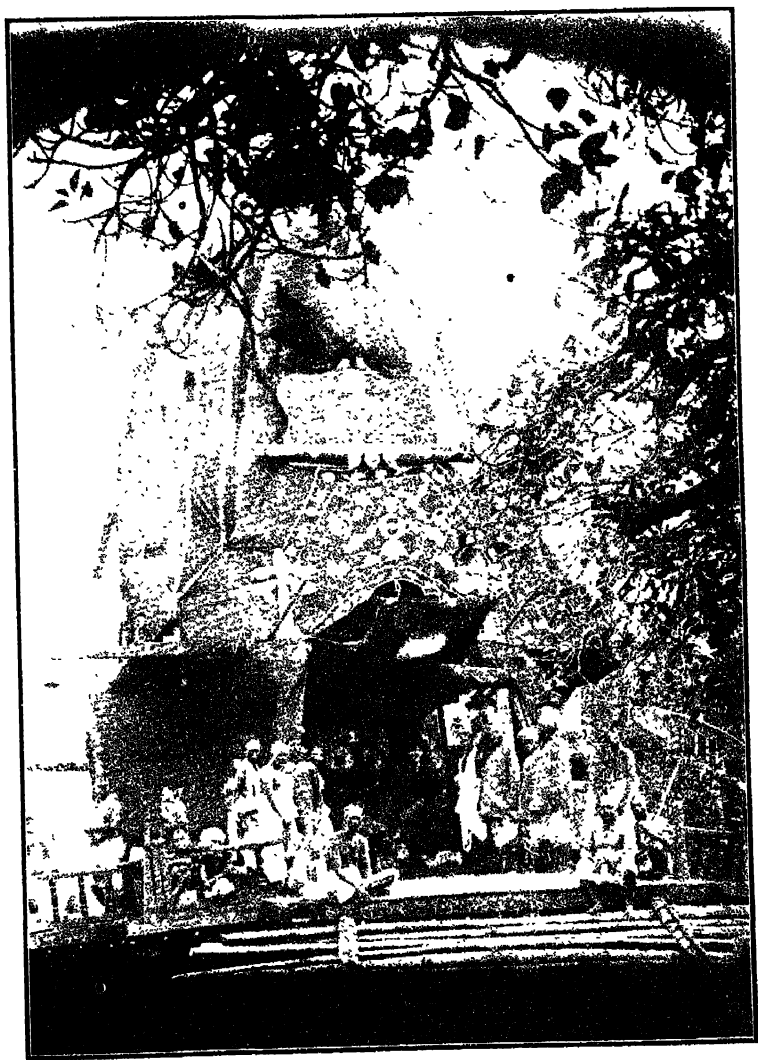
দেখিয়া আমার গৌর হরি।
নিজগণ লইয়া এক করি॥
মাল্য চন্দন সবে দিয়া।
জগন্নাথ নিকটে যাইয়া॥
রথ বেড়ি সাত সম্প্রদায়।
কীর্ত্তন করে গৌর রায়॥
আজানু লম্বিত বাহু তুলি।
ঘন উঠে হরি হরি বলি॥
গগণ ভেদিল সেই ধ্বনি।
অন্য আর কিছুই না শুনি॥

রথাগ্রে যে কীর্ত্তন পদ্ধতি দেখিতে পাই, তাহা সেই মহাপ্রভুর সৃষ্টি। ইহার বিস্তারিত বিবরণ স্বর্গীয় শিশির বাবু অমিয় নিমাই চরিত গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

"এই রথ যাত্রার ব্যাপারে সমস্ত লোক এই তিনটি জিনিষ লক্ষ্য করিতেছেন—

১। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথারোহণ,

২। শ্রীগৌরাঙ্গদেব পদব্রজে,

৩। রাজা প্রতাপ রুদ্রও পদব্রজে,

লক্ষ লক্ষ লোক এই তিন জনকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তখন মহাপ্রভু কি করিতেছেন,

সাত ঠাঁই বুলে প্রভু হরি হরি বলি।
জয় জয় জগন্নাথ কহে হস্ত তুলি॥

(চরিতামৃত)

প্রভুর এই অবস্থা দেখিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র ভাবিতেছেন যেন, শ্রীজগন্নাথ রথ স্থগিত করিয়া প্রভুর কীর্ত্তন শুনিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তাহার জ্ঞান হইল যে রথের উপর যিনি বসিয়া আছেন, তিনি আর প্রভু এক বস্তু, তিনি রথে জগন্নাথকে দেখিতে পাইলেন না—দেখিলেন প্রভু বসিয়া আছেন।

প্রতাপরুদ্রে হইল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হইল প্রেমময়॥
রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি প্রসন্ন প্রভুর মন।
সে প্রসাদে পাইল এই রহস্য দর্শন॥

(অমিয়নিমাইচরিত)

রথ চলিবার পূর্ব্বে, সেই ধীশক্তি সম্পন্ন রাজাধিরাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র হস্তে সুবর্ণের মার্জ্জনী ও চন্দন জল লইয়া রথ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন, আর উহাতে চন্দন জলের ছিটা দিতে লাগিলেন। রাজা ভাবিতে লাগিলেন, তাহার এমন ভাগ্য কি কখন হইবে যে তিনিও গৌরাঙ্গের গণ হইবেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা এখন বিবেচনা করুন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন প্রায়ৈ র্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

শ্রীমদ্‌ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়।

প্রভু এই সময়ে সাত সম্প্রদায় একত্র করিলেন। পরে স্বয়ং নৃত্য করিবেন ইচ্ছা করিলেন প্রভু প্রথমে জগন্নাথকে দণ্ডবৎ করিলেন এবং নিম্নোক্ত শ্লোকে জগন্নাথের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

পরে তাঁহার নিজ কৃত শ্লোকে যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি।

জয়তি জয়তি দেবো দেবকী-নন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণি-বংশ-প্রদীপঃ।
জয়তি জয়তি মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বিভারনাশো মুকুন্দঃ॥
জয়তি জননিবাসো দেবকী জন্মবাদো
যদুবর পরিষৎস্বৈ র্দোর্ভিরস্যান্ন ধর্ম্মং।
স্থিরচর বৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত শ্রীমুখেন
ব্রজপুর বনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবং॥

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি র্বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্দে
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসানুদাসঃ॥

এই স্তব পাঠ করিতেছেন, আর তাঁহার আয়ত নেত্র দিয়া জলের ধারা পড়িতেছে। দর্শকগণ অপরূপ দেখিতেছেন যে, তাঁহার অশ্রু বারিধারার ন্যায় মৃত্তিকায় পড়িতেছে। এই বারি ধারায় ভক্তগণের হৃদয়কে প্রক্ষালিত করিলেন। অতঃপর প্রভু নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রভুর নৃত্য সম্বন্ধে চরিতামৃতে যে বর্ণনা আছে তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

যথা চরিতামৃতে—

উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদয় হয় সমকাল॥
মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
এক এক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোক জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাহে রক্তোদ্গম।
জয় জয় জজগগ গদ্গদ্ বচন॥

জল-যন্ত্র-ধারা যেন বহে অশ্রুজল।
আস পাস লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহ-কান্তি গৌর কভু দেখিয়ে অরুণ।
কভু কান্তি দেখি যে মল্লিকা-পুষ্পসম॥

প্রভুর ভাবোন্মাদ হইল,—সেই সঙ্গে লোক সমূহ আনন্দে পাগল হইয়া উঠিল।

জগন্নাথ-সেবক যত রাজ-পাত্রগণ।
যত্রিক-লোক নীলাচলবাসী যতজন॥
প্রভু-নৃত্য-প্রেম দেখি হয় চমৎকার।
কৃষ্ণ-প্রেমে উথলিল হৃদয় সবার॥
প্রেমে নাচে গায় লোক করে কোলাহল॥
প্রভু-নৃত্য দেখি সবে আনন্দে বিহ্বল॥

প্রভু বলিয়াছিলেন, তিনি রাজ-সম্ভাষণ করিবেন না। রাজার সঙ্কল্প, তিনি প্রভুর কৃপাপাত্র হইবেন। শ্রীভগবান্ ভক্তের নিকট পরাস্ত হইলেন। এইরূপ ঘটনা আজ যে নূতন হইয়াছে, তাহা নহে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা —পঞ্চপাণ্ডব বধ করিবেন। যখন কৃষ্ণের কৌশলে তাহা ভঙ্গ হইল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন—কৃষ্ণ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবেন না,—সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ভগবানকে অস্ত্র ধরাইব। ভীষ্মের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার

নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন।

প্রভু রাজার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন,—তাঁহাকে কৃপা করিতে হইবে, অথচ বিষয়ীর সহিত সন্ন্যাসীর সংস্রব নিষেধ। তাই আজ প্রভু রাজার সম্মুখে মূর্চ্ছিত হইলেন, রাজা পাদুখানি আপনার ক্রোড়ে রাখিয়া অতি যতনে সেবা করিতে লাগিলেন। যথা কবিকর্ণপুরের কাব্যে—

আনন্দোৎসাহ-মূর্চ্ছাগত ইব ভবতি স্পন্দ-নিশ্বাস-মন্দে
রোহদ্রোমাঞ্চ-পূরৈর্বিকলিত-বপুষানন্দ-মন্দীকৃতেন।
স্যন্দন্নেত্রারবিন্দদ্বয়-সলিল-জুষা রুদ্রদেবেন ভূয়ঃ
সানন্দং সেবিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়-সরসি-রুহো রাজতে গৌরচন্দ্রঃ॥

সময়ে সময়ে প্রভু আনন্দে ও উৎসাহে এত অধীর হইতেছেন, যে তাহা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না;—তাহাতে নিশ্বাস ও স্পন্দন মন্দীভূত হইতেছে এবং প্রভুকে মূর্চ্ছাগত প্রায় দেখা যাইতেছে। অপরদিকে প্রতাপরুদ্রের দেহপিণ্ড আনন্দে জড়ীভুত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গ লোমাঞ্চিত হইতেছে, তাহাতে বিকলিত অঙ্গ দেখা যাইতেছে। তাঁহার নেত্র হইতে সলিলধারা পড়িতেছে—সেই অবস্থায় তিনি শ্রীগৌরচন্দ্রের পদসেবা করিতেছেন। সেই নয়ন-সলিলে গৌরচন্দ্র, যেন পদ্ম ফুটিয়াছে, এইরূপ শোভা পাইতেছেন।

মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হইয়া, নৃত্য গীত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেছেন। হঠাৎ রথ চলা বন্ধ হইল। রথ চলিতেছে না, রাজা ব্যাকুল হইয়া, উহা চালাইবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। এই সব ব্যাপার প্রভু তাঁহার ভক্তগণ লইয়া, নীরবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। রাজা যখন দেখিলেন যে, রথ চালান তাঁহার পক্ষে অসাধ্য, তখন নিরাশ হইয়া, অতিশয় কাতরভাবে প্রভুর পানে চাহিতে লাগিলেন। প্রভুও অমনি "ভয় কি, এই যে আমি আছি" নয়ন-ভঙ্গী দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। প্রভু চলিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ চলিলেন। প্রভু হস্তি সমুদায় রথ হইতে ছাড়াইয়া, রথের রজ্জু নিজ জনের হস্তে দিলেন, ও রথের পিছনে মস্তক স্পর্শ করিয়া উহা ঠেলিতে লাগিলেন। রথ অমনি হড়্ হড়্ করিয়া চলিতে লাগিল। যাঁহারা দড়ি ধরিয়া রথ টানিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন যে, তাঁহাদের শক্তিতে রথ চলিতেছে না, উহা যেন নিজ শক্তিতে চলিতেছে। তখন দর্শকগণ আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল, ও প্রভুর জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

জয় গৌরচন্দ্র জয় শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।
এই মত কোলাহল লোকে ধন্য ধন্য॥
দেখিয়া প্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্র সঙ্গে।
প্রভুর মহিমা দেখি প্রেমে ফুলে অঙ্গে॥

(চরিতামৃত)

রাজা এখন হইতে গৌররূপ ধ্যান, গৌর-নাম জপ্ করিতে লাগিলেন—ইহাই এখন তাঁহার সাধন ভজন হইল। শ্রীগৌরাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া পুরীধামে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র হইতে তাঁহার প্রজা পর্য্যন্ত সমস্তের হৃদয়েই এই কথা বদ্ধমূল হইল। রাজা প্রতাপরুদ্র মহাপ্রভুর গণ হইলেন, অর্থাৎ গৌরাঙ্গাবতারের যে চৌষট্ট মহান্ত আছে, প্রতাপরুদ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। অষ্টাদশবর্ষ প্রভু জগন্নাথে লীলা করিয়াছিলেন—কতরূপ লীলাই যে করিয়াছেন, তাহা সবিস্তার বর্ণনা করা যায় না। তিনি কখনও ভাবে অচেতন হইয়া পড়িতেন, কখনও দীর্ঘাকার হইয়া, কখনও বা কুর্ম্মাকার হইয়া চলিতেন। কখনও বা চক্ষেতে সুরধনীর আবির্ভাব হইত, সেই বন্যাতে সকলকে ভাসাইতেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব মহাপ্রভুকে দিয়া, তাঁহার লীলা-মাহাত্ম্য বিস্তার করিয়াছেন। মন্দিরের ভিতর, গরুড় স্তম্ভের নিকট যে কুণ্ড দেখিতে পাই, তাহা মহাপ্রভুর অশ্রুজলের কুণ্ড। দেওয়ালের গায়ে যে অঙ্গুলীর দাগ আছে, তাহা মহাপ্রভুর অঙ্গুলি-চিহ্ন। সেখান হইতে তাঁহার পদচিহ্ন এখন কোন কারণে স্থানান্তরিত করিয়া রাখা হইয়াছে।

স্তম্ভের গাত্রে যে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা শ্রীগৌরাঙ্গ সার্ব্বভৌমকে যে মূর্ত্তি দেখাইয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি। দক্ষিণ দরজায় যে মূর্ত্তিটী দেখিতে পাই, তাহাও

সেই ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি। মন্দিরের বাহিরে মন্দিরের গায়ে যে মূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহাও সেই ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি।

আমাদিগের শ্রীগৌরাঙ্গদেব মন্দিরের অন্তর ও বাহির উভয়দিক অধিকার করিয়াছিলেন। কবে আমাদের সেই দিন আসিবে, যে দিন আমাদের দেহ-মন্দিরের অন্তর্বাহ্য মহাপ্রভু অধিকার করিবেন; আমরা তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া কৃতার্থ হইব। বাস্তবিক সেই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গদেব জগন্নাথের রাজা। প্রতাপরুদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া পাত্রমিত্র সকলেই তাঁহার প্রজা। প্রেম তাঁহার রাজ্য, ভক্তি তাঁহার ধন; প্রজা হইতে রাজা পর্য্যন্ত সকলেই এই ধন লইবার জন্য ব্যাকুল। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব অষ্টাদশবর্ষ ব্যাপিয়া, এই রাজকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন—এই কার্য্যের দিনরাত্রি ভেদ ছিল না—দিবানিশি এই ধ্যান করিতেন।

এইরূপে, সারাদিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ গুণ্ডিচা-বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথমদিন মূর্ত্তিত্রয় রথারূঢ় হইবার পরে, রথত্রয় "বেঠিয়া" দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, যজ্ঞবেদীর নিকট সায়ংকালে উপস্থিত হয়। সেইদিন রাত্রে, প্রভুদিগকে "পাহুণ্ডি" করাইয়া, যজ্ঞবেদীস্থ রত্ন-সিংহাসনে স্থাপন করা হয়। সপ্তদিবস পর্য্যন্ত দেব যজ্ঞবেদীতে অবস্থান করেন। নীলাদ্রিস্থ মন্দিরের ন্যায় এই স্থানের নীতি অবিকলরূপে অনুষ্ঠিত হয়। এই সপ্তদিবস অন্ন পিষ্টকাদি ভোগ দেওয়া হয়। এই উদ্যান বৃক্ষলতাদি দ্বারা শোভিত এবং ১৫ ফিট্

উচ্চ প্রাচীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত। ইহার নাম গুণ্ডিচা-বাড়ি—সর্ব্বসাধারণে এই বাড়িকে শ্বশুর-বাড়ি বলিয়া থাকে। এইখানে আসিয়াই রথ থামে। •

এই বাড়ীতে প্রবেশ করিবার দুইটী দ্বার আছে। একটী দ্বার দক্ষিণদিকে, অন্যটী পশ্চিমদিকে। ভিতরে বড় বড় মন্দিরে আছে। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেই স্তম্ভোপরি গরুড় দর্শন হয়। বামদিকে দেবী-মূর্ত্তি আছেন; লোকে তাঁহাকে জগন্নাথের বড় মাসী বলিয়া থাকে। ডানধারে একটী অঙ্গন পার হইলে, মন্দিরের ভিতর শ্রীশ্রীজগন্নাথের রত্নবেদী দৃষ্টিগোচর হয়। এইস্থানে আসিয়া জগন্নাথ থাকেন। এইস্থানে সপ্তদিবস পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের সকল কার্য্য শেষ হয়। ইতি মধ্যে রথত্রয়ের মুখ নীলাদ্রির দিকে স্থাপন করা হয়। ইহাকে দক্ষিণ-মূর্ত্তি বলা যায়। নবমদিবসে প্রাতঃকালের পূর্ব্বে খেচরান্ন ভোগ শেষ করিয়া, দেবকে রথারূঢ় করা হয়। এই রীতি ক্ষেত্রমাহাত্ম্য প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। উড়িষ্যা হিন্দু রাজাদিগের অধীন থাকার সময়, কার্য্য এইরূপে সম্পাদিত হইত। উড়িষ্যা পরাধীন হইবার পরে, এই রীতির বিশৃঙ্খলা ঘটে; অর্থাৎ একদিবস মধ্যে রথ না যাইয়া, ৪।৫ দিনে রথত্রয় যজ্ঞবেদীর নিকট উপস্থিত হইত। যাহা হউক, সপ্ত দিবস মধ্যে অন্ততঃ একদিবস ও গুণ্ডিচা গৃহে প্রভুর একবার অন্নভোগ হওয়া কর্ত্তব্য; নচেৎ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত

রথযাত্রা বন্ধ হইয়া যাইবে। এই সকল "নীলাদ্রি মহোদয়" গ্রন্থ সমূহে লিখিত আছে। সম্প্রতি সুযোগ্য ম্যানেজার মহাশয়দের যত্নে, রথত্রয় এক দিবসেই, গুণ্ডিচাবাড়ি পৌঁছে; কাজেই তথায় রীতিমত ভোগ রাগ হয়। সাতদিবস প্রভু ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া, শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

মাদলা-পঞ্জিকায় প্রকাশ এবং জনশ্রুতি ও আছে, যে বড়দাণ্ডে প্রথমে নদী থাকায় ছয়টী রথ প্রস্তুত হইত। অধুনা যেখানে "অর্দ্ধাশনী" (আদিতে মহাপ্রলয় কালে অর্দ্ধাংশ জলপান করিয়াছিলেন বলিয়াই ইঁহাকে অর্দ্ধাশনী শক্তি কহে। ইঁহাকে দর্শন করিলে বিশেষ পুণ্য হয়) অবস্থিত, তাহা নদীর দক্ষিণ পাড়ে ছিল; এবং গুণ্ডিচা-মণ্ডপ বাম পাড়ে; এই দুইয়ের মধ্যে নদী ছিল। অধুনা নদী শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু তাহার মোহানা অদ্যাপি বর্ত্তমান, এবং এই মোহানা "বঙ্কি-মোহানা" নামে অভিহিত হয়। সেই মোহানায় এখন চক্রতীর্থ অবস্থিত। বালুকা দ্বারা নদীর মুখ বন্ধ হওয়ায় নদীর গতি ক্রমশঃ হ্রাস হইল; এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া সেই স্থান উচ্চ হওয়ায় সলিলস্রোত ভিন্ন পথ অনুসরণ করিল। সেই নদী লোপ প্রাপ্ত হইয়া, কালক্রমে জীবের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। এখন তাহা "সৈকত-সাবধা" বলিয়া অভিহিত। নদীতে পার হইবার জন্য নৌকা থাকিত। সেই নৌকায়

পার হইয়া, ঠাকুর রথে আরোহণ করিতেন। এখন নদী না থাকায়, মাত্র তিন খানা রথ প্রস্তুত হয়।

পাঠকগণ! আপনারা শ্রীশ্রীজগন্নাথের ঐশ্বর্য্যের কথা অর্থাৎ অলৌকিকতা শুনিয়া থাকিবেন। মাঝে মাঝে শুনা যায়, রথের গতি থামিয়া যাইত। এইরূপ আরও যে সকল অলৌকিক ঘটনা ঘটিত, তৎ সমুদায় মিথ্যা নহে। সেই প্রেমময় ভগবানের যে কি খেলা, তাহা সামান্য মানব কিরূপে বুঝিতে পারিবে। ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মাদি যখন, তাঁহার লীলা কিছুই বুঝিতে পারেন না, তখন সামান্য জীবের কি অধিকার যে বুঝিতে পারে? তিনি প্রেমময়, দয়ার অবতার, ভক্তবৎসল; তিনি যাহাকে দয়া করিয়া না বুঝান, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। এ সম্বন্ধে নিম্নে একটী গল্প লিখিত হইতেছে;—তাহা পাঠ করিয়া পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, ভক্তের উপর ভগবানের কিরূপ দয়া।

"অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।"

ইত্যাদি বচন দ্বারা দেখা যায় যে, যিনি ভগবানের ভক্ত, তিনি যদি কখনও আচার ভ্রষ্ট হন, অথবা কোন কুকার্য্য করেন, তবে ভগবানের নামের গুণে সে সমুদায়েরও খণ্ডন হয়। প্রেমের বন্যায় সমস্ত পাপ প্রক্ষালিত হইয়া যায়।

তরণীব তিমির-জলধের্জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম।

জগতের মঙ্গলকারী হরিনাম ত্রিতাপ-জলধির তরণী-

স্বরূপ ; সেই হরির নাম জয়যুক্ত হইতেছে। এই জগন্মঙ্গল হরি নামেতে, সমস্ত পাপ তাপ বিধৌত হয়।

বলরাম দাস্ নামে কোন এক ভক্ত, এক সময়ে ইন্দ্রিয়-সংযম করিতে না পারায়, কোন বেশ্যার গৃহে গমন করেন, এবং তাম্বূল-চর্ব্বনাদি নানারূপ ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের কথা, এই মোহেতে তিনি ভুলিয়া যান ; তখন ঐ বারাঙ্গনা তাঁহাকে ভৎ র্সনা করিয়া বলিতেছে—"শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথ-যাত্রা হইতেছে, দেখিতে যাইবে না ?" বারাঙ্গনার এই ভৎ র্সনাতে তাঁহার চৈতন্য জন্মিল। তখন বলরামদাস অপবিত্র শরীরেই দৌড়াইয়া রথের উপর উঠিতে গেলেন। কিন্তু সেবকগণ তাঁহার দুশ্চরিত্রতার কথা শুনিয়া, তাঁহাকে রথ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এই অপমানে বলরাম মর্ম্মাহত হইয়া রথারূঢ় ঠাকুরকে যথেচ্ছরূপে ভৎ র্সনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, ঠাকুর তাঁহার কথা শুনিলেন না। ইহাতে বলরাম আরও ক্ষুব্ধ হইলেন।—জগন্নাথের উপর তাঁহার ক্রোধ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। কোন প্রেমিকা যদি তাহার প্রিয়-পাত্র দ্বারা অপমানিতা হয়, তাহা হইলে অন্য লোক দ্বারা অপমানিতা হওয়া অপেক্ষা, ইহা অধিক দুঃসহ মনে করে। তাই প্রেমিকা-স্থানীয় বলরামও দুঃখে ও অভিমানে মর্ম্মাহত হইয়া, রথস্থান ত্যাগ করিয়া, চক্রতীর্থে গমন করিলেন। সেইখানে বালুকাদ্বারা তিন খানা রথ প্রস্তুত করিয়া

জগন্নাথের রথযাত্রা আরম্ভ করিলেন। ভক্তের টানে ভগবান্ বালুকা-নির্ম্মিত রথে আবির্ভূত হইলেন। এদিকে জগন্নাথের রথ চলিতেছে না,—কত হস্তী, রথ টানাটানি করিতে লাগিল,—কত সহস্র লোক, রথ ঠেলিতে ও টানিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই রথ চলিল না। সকলেই হতাশ হইয়া পড়িল।

ভক্তের মান ভগবান্ রক্ষা করেন। তাই বলরামদাসের রথ সেই হইতে চির স্মরণীয় হইল। আজ বলরামদাসের নিকট ঠাকুর বাঁধা। ভক্তির প্রভাবে ভগবান্ এক সময়ে বলির দ্বারে দ্বারী হইয়াছিলেন। নন্দ-যশোদার বাৎসল্যে তিনি এক সময়ে বাধা বহিয়াছিলেন। ভক্তিবলেই গোপ-বালকেরা ভগবানের স্কন্ধে আরোহণ করিয়াছিল। আজ বলরামদাসও ঠাকুরকে এই ভক্তিডোরে বাঁধিয়াছেন। ভগবান্ উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। এদিকে জগন্নাথের রাজা প্রতাপ রুদ্র রথ চলে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলেন। তিনি জগন্নাথের নিকট হত্যা দিলেন। জগন্নাথ দেখিলেন, উভয় ভক্তের মধ্যে একটা আপোষ না হইলে, বড়ই বিভ্রাট হইবে। তখন ভগবান্ জগন্নাথদেব, রাজা প্রতাপরুদ্রকে স্বপ্নাদেশ করিলেন যে, আমার প্রিয় ভক্ত বলরামদাসকে তোমার রথের সেবকেরা অপমানিত করিয়াছে; তাহাদিগকে হাতে গলায় বাঁধিয়া বলরামদাসের নিকট উপস্থিত কর। তাহারা বলরামদাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে

চক্রতীর্থে বলরামদাসের বালুর রথ

RAY & SONS

প্রসন্ন করিতে পারিলেই রথ চলিবে। রাজা এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং প্রাতঃকালে সেবক-দিগকে হাতে পায়ে বাঁধিয়া, বলরামদাসের নিকট উপস্থিত করিলেন; রাজা স্বয়ং ও উপস্থিত হইলেন। বলরাম দাস রাজার নিকট এবং সেবকদের নিকট ভগবানের আদেশ-বাণী শুনিয়া, ভগবৎ-প্রেমে বিমুগ্ধ হইলেন। বলরাম ভাবিলেন, ভগবান্ আমার জন্য কত কি করিয়াছেন;—বুঝি এই জন্যই তাঁহাকে জগদ্বন্ধু ও ভক্তবৎসল বলিয়া থাকে। বলরামের মনে হইল, জগন্নাথ কত রাজসেবায় তৃপ্ত হইতেন; এই কয়দিন যাবৎ একেবারে অনাহারে আছেন,—আমার জন্য তাঁহার কতই না কষ্ট হইয়াছে। এই ভাবিয়া বলরাম দ্রুতপদে রথের স্থানে উপস্থিত হইলেন। রথোপরি তাঁহার প্রিয়বন্ধু জগদ্বন্ধুকে দর্শন করিয়া, আনন্দে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন, "আজ তুমি ভক্তের ভগবান্, ইহার জীবন্ত পরিচয় পাইলাম।" এইরূপ বলিতে বলিতে, বলরামদাস রথ ঠেলিতে আরম্ভ করিলেন। অমনিই রথ আপনি চলিতে লাগিল এবং অনায়াসেই গুণ্ডিচা বাড়ী পৌঁছিল। ইহার বিস্তারিত বিবরণ; অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর "ভক্তের জয়" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা পুরীতে যেরূপ হইয়া থাকে, ইহাই সর্ব্বত্র প্রচারিত; এবং শাস্ত্রও তাহাই বলিতেছেন।

তবে যোগী ভক্তেরা এই দেহকেই রথ কল্পনা করিয়া থাকেন, —এবং সহস্রার, হৃদয় এবং মূলাধার, ইহাদিগকে তিন তলা বলিয়া আরোপ করেন। সর্ব্বোপরি তলা সহস্রার;—সহস্রার স্বর্গ,—হৃদয় মর্ত্ত্যলোক,—এবং মূলাধার, পাতাল। সহস্রারে জগন্নাথ বাস করেন; হৃদয়ে ভগবানের লীলাক্ষেত্র, এবং পাতাল পাপী জীবদিগের বাস স্থল। এই রথ বৌদ্ধ মন্দিরেও দেখা যায়। এই সম্বন্ধে স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকট প্রশ্ন হইয়াছিল যে, বৌদ্ধ মন্দিরে রথ হয় কেন। তাঁহার প্রশ্নোত্তর নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।—

প্রশ্ন। বৌদ্ধ মন্দিরে রথযাত্রা হয় কেন?

উত্তর। রথ মনুষ্যদেহ, তিনতলা। উপর তলায় সহস্রদল পদ্মে শ্রীশ্রীবামনদেব অর্থাৎ জগন্নাথ বিরাজ করেন। বামন অবতারে ত্রিভুবন অধিকার করেন, এজন্য জগন্নাথ। এই রথে বামনদেবকে দর্শন করিলে পুনর্ব্বার জন্ম হয় না। মধ্যতলার সমস্ত দেবদেবী একপদ্মে ও কুটীরে বিরাজ করেন। সমস্ত অবতার ও তাঁহাদের কার্য্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। নীচের তলায় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য রিপুগণ তাঁহাদের পরিবারগণের সহিত বিরাজ করেন। বামনদেব রথে উঠিবামাত্র, চারিদিকে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতে থাকে, নীচের তলায় সিঁড়ি পড়ে। চারিদিক হইতে ভক্তমণ্ডলী আসিয়া ভিড় করিলে, কাম

ক্রোধগণ পরিবার লইয়া পলায়ন করেন। তখন সত্ব রজঃ তমোরূপ প্রকাণ্ড তিনগাছা কাছি রথে বাঁধিয়া টানিতে থাকে। দুঃখসুখময় কালচক্র ঘুরিতে ঘুরিতে ঠাকুর মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইলে, কাছি খলাইয়া লয়।

বুদ্ধদেব সিদ্ধিলাভ করিয়া, কাহার নিকট এই তত্ব প্রকাশ করিবেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে পূর্ব্বের পঞ্চ শিষ্যের কথা মনে হইল। বুদ্ধদেব তাহাদের নিকট সমস্ত তত্ত্ব বর্ণনা করিয়া নিজের শরীর রথ, তাহাতে দেবতা ও কন্দর্পের প্রকাশ, পরে ব্রহ্মলাভ এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলেন, তাহাই রথ। এইজন্য বৌদ্ধ-মন্দির মাত্রেতেই রথযাত্রা হইয়া থাকে।

গুঞ্জাবাড়িতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ৯ দিন অবস্থানানন্তর দশমীতে পুনর্যাত্রা হয়। এই সময়েও অনেক যাত্রিক সমবেত হয়। ফলেরও বোধ হয় তুল্যতাই আছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রথম দিন আসিয়া, মন্দিরে প্রবেশ করেন না। দ্বিতীয় দিবসও সমস্ত জীবকে দর্শন দিবার জন্য বাহিরে রথোপরি থাকেন। তৃতীয় দিন শেষ বেলায় অবতরণ করেন। বলরাম ও সুভদ্রা প্রথমতঃ মন্দিরে প্রবেশ করেন। তৎপর লক্ষ্মীর আদেশে কপাট বন্ধ হইয়া যায়,—জগন্নাথ ভিতরে প্রবেশ

করিতে পারেন না। এই সময়ে জগন্নাথের পক্ষ হইতে অনেক বস্ত্রালঙ্কারের প্রলোভন দেখান হয়; কিছুতেই লক্ষ্মী দরজা ছাড়েন না। লক্ষ্মীর পক্ষ হইতে বলা হয়—

"দেয়াসুরকে * যাইতে দাও মন্দির ভিতর।
কালীয়া পড়িয়া থাক প্রাচীর তর॥"

ইহাদ্বারা একটী বেশ প্রেমের লীলা প্রকটিত হইয়াছে। লক্ষ্মীর অভিমান হইয়াছে, সেইজন্য জগন্নাথকে প্রবেশ করিতে দিতেছেন না। প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা পরে, যখন জগন্নাথ আসিয়া বড়ই কাকুতি মিনতি করিতে থাকেন, তখন কপাট খুলিয়া দেওয়া হয়। জগন্নাথের পক্ষে পাণ্ডারা, এবং লক্ষ্মীর পক্ষে দেবদাসীরা কথোপকথন করিতে থাকে। এই ঘটনা দ্বারা শ্রীমতীর মানের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।—

মুঞ্চময়ি মানমনিদানম্। দেহি পদপল্লবমুদারম্॥

গুণ্ডিচা বাড়ি।

ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরস্তীরে সপ্তাহানি জনার্দ্দন।
তিষ্ঠেৎ পুরা স্বয়ং রাজ্ঞে বরমেতৎ সমাদিশৎ॥

ইন্দ্রদ্যুম্নং প্রতি শ্রীভগবানুবাচ।—

তত্তীর্থ-তীরে রাজেন্দ্র স্থাস্যামি প্রতি বৎসরং।
সর্ব্বতীর্থানি তস্মিংশ্চ স্থাস্যন্তি ময়ি তিষ্ঠতি॥

---

* ভাসুরকে

সপ্তাহঞ্চ প্রপশ্যন্তি গুণ্ডিচা-মণ্ডপস্থিতং।
মাঞ্চ রামং সুভদ্রাঞ্চ মৎসাযুজ্যমবাপ্নুয়াৎ॥
গুণ্ডিকা-মণ্ডপং যান্তং যে পশ্যন্তি জনার্দ্দনং।
রামং কৃষ্ণং সুভদ্রাঞ্চ তে যান্তি ভুবনং হরেঃ॥
(মুক্তিচিন্তামণি)

রথে আরোহণ করিয়া, জগন্নাথ গুণ্ডিচা বাড়ীতে আগমন করেন। এখানে সাত দিন অবস্থান করেন বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে; কিন্তু কার্য্যতঃ নয়দিন দেখিতে পাই। বোধ হয়, পূর্ব্বে রথ একদিনে গুঞ্জাবাড়ি পৌঁছিত না বলিয়া, নয় দিনের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা অতি পুণ্যক্ষেত্র। যেমন জগন্নাথের মন্দিরে ভোগ আদি হইয়া থাকে, এখানেও সেইরূপ হয়। ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রীর নাম গুণ্ডিচা ছিল বলিয়া, ইহার নাম গুঞ্জাবাড়ি হইয়াছে। এখানে জগন্নাথ আসিলে পর, আর জগন্নাথ-মন্দিরে ভোগ হয় না।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর।

ইহা, জগন্নাথ-মন্দির হইতে এক মাইল দূরে গুণ্ডিচা বাড়ীর নিকট অবস্থিত। বহু বৎসর ব্যাপী অশ্বমেধ যজ্ঞকালীন, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণদিগকে কোটী কোটী গাভী দান করিয়াছিলেন। সে সকল গাভী যে স্থানে রাখা হইয়াছিল, তথায় তাহাদের খুরের দ্বারা মৃত্তিকা খনন

হইতে হইতে এক বৃহৎ খাত নির্ম্মিত হয়। পরে গাভী সকল যখন উৎসর্গীকৃত হয়, তখন হস্তচ্যুত সঙ্কল্প জল, সেই খাতে অল্প অল্প করিয়া পড়িয়া, সেই খাত জল পূর্ণ হইয়া এক বৃহৎ সরোবরে পরিণত হয়। ইহার নাম ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর। ইহা দীর্ঘে ৫৮৬ ফিট, প্রস্থে ৩৯৬ ফিট। পৃথিবীতে ইহার ন্যায় পবিত্র তীর্থ আর দ্বিতীয় নাই।

ইন্দ্রদ্যুম্নসরঃ স্নাত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।

এই সরোবরের দক্ষিণ পাড়ের দুই ধারেই মন্দির আছে। ডানধারে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার বাড়ী ছিল। সেই স্থানে বর্ত্তমান সময়ে একটী মন্দির আছে। এই মন্দিরকে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার মন্দির বলিয়া থাকে। এই মন্দিরে নীলকণ্ঠ মহাদেব আছেন, এবং এই মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণে, একটী ছোট মন্দির আছে। সেই মন্দিরের ভিতরে যজ্ঞকুণ্ড ও যজ্ঞমাতা আছেন। বাম ধারে গালমাধব রাজার মন্দির আছে। সেই মন্দিরে সাক্ষিগোপাল আছেন। সেই স্থানে অপর একটী মন্দিরে বাসুদেব আছেন।

এই সরোবরের তীরেই ইন্দ্রদ্যুম্ন মহিষীর একটী মন্দির ও সাক্ষী জগন্নাথের একটী মন্দির আছে। তৎসঙ্গে সাধুর আশ্রম আছে। সেই খানে, এখন একটী রামায়িত সাধু বাস করিতেছেন। ডানধারে একটী মন্দিরে কল্কি অবতারের মূর্ত্তি আছে। সেই মন্দিরের ডান ধারে এবং বাম ধারে ছোট ছোট কয়েকটী মন্দির আছে। পৃথক্ পৃথক্ মন্দিরে পঞ্চ

পাণ্ডব আছেন। বাম ধারে মহাবীর সিংহজীর মন্দির ও নৃসিংহ মহারাজের মন্দির। এই স্থানে গুণ্ডিচা মন্দির। এই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া, পুরী আসিতে বাম ধারে, একটী মন্দির আছে, এবং সেই স্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দশাবতারের মধ্যে কতকগুলি মূর্ত্তি আছে। ১। প্রথম মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা। ২। হনুমানের মন্দির। ৩। বরাহ অবতারের মন্দির। ৪। নৃসিংহ অবতারের মন্দির। ৫। পরশুরামের মন্দির। ৬। মীন অবতারের মন্দির। ৭। বামনাবতারের মন্দির। ৮। রাধাকৃষ্ণের মন্দির।

ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরও, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আর এক লীলাক্ষেত্র। এখানেও সমস্ত ভক্তসহ মিলিত হইয়া, এই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে, সপ্ত দিন আনন্দে বিহ্বল হইয়া স্নানকেলি করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু প্রত্যহ সমুদ্র-স্নান করিয়া, জগন্নাথ দর্শন করিতেন, কিন্তু এই সাত দিন, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরেই স্নান করেন, আর কাশীমিশ্রের বাড়ীতে যান না। দ্বিপ্রহরে জগন্নাথদর্শন শেষ করিয়া, জগন্নাথ-বল্লভ উপবনে প্রসাদ ভক্ষণ করেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ভক্তগণ সমভিব্যাহারে সন্তরণাদি লীলা করিয়া থাকেন,—এই সময়ে, সকলেই আনন্দে বিহ্বল। মহাপ্রভু যে কোন ক্রিয়াই করেন, তাহার ভিতরে বৈদ্যুতিক শক্তির ন্যায় আনন্দের প্রবাহ বর্ত্তমান থাকে। সে প্রবাহেতে পড়িয়া মহাপ্রভু যাকে যে ভাবে নাচান, সে সেই ভাবে নাচে। এখান হইতে মন্দিরে যাইয়া, দর্শন-আনন্দ উপভোগ

করেন। এই সময়ে জগন্নাথ-বল্লভ মঠেও অনেক লীলা হইয়াছিল। এই সাত দিন আনন্দের হাট বসিয়াছিল।

হোরাপঞ্চমী বা লক্ষ্মী-বিজয়।

রথযাত্রার পর পঞ্চমী তিথিতে এই উৎসব হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে লক্ষ্মীদেবীর বিগ্রহ আছে; জগন্নাথ, মন্দির হইতে গুণ্ডিচাতে ব্রজবিহার করিতে গেলে, লক্ষ্মীদেবী, দ্বিতীয়া হইতে পঞ্চমী পর্য্যন্ত, প্রভুর আগমন না হওয়াতে, ক্রোধাবেশে নিজ সখিগণসহ সাজসজ্জা করিয়া, শ্রীমন্দির হইতে গুণ্ডিচা বাড়ীতে গমন করেন। তথায় যাইয়া পাণ্ডাগণকে নানারূপ ভর্ৎসনা করেন, এবং প্রহার ও বন্ধন করেন। পাণ্ডাগণ তিন চারি দিন মধ্যে প্রভুর সহ শ্রীমন্দিরে ফিরিবার অঙ্গীকার করিলে, লক্ষ্মীদেবী তাহাদের বন্ধন মোচনানন্তর প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

গুণ্ডিচা বাড়ীতে শ্রীরাধাসহ প্রভু বিহার করিতেছেন বলিয়া, তাহার মধ্যে লক্ষ্মীদেবী প্রবেশ করেন না। জগন্নাথের সঙ্গে সুভদ্রা আসিয়াছেন বলিয়া, তিনি সুভদ্রার প্রতি কিছু কটূক্তি প্রয়োগ করেন। পাণ্ডাগণ সুভদ্রাকে অর্জ্জুনের স্ত্রী ও প্রভুর ভগ্নী বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু স্কন্দপুরাণান্তর্গত উৎকলখণ্ডে, সুভদ্রা লক্ষ্মীরূপা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। যথা—

যা সা সুভদ্রা নাম্নেয়ং নার্জ্জুনস্য তু কামিনী।
যদঙ্কে লক্ষ্মীরূপেণ ভাতি ভদ্রাঙ্গধারিণী।

বামন-জন্ম।

এই উৎসব ভাদ্রমাসের শুক্লা একাদশীতে সম্পন্ন হয়।

ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন
পদ-নখ-নীর-জনিত-জন-পাবন
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে।

জয়দেব গীত-গোবিন্দে দশাবতারস্তোত্রে শ্রীশ্রীবামন-দেবের পূর্ব্বোক্তরূপ স্তব করিয়াছেন। আমরাও বামনের জন্ম তিথিতে উক্ত স্তব গান করিলাম। এই উৎসবে বিশেষ কোন আড়ম্বর নাই, কেবল জন্ম-তিথিতে পূজা হইয়া থাকে।

বামনের জন্মের প্রধান উদ্দেশ্য দৈত্যপতি বলিকে ছলনা করা। বলি যদিও ভক্ত ছিলেন, ও ভক্ত-প্রহ্লাদের পৌত্র, তথাপি তিনি দৈত্যদলের প্রধান, সুতরাং তাহাদিগের মঙ্গল কামনা করিতেন, এবং অসুরগুরু শুক্রাচার্য্যের পরামর্শে দেবতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেন। সুতরাং, তাঁহাকে নিরস্ত করা দেবতাদের প্রধান স্বার্থ। বলি দেবগণকে পরাভূত করিয়া, ইন্দ্রলোক অধিকার করেন।

দেবতাদের মঙ্গল সাধনের জন্য ভগবান্ বামনরূপে কশ্যপ মুনির গৃহে জন্মিলেন। বলির যজ্ঞে বামনদেব

উপস্থিত হইয়া ত্রিপাদভূমি প্রার্থনা করেন। শুক্রাচার্য্য বলিকে এই দান প্রদান করিতে নিষেধ করেন। বলি ভগবান্ বামনের ছলনা বুঝিতে পারিয়াও, ত্রিপাদভূমি দান করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। বামনদেব দুই পদ দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত জুড়িয়া ফেলিলেন, এবং নাভি হইতে আর এক পদ বাহির করিলেন। সে পদ রাখিবার স্থান নাই। তখন বলি বদ্ধ হইলেন। সেই সময় তাঁহার স্ত্রী বৃন্ধাবলীর পরামর্শে ঐ পদ বলি মস্তকে ধারণ করিলেন। বলির আর সৌভাগ্যের সীমা রহিল না। বৃন্ধাবলী স্তব করিতে লাগিলেন। এই স্তবটি অতি সুমধুর। ইতঃপর ভগবান্ বলিকে পাতালে পাঠাইলেন।

বলির স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবান্ তাঁহার দ্বারে দ্বারী হইয়া রহিলেন, এবং ভক্ত-বৎসল নামের পরিচয় দিলেন।

শয়ন-যাত্রা।

আষাঢ়মাসের শুক্লা একাদশী-তিথিতে, রাত্রে সন্ধ্যা-ধূপের পর, শয়নোৎসব এবং পূজা অনুষ্ঠিত হয়। তৎপর, জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি মূর্ত্তি হস্তিদন্ত পালঙ্কে চারি মাস শয়ন করেন।

শয়নোত্থাপনে কৃষ্ণং যে পশ্যন্তি মনীষিণঃ।
হলায়ুধং শুভদ্রাঞ্চ হরেঃ স্থানং ব্রজন্তি তে॥

দক্ষিণায়ন।

শ্রাবণ সংক্রমণে অর্থাৎ কর্কট-সংক্রান্তি দিবসে, এই যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ধূপভোগ অন্তে দক্ষিণায়নবিধি আরম্ভ হয়, এবং মধ্যাহ্ন ধূপের পূর্ব্বে তাহা শেষ হয়।

উত্তরে দক্ষিণে বিপ্রাস্ত্বয়নে পুরুষোত্তমং।
দৃষ্ট্বা রামং সুভদ্রাঞ্চ বিষ্ণুলোকং ব্রজন্তি তে॥

শ্রাবণমাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই উৎসব হয়। এই উৎসবও বিশেষ ধূমধামের সহিত সম্পন্ন হয়। ফল শ্রুতিও রথের তুল্য।

দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

সুতরাং, ঝুলন, দোল এবং রথ, তিনেই তুল্য মাহাত্ম্য। তান্ত্রিক-মতে এই লীলা, অন্যরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই দেহমধ্যে তিনটি নাড়ী আছে, যথা, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। ইহার মধ্যস্থলে মেরুদণ্ড। এই মেরুদণ্ডের দুই দিকে ইড়া ও পিঙ্গলা। মেরুদণ্ডের সংযোগে এই দুই নাড়ীতে হৃদয়-পদ্মাসনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ঝুলিতেছেন। ইহাকেই ঝুলন কহে। যে ভক্ত, হৃদয়-দোলমঞ্চে বসাইয়া এই ঝুলন, দোলাইতে

পারেন, তিনিই ধন্য। "হৃৎকমল-মঞ্চে দোলে করালবদনা শ্যামা। আমি দেখি, তুমি দেখ, আর যেন কেহ দেখে না।" ভক্ত রামপ্রসাদ এইরূপে দোল করিতেন।

বৃন্দাবনে গোপিনীদের ঝুলন অন্যরূপ। তাঁহারা কেহ রজ্জু হইতেন, কেহ বা উপরে, পার্শ্বস্থ গোপিনীদের মস্তকোপরি, এমন ভাবে নিজকে স্থাপিত রাখিতেন, যেন তাঁহাকে রজ্জু বন্ধন করা যাইতে পারে। ইঁহারা পরস্পর এমন দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ হইতেন, যেন তাঁহাদের দ্বারা সুন্দর একটি দোলা গঠিত হইয়াছে। এই দোলা তমাল বৃক্ষে ঝুলাইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে তাহার ভিতর বসাইয়া, গোপিনীরা তাঁহাকে দোলাইতেন এবং প্রাণের সাধ মিটাইতেন। গোপিনীরা এইরূপ অনেক লীলা করিতেন,—নব-নারী-কুঞ্জর বা হাতি হইয়া, শ্রীকৃষ্ণকে পিঠে বসাইয়া, তাঁহাদের হৃদয়-রঞ্জনের তৃপ্তি করিতেন। এইরূপে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া, তাঁহারা প্রাণারাম শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতেন। গোপিনীরা রথও করিতেন। তাহাতেও তাঁহারা এইরূপ পরস্পর মিলিত হইয়া, রথ গঠন করিতেন। এই রথে শ্রীকৃষ্ণকে বসাইয়া সখীরা রথ টানিতেন। এইরূপ প্রাণের পূজা, কখন, কেহ করে নাই।

শ্রাবণে শুক্লপক্ষেতু একাদশ্যাদিপঞ্চকে।
হিন্দোলোৎসবনং কার্য্যং চতুর্ব্বর্গমভীপ্সুনা॥

ইয়ংলীলা ভগবতঃ পিতামহ-মুখেরিতা।
রাজর্ষিণেন্দ্রদ্যুম্নেন কারিতা পূর্ব্বমেব হি॥
শ্রাবণে মাসি কুর্ব্বীত দোলারোহণমুত্তমম্।
যত্র ক্রীড়তি গোবিন্দো লোকানুগ্রহণায় বৈ॥
হিন্দোলনং প্রকুর্ব্বীত পঞ্চাহানি ত্র্যহাণিবা।

পুরীতে অনেক মঠেই ঝুলন হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে ইঁমার মঠ, উড়িয়া মঠ, উত্তর মঠ, দক্ষিণ মঠ এবং সার্ব্বভৌমের বাড়িতে, যে ঝুলন হয়, তাহাও বেশ সুন্দর। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে, যেখানে মুক্তিমণ্ডপ, সে স্থানে ঝুলন হইয়া থাকে। মন্দিরের সাজসজ্জাও বেশ ভাল হয়।

পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন যাত্রা।

ভাদ্রমাসে শুক্লা একাদশীতে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন যাত্রা হয়। সন্ধ্যা-ধূপের শেষে, এই যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

ইহাতে নানাবিধ নৈবেদ্য অর্পিত হয়। শয়ন-প্রতিমার নিকটে, অগ্নিশর্ম্মা মুদিরথ পাণ্ডা উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিবার পরে, প্রতিমার পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করেন। এই তিথিতে জগন্নাথ-দর্শনে বিশেষ পুণ্যশ্রুতি আছে।

জন্মাষ্টমী।

ইহা ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়। এই সময়ে নন্দোৎসব হয়। এইটিও মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত

বলিয়া বোধ হয়। খুটিয়ারা নন্দ মহারাজা হন, এই উৎসবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিশেষ উৎসব এবং কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এখন সেরূপ হয়না।

অৰ্দ্ধরাত্রে তু রোহিণ্যাং যদা কৃষ্ণাষ্টমী ভবেৎ
তস্যামভ্যর্চ্চনং শৌরের্হন্তি পাপং ত্রিজন্মজম্।
সোপবাসোহরেঃপূজাং কৃত্বা তত্র ন সীদতি ॥

নাটমন্দিরের ভিতরে এই উৎসব হইয়া থাকে। গরুড়-স্তম্ভের নিকট বালরূপী শ্রীকৃষ্ণ ঝুলিতে থাকেন। জন্মাষ্টমীর দিন পুরীতে সকলেই উপবাস করিয়া থাকে, পর দিন নন্দোৎসব হয়, খুটিয়ারা দধির ভার স্কন্ধে লইয়া, "নে দই, নে দই", বলিয়া ডাকিতে থাকে। এখন পর্য্যন্তও ইহা হইয়া থাকে। মহাপ্রভুর সময়ে, নন্দোৎসব, বিশেষ আড়ম্বরের সহিত হইত, মহাপ্রভু নন্দের ভাবে বিভোর হইতেন। পুরীতে সমবেত সকলেই এই ভাবে বিভোর হইতেন। কানাই খুটিয়া নন্দ হইতেন, জগন্নাথ মাহতী যশোদা সাজিতেন। মহাপ্রভু স্বয়ং এবং নবদ্বীপের ভক্তগণ, প্রতাপরুদ্র, কাশীমিশ্র, সর্ব্বভৌম, রামরায় প্রভৃতি সকলেই, আত্মবিস্মৃত হইয়া, আনন্দসাগরে ভাসিতেন, সকলের স্কন্ধে দধির ভার। এই গোপভাবে কতকক্ষণ থাকিলে, মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-ভাব আসিত। তিনি খুটিয়াদিগকে প্রণাম করিতেন, খুটিয়ারা নন্দ-যশোদার ভাবে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

কানাই জগন্নাথ দুইজন
আবেশে বিলান
ঘরে ছিল যতধন।

উত্থাপন।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী দিবস, প্রথম ধূপের শেষে উথাপন-যাত্রা নির্ব্বাহ হয়। পূজার্চ্চনার পর, প্রভু-জগন্নাথের শয্যোত্থান হয়। এই তিথিতে দর্শন করিলে বৈকুণ্ঠে গমন হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

রাসযাত্রা।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে রাত্রিকালে রাসযাত্রা সম্পন্ন হয় ইহার বিস্তারিত বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

পার্ব্বণ।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠী তিথিতে প্রাতঃকালীন ভোগের পর, জগন্নাথদেবকে নূতন পট্টবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়। দেবগণকে বস্ত্রদ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবৃত করা হয় বলিয়া, ইহার নাম পার্ব্বণযাত্রা।

পুষ্যপূজা।

পৌষী পূর্ণিমায় প্রাভাতিক ধূপের পরে, এই যাত্রার পূজা ও অভিষেক হয়, এবং দেবত্রয়কে রাজবেশে সজ্জিত করা হয়।

উত্তরায়ণ সংক্রান্তি (মকর-সংক্রান্তি)।

এই যাত্রা মাঘ মাসের সংক্রান্তিদিনে অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে, তণ্ডুল প্রভৃতি পূজোপকরণ দ্রব্য, মন্দিরে আনিয়া রাখা হয়। উক্ত দিবস মধ্যাহ্ন পূজার পর, দেবতাগণের শ্রীঅঙ্গ হইতে মাল্য আনিয়া, সেই মাল্যকে বস্ত্রাদি দ্বারা শোভিত করিয়া, বাদ্য সহকারে মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে নয়বার প্রদক্ষিণ করান হয়। পরদিবস মধ্যাহ্ন পূজার পর, উক্ত যাত্রা করা হয়। পূর্ব্বদিবস আনীত তণ্ডুল জলে ধৌত করিয়া, সর প্রভৃতি নানাবিধ পদার্থ তাহার সহিত সংযোগ করাইয়া, এই তণ্ডুল ও নানাবিধ ঘৃতপক্ক পিষ্টক প্রভৃতি মন্দিরের অন্তর্বেষ্টনে, প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে আশী বার প্রদক্ষিণ করান হয়, পরে প্রভুর নিকটে আসিয়া ভোগ দেওয়া হয়। এই তণ্ডুলকে সাধারণে মকরচাউল বলে।

দোলযাত্রা।

এই যাত্রা ফাল্গুন মাসের দশমী তিথিতে আরম্ভ হয়, পুর্ণিমা তিথিতে ইহার পরিসমাপ্তি। প্রতি দিবস সন্ধ্যা-ধূপের পর, লোকনাথ, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেশ্বর, নীলকণ্ঠ এবং কপাল-মোচন পঞ্চ বিমানে (দোলায়) এবং গোবিন্দজী, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর সহিত, মণিখচিত বিমানে আরোহণ করতঃ মন্দির হইতে বাহির হইয়া, নানাবিধ বাদ্যোত্তম সহকারে, জগন্নাথ-বল্লভ নামক মঠের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া, পুনরায়

মন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পূর্ণিমা দিবস প্রাতঃকালে গোবিন্দদেব, শ্রী ও ধরাদেবীর সহিত মণি-বিমানারোহণ করতঃ, মন্দিরের ঈশান-কোণস্থিত প্রস্তর-নির্ম্মিত সুবিস্তৃত উচ্চ দোলমঞ্চোপরি আরোহণ ও হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত আসনে উপবেশন করেন। সেবাইতগণ ঐ আসন সুদৃঢ় রজ্জুদ্বারা মঞ্চোপরি ঝুলাইয়া দেন। তৎপর ভক্তগণ যথেচ্ছরূপে ভগবান্‌কে ফল্গু (আবীর) প্রদান করিয়া বিষ্ণু-খট্টায় ঝুলাইয়া, ভক্তিভাবে দর্শন করতঃ মানব-জীবন সার্থক করেন। ভগবান্ এইভাবে সহস্র সহস্র ভক্তের ফল্গুরাগে রঞ্জিত ও নানাবিধ ফলপুষ্প দ্বারা সুশোভিত হইয়া, প্রায় সমস্ত দিন তথায় অবস্থান করেন। রাত্রিতে পুনরায় মণিবিমানে আরোহণ করতঃ মন্দিরে প্রত্যাগমন করেন। প্রভুর মন্দিরে যে প্রকারের ভোগ দেওয়া হয়, এই দিন সেই প্রকার ভোগ দেওয়া হয় না, কেবল লাজ (খৈ) বাতাসা প্রভৃতি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। মন্দিরে বিগ্রহের সেবা অন্যান্য দিনের ন্যায়ই হইয়া থাকে।

দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং
রথস্থং বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥

এই বিশ্বাসে ভক্তগণ চতুর্দ্দিক হইতে আসিয়া, প্রাণের দেবতাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়েন। যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া, সুদূর কাশী, গয়া, বঙ্গ, বিহার হইতে শত শত দরিদ্র

ভক্ত গঙ্গাজল স্কন্ধে করিয়া প্রাণের আবেগে আসিয়া ভগবানকে ঐ জল প্রদান করিয়া কৃতার্থ হয়েন। দোল-যাত্রার সময়, বহু সংখ্যক হিন্দুস্থানী যাত্রিক আগমন করেন, এবং রথযাত্রার সময়ে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী আগমন করেন। বাঙ্গালী মহিলাগণের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, দোলযাত্রার দিবস মধুসূদনকে দর্শনে সপ্তজন্ম বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, বহুসংখ্যক স্ত্রীলোক ঠাকুর দর্শনে আসেন।

দমনক-মহোৎসব।

এই যাত্রা চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে সম্পন্ন হয়। এই দিবস প্রভুকে "দমনক বা দয়না মঞ্জরী" অর্পণ করা হয়। এইরূপ অশোকাষ্টমী, রামনবমী, বাসন্তী-পঞ্চমী, ভীম-একাদশী, কপিলা-মাতা, বিজয়া-দশমী, ও কুমারাষ্টমী প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত যত যাত্রা আছে, সমস্তই এইখানে সম্পন্ন হয়। কোনও উৎসব শ্রীমন্দিরে, কোনটি বা জগন্নাথ-বল্লভ-মঠে অনুষ্ঠিত হয়।

এই দোল-পূর্ণিমা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মতিথি। নবদ্বীপে এই সময় খুব আমোদ হইয়া থাকে, বৃন্দাবনেও এই উপলক্ষে বিশেষ ধুম হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে দোলের অনুরূপ একটী উৎসব করিয়াছিলেন, তাহার নাম ধূলট। দোলে যেমন আবীর দেওয়া হয়, এই উপলক্ষে সেইরূপ ধূলা

দেওয়া হয়—এই জন্যই এই উৎসবের নাম ধুলট। এই সময়ে নবদ্বীপে পনর দিন কীর্ত্তন হইয়া থাকে। বৃন্দাবনে সখীরা যেরূপ দোল করিতেন, মহাপ্রভুও, তাঁহার শিষ্যগণ লইয়া, সেই ভাবে বিভোর হইতেন—কখনও আবীর, কখনও ধূলা, যে যাঁহাকে পারিতেন, তাঁহার চক্ষে নিক্ষেপ করিতেন। এইরূপে মহাপ্রভু দোল-উৎসব শেষ করিতেন।

পুরীধামের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহ।

জগন্নাথদেবের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যাত্রা সমূহের বিষয় অনুসন্ধানে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহা বিবৃত করিয়াছি। এখন প্রসিদ্ধ স্থানগুলি সম্বন্ধে যাহা অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, তাহা বিস্তারিত লিখিতে গেলে, গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি হয় এবং পাঠকদেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়া, কেবল বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান গুলিরই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

জগন্নাথ-বল্লভ মঠ।

এই মঠ জগন্নাথের লীলাক্ষেত্র এবং এই স্থানে অনেক উৎসব হয়। ইহা একটী প্রকাণ্ড বাগান। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের চলন্ত বিগ্রহগণ, অনেক পর্ব্বোপলক্ষে, এই স্থানে আসিয়া উৎসব করতঃ, পুনরায় শ্রীমন্দিরে গমন করেন। ইহা বড় রাস্তা হইতে নরেন্দ্র সরোবর পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব পশ্চিমে

বিস্তৃত, এবং উত্তর দক্ষিণে প্রায় সিকি মাইল লম্বা হইবে। এখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবী, এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই বাগান, মাঝে মাঝে কতকগুলি সুরম্য সরোবর ও নানা প্রকারের বৃক্ষ-লতাদি দ্বারা পরিশোভিত। যথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রফুল্লিত বৃক্ষ বল্লী যেন বৃন্দাবন।
শুক সারী পিক ভৃঙ্গ করে আলাপন॥
পুষ্পগন্ধে লইয়া চলে মলয় পবন।
গুরু হইয়া তরুলতা শিখায় নাচন॥
পূর্ণচন্দ্র-চন্দ্রিকায় পরম উজ্জ্বল।
তরুলতা জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল॥
ছয় ঋতুগণ যাঁহা বসন্ত প্রধান।
দেখি আনন্দিত হইলা গৌর ভগবান্॥

এই স্থানেই, তিনি শ্রীমতীভাবে বিভাবিত হইয়া, মনের উল্লাসে স্বরূপকে জয়দেবের এই অমৃতময় পদটী গাহিতে বলিয়াছিলেন।

ললিত-লবঙ্গ-লতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে।
মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত-কুঞ্জ-কুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরস-বসন্তে
নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥ধ্রু॥

উন্মদ-মদন-মনোরথ-পথিক-বধূজন-জনিত-বিলাপে।
অলিকুল-সঙ্কুল-কুসুম-সমূহ-নিরাকুল-বকুল-কলাপে॥
মৃগমদ-সৌরভ-রভস-বশম্বদ-নবদলমাল-তমালে।
যুবজন-হৃদয়-বিদারণ-মনসিজ-নখরুচি-কিংশুক-জালে॥
মদন-মহীপতি-কনক-দণ্ডরুচি-কেশর-কুসুম-বিকাশে।
মিলিত-শিলীমুখ-পাটলি-পটলকৃত-স্মরতূণ-বিলাসে॥
বিগলিত-লজ্জিত-জগদবলোকন-তরুণ-করুণ-কৃতহাসে।
বিরহি-নিকৃন্তন-কুন্তমুখাকৃতি-কেতকি-দন্তুরিতাশে॥
মাধবিকা-পরিমল-ললিতে নব-মালতি-জাতি-সুগন্ধৌ।
মুনি-মনসামপি মোহনকারিণি তরুণাকারণ-বন্ধৌ
স্ফুরদতিমুক্তলতা-পরিরম্ভণ-মুকুলিত-পুলকিত-চূতে।
বৃন্দাবন-বিপিনে পরিসর-পরিগত-যমুনাজলপূতে॥
শ্রীজয়দেব-ভণিতমিদমুদয়তু হরিচরণস্মৃতিসারম্।
সরস-বসন্ত-সময়-বনবর্ণন-মনুগত-মদন-বিকারম্॥

পুরীধামের কোন রাজা ভ্রমক্রমে বামহস্তে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, নিজকে অপরাধী বলিয়া মনে করেন, এবং বামহস্ত কর্ত্তনকরতঃ প্রায়শ্চিত্ত করেন। ভগবানের কৃপায় কর্ত্তিত হস্ত দোনা আকৃতি পত্রযুক্ত এক বৃক্ষরূপে ঐ বাগানে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহাকে দোনা গাছ বলিয়া থাকে। উত্তর দিকে যে

পুকুরটী আছে, তাহার নিকটে ইহা সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। এই বৃক্ষটী বেশী বড় নয়। প্রবাদ আছে যে, স্নানাদি করিয়া পবিত্র শরীরে দর্শন না করিলে, গাছটী মরিয়া যাইবে। সেইজন্য সর্ব্বসাধারণকে উহা দেখিতে দেওয়া হয় না।

এই বাগানে, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার ভক্তগণসহ অনেক লীলা করিয়া গিয়াছেন। এইস্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রধান অন্তরঙ্গ, ভক্ত, মাহাত্মা রামরায় অবস্থান করিতেন। মহাত্মা রামরায় জগন্নাথবল্লভ নামক নাটক অভিনয় করার জন্য দেবদাসীদিগকে এইখানে নিজে শিক্ষা দিতেন। এই বাগানে একটী তমালবৃক্ষ দেখিয়া, শ্রীরাধার ভাবে বিভোর হইয়া, মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ ভাব হইয়াছিল, এবং তিনি সেই বৃক্ষে কৃষ্ণদর্শন করিয়া, তাহাতে আরোহণ করিতে গিয়াছিলেন।

সিদ্ধবকুল ও হরিদাস।

জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারের দক্ষিণ দিক দিয়া, স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত যে সোজা রাস্তাটী গিয়াছে, ঐ রাস্তার কিছু দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইলে, প্রথমে রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একটী মঠ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নাম "রাজগোপাল মঠ"। সেই মঠে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর সেবার বন্দোবস্ত আছে। উহা ছাড়িয়া ক্রমশঃ

সিদ্ধ বকুল

U. RAY & SONS.

দক্ষিণদিকে গেলে, বামদিকে "বাউ মঠ লেন" নামক একটী রাস্তা আছে, ঐ রাস্তায় কতকদূর অগ্রসর হইলেই, দক্ষিণে সিদ্ধবকুল-মঠ দৃষ্টিগোচর হয়। এইটী কাশী-মিশ্রের বাগানবাটী ছিল। এই স্থানে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব, পরম ভক্ত হরিদাসকে নিয়া, অনেক লীলা করিয়াছিলেন। একদিন মহাপ্রভু কাশীমিশ্রকে বলিলেন—"আমার বাসার নিকট পুষ্পোদ্যানে তোমার একখানা ঘর আছে, ওখানি আমাকে ভিক্ষা দাও।" মিশ্র বলিলেন—"ঘর কি ছার বস্তু, আমরা আপনার, যাহা ইচ্ছা গ্রহণ করুন।"

মহাপ্রভু তখন নিশ্চিন্ত হইয়া, হরিদাসকে অভ্যর্থনা করিতে গমন করিলেন। বাসা হইতে বহুদূরে যাইয়া দেখেন, হরিদাস রাজপথের এক পার্শ্বে বসিয়া নামকীর্ত্তন করিতেছেন। প্রভুকে দর্শন করিয়া, হরিদাস চরণে পতিত হইলেন, এবং পদধূলি গ্রহণ করিয়াই, পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত, দুই হস্ত বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। হরিদাস বলিলেন, "প্রভো আমি অস্পৃশ্য পামর, আমাকে স্পর্শ করিবেন না।" মহাপ্রভু বলিলেন, "হরিদাস আমি পবিত্র হইবার জন্য, তোমাকে স্পর্শ করিতে বাঞ্ছা করিতেছি।" যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ-তপোদান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ জ্ঞানী হতে তুমি পরম পাবন॥

মহাপ্রভু হরিদাসকে হৃদয়ে ধরিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। ভক্ত ও প্রভু উভয়ে নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। ভক্ত, যোগীন্দ্র, মুণীন্দ্রগণের ধ্যানের বস্তু হৃদয়ে ধরিয়া, আপনাকে কৃতার্থ ও ভগবানের অনির্ব্বচনীয় দয়ার পাত্র মনে করিয়া, প্রেমাশ্রুতে স্নাত হইতে লাগিলেন; প্রভুও ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া ভক্তকে হৃদয়ে লইয়া আনন্দে বিভোর হইলেন। এই ভাবে কিছুকাল অতীত হইলে, প্রভু হরিদাসকে লইয়া গিয়া, কাশীমিশ্রের পুষ্পোদ্যানস্থ সেই ভিক্ষালব্ধ ঘরে তাঁহাকে বাসস্থান দিলেন। হরিদাসকে বলিলেন, "তুমি এই স্থানে থাকিয়া নাম কীর্ত্তন কর, আমি প্রত্যহ আসিয়া তোমার সহিত মিলিব।"

হরিদাস প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। তিনি দীনতার আদর্শ ছিলেন,—শ্রীমন্দিরের নিকটেও যাইতেন না, পাছে পাণ্ডারা তাঁহার অঙ্গস্পর্শে অশুচি হয়েন, এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবার বিঘ্ন হয়। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

হরিদাস কহে মুঞি নীচজাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার॥
নিভৃত টোটার মধ্যে কিছু স্থান পাও।
তাহা পরিহরি মুঞি এ কাল গোঙাও॥

হরিদাসের দীনতায় মহাপ্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন। হরিদাস দৈন্যের আদর্শ, কাযেই তিনি হরিনাম গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। এই স্থানেই শেষ জীবন পর্য্যন্ত হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে মহাত্মা হরিদাস দেহ রাখেন। হরিদাসের জীবনীর একটু আলোচনা হওয়া উচিত।

পরমভক্ত হরিদাস, বয়সের আধিক্য প্রযুক্ত, সংখ্যানাম কীর্ত্তনে অপারগ হইয়া, ও মহাপ্রভু অন্তর্দ্ধান করিবেন জানিতে পারিয়া, প্রভুর পূর্ব্বেই দেহ রাখিবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের বাঞ্ছাপূর্ণ করিবেন, তাহাতে সংশয় নাই; তথাপি বলিলেন, "হরিদাস, তোমার আর নাম কীর্ত্তন করিবার আবশ্যক নাই। মানুষ ততক্ষণ পর্য্যন্ত ডাকে, যতক্ষণ না অভিলষিত বস্তু উপস্থিত হয়। তুমি যাঁহার নাম করিবে, তিনি সর্ব্বদা তোমার নিকট বিরাজ করিতেছেন, অতএব, আর নামের প্রয়োজন কি?" তিনি আরও বলিলেন, হরিদাস তুমি গেলে আমি কাহাকে লইয়া থাকিব? তুমিই আমার সংসার।"

এইরূপ বাক্যালাপের অল্পদিন পরেই, মহাপ্রভু একদিন

যাইয়া দেখেন, হরিদাস জ্বরাক্রান্ত হইয়া শয্যায় শায়িত, উত্থান-শক্তি নাই। তিনি অতি কষ্টে প্রভুর চরণধূলি গ্রহণ করিলেন। পরদিবস শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব সমস্ত ভক্তগণসহ প্রত্যূষে যাইয়া হরিদাসের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন; এবং হরিদাসকে ঘিরিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। কতক সময় কীর্ত্তনের পর, মহাপ্রভু হরিদাসের নিকটস্থ হইলে, তিনি প্রভুর নয়নে নয়ন মিশাইয়া স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। সকলে দেখিতেছে হরিদাস প্রভুর দিকে তাকাইয়া আছে; কিন্তু হরিদাসের প্রাণবায়ু প্রভুর নয়নে মিশিয়া দেহে প্রবেশ করিয়াছে। ভক্তগণ হরিদাসের দেহ সমাধিস্থ করিবার নিমিত্ত, মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সমুদ্রতীরে চলিলেন। প্রভুর আজ্ঞায় গর্ত্ত খোদিত হইলে, প্রভু ভক্ত-ঋণ শোধিতে ও ভক্তের মহিমা বাড়াইতে, হরিদাসের মৃতদেহ স্কন্ধেতে লইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দক্ষযজ্ঞে দাক্ষায়ণী পতি-নিন্দায় প্রাণত্যাগ করিলে, শূলপাণি যেরূপ সতীর দেহ স্কন্ধে নিয়া চলিয়াছিলেন, এখনও সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ নৃত্যের পর, নিজ হস্তে হরিদাসের দেহ সমাধিস্থ করিয়া, বালুকা দ্বারা আবৃত করিলেন। তৎপর বিরস-বদনে সমুদ্র-স্নান করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। হরিদাসের শ্রাদ্ধের দিবস, প্রভু নিজে ভিক্ষা করিয়া মহোৎসব করেন।

কেহ কেহ বলেন, হরিদাস ব্রাহ্মণ-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া

বাল্যে মুসলমান কর্ত্তৃক পালিত হয়েন। কিন্তু ব্রহ্মণ্য-শক্তির কি অসাধারণ ক্ষমতা! জ্ঞান হওয়ার পর হইতেই, তাঁহার সেই লুপ্ত ব্রহ্মশক্তি জাগ্রত হইল। ভক্তির শক্তি তাঁহাকে পরশমণি করিয়া তুলিয়াছিল, এই হরিদাসকেই মহাপ্রভু ব্রহ্মার অবতার বলিয়া গিয়াছেন। হরিদাসের ভিতর দিয়া মহাপ্রভু নামের শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেবল নাম জপিয়াই যে, মানুষ কৃতার্থ হইতে পারে, হরিদাস তাহাই দেখাইয়াছেন। নামের সহিত বিশ্বাসের যোগ হইলে যে, কি অপূর্ব্ব শক্তির বিকাশ হয়, তাহা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। তাহা বুঝাইবার জন্যই, যেন হরিদাস অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শাস্ত্র বলেন, "অভেদো নাম-নামিনোঃ।"—"নামের ভিতরে আছেন আপনি শ্রীহরি।" পূর্ব্বে প্রহ্লাদ হরিনামে জীবন পাইয়াছিল, এবার হরিদাস পুনঃ জীবন লাভ করিলেন। হরিদাস বলেন, "নাম দ্বারা কেবল পাপ-খণ্ডন হয় তাহা নহে, ইহা প্রেমও আনিয়া দেয়।" এই কথা নিয়া এক ব্রাহ্মণের সহিত হরিদাসের তর্ক উপস্থিত হয়। সেই ব্রাহ্মণ নাম-মাহাত্ম্য অস্বীকার করায়, তাঁহাকে হরিদাস শাপ দেন যে, যদি হরিনাম-মাহাত্ম্য সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার তিনদিনের মধ্যে কুষ্ঠ হইবে। তাহাই হইল। পাঠক এখন দেখুন, নামের শক্তি কতদূর। হরিনামের শক্তিতেই, একদিন হরিদাস কাজীকে বলিয়াছিলেন—

খণ্ড খণ্ড কর দেহ যদি যায় প্রাণ।
তবু না বদনে আমি ছাড়ি হরি নাম ॥

হরিনাম ছাড়িবার জন্য কাজীর আদেশে প্রহরীরা বাইশ বাজারে ঘুরাইয়া হরিদাসকে বেত্রাঘাত করিতেছে। হরিদাসের শরীর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে—কিন্তু হরিদাস কি করিতেছেন? করযোড়ে নয়নজলে ভাসিয়া, হরিদাস কেবলই বলিতেছেন, "হে শ্রীহরি, ইহাদের দোষ গ্রহণ করিও না, ইহারা অজ্ঞান।" প্রহরিগণ হরিদাসের দেহে আঘাত করিতে করিতে যখন দেখিল, প্রাণের আর কোনও চিহ্ন নাই, তখন তাহারা তাঁহাকে নদীতে নিক্ষেপ করিল। যিনি হরিনাম-সুধা পান করেন, তাঁহার কি মৃত্যু আছে? তিনি অমরত্ব লাভ করেন। মহাপ্রভু, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও—তোমার বড় সাধের হরিনাম যায় যায় হইয়াছে, তোমার কৃপা বিনা বুঝি আর থাকে না। হরিদাস এতক্ষণ হরিনাম-রস-মদিরা-পানে বিভোর হইয়া সংজ্ঞাশূন্য ছিলেন, এখন সুরধনীর পবিত্র বারিসংস্পর্শে চৈতন্য পাইলেন। মুসলমানগণ হরিনামের শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, এবং হরিদাসকে সাধুজ্ঞানে ভক্তি করিতে লাগিলেন। কতকদিন পরে, হরিদাস যখন শুনিলেন, শান্তিপুরে পরমভাগবত শ্রীঅদ্বৈত প্রভু হরিনাম সাধন করেন, তখনই তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেন, এবং মহানন্দে দৈনিক তিন লক্ষ নামজপ করিতে লাগিলেন।

অদ্বৈত প্রভু ভক্তের মহিমা বাড়াইবার নিমিত্ত ও হরিনামের মহিমা প্রচার করিবার জন্য, নিজ পিতৃশ্রাদ্ধের অন্ন হরিদাসকে প্রদান করিয়াছিলেন। এইরূপে কতকদিন শান্তিপুরে থাকিয়া, মহাপ্রভুর প্রকাশ হইবার সময়, তথায় যা ইয়া মিলিলেন

এই স্থানকে সিদ্ধ-বকুল বলা হয় কেন, তাহাও উল্লেখ-যোগ্য বোধে লিখা হইল। এই স্থানে হরিদাস সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া, ইহার নাম "সিদ্ধ-বকুল"। এই বকুল গাছটী সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, মহাপ্রভু এক দিবস দাঁতন হস্তে এই স্থানে আসিয়া, হরিদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হরিদাস, তোমার এই স্থানে রৌদ্রে কষ্ট হয়, এই বলিয়াই হস্তস্থিত দন্তকাষ্ঠ তথায় রোপণ করিলেন। প্রভুর কৃপায় অল্পদিনে বকুল ডাল অঙ্কুরিত হইয়া, ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল, এবং কালক্রমে প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইল। এই স্থানের রাজা কোন কারণে এই বৃক্ষটী কাটিবার আদেশ করেন, কিন্তু কর্ম্মচারিগণ এই বৃক্ষ কাটিতে আপত্তি করিয়া-ছিলেন। রাজা বলিলেন, যদি ঐ বকুল গাছের কোন মাহাত্ম্য থাকে, তাহা হইলে কোনও আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিবে, নচেৎ আগামী কল্য এই গাছ কাটিয়া ফেলা হইবে, এই বলিয়া, সে দিন গাছটী কাটা ক্ষান্ত রাখিলেন। পরদিবস দেখা গেল বৃক্ষটীর মধ্যস্থলে ভাঙ্গিয়া কতকটা মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, এবং গাছটীর সারভাগ সমস্ত অন্তর্হিত

হইয়া কেবল বল্কলটী মাত্র অবশিষ্ট আছে। কেবল স্থূল ভাগের নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলিরও ভিতর শূন্য, বাহিরে বল্কলাবরণে আবৃত। বৃক্ষটীর এই অবস্থা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, সেইস্থানে মহাপ্রভুর সেবা স্থাপন করেন। বৃক্ষটী অদ্যাবধি সেই ভাবেই থাকিয়া, ভক্ত হরিদাসের ন্যায় মস্তক অবনত করিয়া, হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছে। হরিদাস বাক্যে বলিতেন, আমি অপদার্থ অকর্ম্মণ্য—বৃক্ষটী হৃদয় খুলিয়া জীবকে দেখাইতেছে, যে ভাইরে, এই ভাবে নিজেকে অপদার্থ অকর্ম্মণ্য ভাব, এবং হৃদয়ের অহঙ্কার, যাহা সার ভাবিতেছ, তাহা দূরে ফেলিয়া দাও, এবং আমি যেমন মস্তক অবনত করিয়া আছি, এইরূপ মাথাটী নীচু করিয়া হরিনাম কর। এই স্থানে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেব এবং রাধাকৃষ্ণের সেবা আছে। হরিদাসের একটী প্রতিমূর্ত্তি এইখানে আছে।

হরিদাস শান্তিপুরের নিকট বুডন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবধিই তিনি হরিনামে অনুরক্ত হন। হরিদাসের বাল্যজীবনের আর একটী উপাখ্যান আছে। তাহাও নাম-মাহাত্ম্য প্রচার করিবে, সুতরাং তাহা উল্লেখ-যোগ্য। কাজী যখন দেখিল, হরিদাস পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন, তাহাতে বিস্ময়াবিষ্ট ও ঈর্ষান্বিত হইয়া, তাঁহাকে অধঃপাতিত করিবার জন্য, এক রূপ-যৌবন-সম্পন্না বেশ্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইল। বেশ্যা তাহার মোহিনী শক্তি

বিকাশ করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং অবশেষে তাহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল। হরিদাস উপেক্ষা না করিয়া তাহাকে বলিলেন, "তুমি উপবেশন কর, আমার নাম-জপ শেষ হইলে, তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" এইরূপে প্রথম দিন গেল, দ্বিতীয় দিন গেল—তৃতীয় দিনে নামের শক্তি বেশ্যাতে সংক্রামিত হইল। তখন সে হরিদাসের পদতলে পড়িয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল ও তাঁহার শরণাপন্ন হইল। অবশেষে, হরিদাসের উপদেশে বৈষ্ণব হইল।

রাধাকান্ত-মঠ।

এই মঠ সিদ্ধবকুলের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বারের নিকট হইতে, দক্ষিণ দিকে স্বর্গদ্বার পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তায় শ্বেত-গঙ্গা ছাড়িয়া, দক্ষিণ দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলেই, বাম পার্শ্বে যে সিংহদ্বার-যুক্ত মঠ দেখা যায়, উহাই রাধাকান্ত-মঠ নামে বিখ্যাত। এই স্থানে পূর্ব্বে রাজা প্রতাপ-রুদ্রের গুরুদেব কাশীমিশ্রের বাড়ী ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব পুরীধামে আসিয়া, কতক দিবস, সার্ব্বভৌমের বাড়ীতে ছিলেন; পরে রাজার আদেশমত এই স্থান মহাপ্রভুর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। এই স্থানে তিনি ভক্ত সঙ্গে কীর্ত্তনানন্দ উপভোগ করিতেন। যে স্থানে তিনি থাকিতেন, তাহার নাম "গম্ভীরা"। ইহা

অদ্যাবধি বর্ত্তমান আছে, এবং প্রভুর কন্থা, কমণ্ডলু ও পাদুকাও এইখানে বর্ত্তমান আছে। এইগুলি মহাপ্রভুর এখানকার লীলার পূর্ব্বস্মৃতি জাগ্রত করিয়া দেয়। এই স্থানে মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের একটী চিত্রপট আছে, তাহা দেখিলেই বুঝা" যায় যে, মহাপ্রভু ভক্ত সঙ্গে কিরূপ কীর্ত্তনানন্দে কাল কাটাইতেন। মহাপ্রভু এই গম্ভীরাতে যে, কি প্রকার আনন্দ অনুভব করিতেন, এবং কি ভাবে এইখানে কাটাইয়াছিলেন, তাহার কতক উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

পাণি-শঙ্খ বাজাইলে উঠেন সেইক্ষণ।
কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন॥
জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম।
অবোধ্য অদ্ভুত প্রেম নদী বহে যেন॥
দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক।
কার দেহে আর নাহি রহে দুঃখ শোক॥
যে দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি যায়।
সেই দিকে সর্ব্বলোক হরি হরি গায়॥

(চৈতন্য ভাগবত)

কপাট খুলিলে প্রভু তাহার নয়ন।
শ্রীজগন্নাথের বদনে করেন অর্পণ॥

প্রভুর নেত্র হইতে অমিয়-ধারা বিগলিত হইতে থাকে, প্রভুর নয়নে পলক নাই, আঁখি রক্তবর্ণ হইয়াছে,—নয়ন-তারা

ডুবিয়া গিয়াছে। প্রভুর নেত্র হইতে দর-বিগলিত ধারা মৃত্তিকায় পড়িতেছে ও তাহাতে একটী স্রোত হইয়া সেখানে একটী গর্ত্ত হইতেছে। প্রভু এইরূপে দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেছেন—আর শত শত লোকে প্রভুকে দর্শন করিতেছেন। পর পর নূতন ভাব উদয় হওয়াতে, প্রভু নব নব রূপ ধারণ করিতেছেন। সেই সমুদায়ই তুল্যরূপে মনোহর। প্রভুর বাহ্য-জ্ঞান নাই—স্বরূপ, কি গোবিন্দ, কোনক্রমে তাঁহাকে বাসায় আনেন। সেখানে আসিয়া প্রভু সমুদ্রস্নানে গমন করেন। স্নান করিয়া আসিয়া, ঘরের পিড়ায় সংখ্যা মালা জপ করিতে লাগিলেন।

প্রভুর মালা লইয়া জপ করা এক প্রকার বিড়ম্বনা, যেহেতু, তিনি দিবানিশিই শ্রীবদনে হরে, কৃষ্ণ, নাম জপ করিতেন। প্রভু যখন জপ করিতেন, তখন, ভাণ্ডে করিয়া একটী তুলসী গাছ সম্মুখে রাখিতেন। প্রভুর মালা লইয়া জপ কেবল লোক শিক্ষার নিমিত্ত। তিনি যাহা করিবেন, জীবে তাহাই করিবে, সেই নিমিত্ত তাঁহাকে ভজন সাধনের সর্ব্ব অঙ্গ পালন করিতে হইত। সামান্য জীবে সাধনের সকল অঙ্গ যাজন করিতে পারে না। কিন্তু প্রভু, তুলসী-সেবা হইতে কৃষ্ণ বিরহেতে মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত, ভজন সাধনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত, সমুদায় অঙ্গই যাজন করিয়া জীবকে শিক্ষাদান করিতেন—কারণ,

তিনি না করিলে, কেহ করিবে না। "যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।" প্রভুর সে মালা জপও, এক অদ্ভুত কাণ্ড। প্রভু মালা জপিবেন কি—মালা হাতে করিয়াই কাঁদিয়া আকুল। যথা—

রুই রুই জপে কৃষ্ণ নাম মধু। ধ্রু।

মালা জপ হইলে প্রভু ভোজনে বসিলেন—ভোজনান্তে একটু শয়ন করিলেন। তখন গোবিন্দ আসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন। প্রভুর একটু নিদ্রা আসিলে, গোবিন্দ তখন প্রসাদ পাইতেন। প্রভু প্রায় সারা নিশি ভজনে কাটাইতেন, কাজেই দিনের বেলায় একটু শয়ন করিতেন, প্রভু নিদ্রা যাইতেন, গোবিন্দ পদ-সেবা করিতেছেন, আর দেখিতেছেন—

বাহুপরে শির রাখি মৃত্তিকা শয়ন।
সরল নির্ম্মল মুখ মুদিত নয়ন॥
সুখ-স্বপ্ন দেখে প্রভু আপন লীলায়।
নব নব ভাব মুখে হইছে উদয়॥
ধূলায় ধূসরিত সুবলিত হেম দেহে।
যেই দেখে তার নেত্রে প্রেম ধারা বহে॥
ত্রিভুবন-নাথ শুই ধূলার উপরে।
বলরাম দাস বসি পদ সেবা করে॥

(অমিয় নিমাই চরিত)

প্রভু উঠিয়া অপরাহ্নে গদাধরের বাড়ীতে শ্রীভাগবত শ্রবণ করিতে চলিলেন। গদাধর নীলাচলে প্রভুর চিরসঙ্গী। মাধব-মিশ্র-তনয়, গদাধর, শ্রীগৌরাঙ্গের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি, তিনি স্বয়ং শ্রীরাধার প্রকাশ। যখন নিমাই নবদ্বীপে রাসলীলা করেন, তখন গদাধর রাধা হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখরের বাড়ী যে নাটক হয়, তাহাতে গদাধর প্রথমে রাধারূপে প্রকাশ হন। শ্রীনিমাই নৃত্য করিতে করিতে হাত ধরিয়া উঠিতেন। গদাধর প্রভুর চিরসঙ্গী। নীলাচলে—

কি ভোজনে কি শয়নে কিবা পর্য্যটনে।
গদাধর প্রভুকে সেবেন অনুক্ষণে॥
গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত।
শুনি প্রভু প্রেমরসে হন উনমত॥

তখন, গদাধরের নিকট প্রভুর গণ সকলে উপস্থিত হইয়া, প্রভুর সঙ্গে গদাধরের মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন। জ্যোৎস্না-রজনীতে সন্ধ্যা হইলে, প্রভু সমুদ্রতীরে গমন করিতেন।

সর্ব্ব-রাত্রি সিন্ধু-তীরে পরম বিরলে।
কীর্ত্তন করেন প্রভু মহা-কুতূহলে॥

চন্দ্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন।
বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন॥
সর্ব্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক শোভিত চন্দনে।
নিরবধি হরে কৃষ্ণ বলে শ্রীবদনে॥

যখন বাড়ী থাকেন, তখন প্রায় সমস্ত নিশি, স্বরূপ ও রাম রায়কে লইয়া রসাস্বাদন করেন। এই যে গম্ভীরার রসাস্বাদন-লীলা, ইহা অতি নিগূঢ় ও অননুভবনীয় বিষয়। বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধিকা, কৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদিনী হইয়া, ললিতা, বিশাখা প্রভৃতি সখীগণের প্রতি যেরূপ প্রলাপ উক্তি করিয়াছিলেন, এই ক্ষেত্রধামে, মহাপ্রভুও আপনাকে রাধা মনে করিয়া, এবং রায় রামানন্দ ও স্বরূপকে ললিতা বিশাখা মনে করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে আলাপ বা প্রলাপ করিতেন। মহাপ্রভু কখন বলিতেছেন—"দেখ সখি, কৃষ্ণ এল কিনা; সারানিশি জাগিয়াছি, এখন পর্য্যন্তও কৃষ্ণ আসিলেন না, বল দেখি, কি উপায় করি?" এইরূপ আলাপে দ্বাদশ বর্ষ এই গম্ভীরাতে কাটাইয়াছেন। দিবানিশি অশ্রুর বিরাম ছিল না। মহাপ্রভু কৃষ্ণ-বিরহে জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছিলেন।

রাধাকান্ত-মঠে, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছেন, তাঁহার নাম শ্রীশ্রীরাধাকান্ত। ঐ বিগ্রহের নামানুসারে মঠের নাম হইয়াছে "রাধাকান্ত-মঠ"। এই বিগ্রহ মহাপ্রভুর সময়ের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত। ইহা রাজা প্রতাপ-রুদ্রের স্বপ্নলব্ধ বলিয়া

জন-প্রবাদ আছে। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গের যে গম্ভীরা লীলার কথা উল্লেখ করিলাম, তাহা স্বতন্ত্র ভাবে পরে লেখা গেল।

করমা বাই বা কর্ম্মেতি বাই।

সাধারণ লোকে ইঁহাকে কর্ম্মবাই বলিয়াই জানে। ৺পুরীধামের কর্ম্মবাইয়ের খিচুরী বিখ্যাত। কেন যে জগন্নাথদেবকে এই খিচুরী দেওয়া হয়, তাহা হয় ত অনেকে জানেন না। ভক্তমাল গ্রন্থে এই ভক্তিমতী রমণীর এক অতি সুন্দর আখ্যায়িকা আছে। ইনি বাৎসল্য ভাবে ভগবানের সেবা করিতেন। তিনি শীতের সময় অতি প্রত্যূষে উঠিয়া, জগন্নাথদেবের ক্ষুধায় কষ্ট হইবে, এই মনে করিয়া রাত্রিবাস কাপড় পরিত্যাগ না করিয়াই, তাড়াতাড়ি খিচুরী রন্ধন করিয়া ভোগ দিতেন। একদা এক বৈষ্ণব আসিয়া, এইরূপ অশুচি ভাবে জগন্নাথের সেবা হইতেছে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন। বৈষ্ণবের উপদেশ অনুসারে তৎপর দিবস, কর্ম্মাবাই স্নাত ও পবিত্র হইয়া, খিচুরী রন্ধন করতঃ জগন্নাথদেবের ভোগ দেন, ইহাতে অনেক বেলা হইয়া পড়ায়, প্রভু কষ্ট বোধ করেন।

ঐ দিবসই রাত্রিতে, প্রধান পূজারী পাণ্ডা স্বপ্নে দেখেন যে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব লক্ষ্মীর সহিত বিরাজ করিতেছেন, এবং লক্ষ্মীদেবী ও জগন্নাথের মুখে খিচুরী লাগিয়া রহিয়াছে।

পাণ্ডাও স্বপ্নযোগেই ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, প্রভু বলিলেন, "আমার একটী ভক্ত প্রত্যহ আমাকে অতি প্রত্যূষে খিচুরী ভোগ দিত, অদ্য এক বৈষ্ণবের উপদেশে, স্নানাদি করিয়া বিলম্বে ভোগ রন্ধন করিয়া দেওয়ায়, আমার ক্ষুধায় বড় কষ্ট হইয়াছিল, এবং এখানকার ভোগের সময় হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া, তাড়াতাড়ি আসিয়াছি; মুখ ধুইয়া আসিবার সময় পাই নাই।" সেই স্বপ্নযোগে পাণ্ডা আরও শুনিতে লাগিলেন—লক্ষ্মী বলিতেছেন, "প্রভো, সেই রমণী রাত্রিবাস কাপড় না ছাড়িয়াই যে ভোগ দিত, তাহাতেই কত তৃপ্তি হইত!" জগন্নাথদেব বলিলেন,—"দেবি, প্রেমের সেবার নিকট নিষ্ঠা কিছুই নয়। আমি অনুরাগের সেবা চাই, আড়ম্বর চাই না। রাগমার্গের সেবার নিকট, নিষ্ঠার সেবা তুচ্ছ।"

পাণ্ডা পরদিন স্বপ্নবৃত্তান্ত কর্ম্মাবাইকে অবগত করাইয়া, পূর্ব্বভাবেই সেবা করিতে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ জানাইলেন। তদনুসারে, তদ্দিবস হইতেই কর্ম্মাবাইয়ের খিচুরী বিখ্যাত হইল। এখনও জগন্নাথদেবকে প্রাতে যে খিচুরী ভোগ দেওয়া হয়, তাহা কর্ম্মাবাইয়ের খিচুরী নামে বিখ্যাত আছে। কর্ম্মাবাইয়ের মন্দিরের নিকট বিঙ্কটাচারী মঠ আছে। সেই মঠে, একটী মন্দিরের ভিতর, গোপালজির বিগ্রহ ও অদূরে, দক্ষিণ পার্শ্বে, নূতন লোকনাথদেবের মন্দির আছে।

নানক মঠ।

স্বর্গদ্বারে যাইবার রাস্তার দুই ধারে সাধু-সন্ন্যাসীদের আশ্রম আছে। অনেক দেবতা এবং রামজি, ও রাধানাথজিউ আছেন। বামধারে নানক-পন্থীর মঠ আছে। এই মঠে প্রথম প্রবেশ করিয়াই, সম্মুখে একটী মন্দির পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে "পাতাল-গঙ্গা" আছেন। এই গঙ্গা সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। শ্মশ্রু-ধারী গুরু নানককে যবন মনে করিয়া, জগন্নাথের মন্দির হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইলে, তিনি এই স্থানে আসিয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ধ্যান করেন। ভগবান্ সন্তুষ্ট হইয়া, স্বয়ং তাঁহাকে স্বর্ণথালে করিয়া প্রসাদ আনিয়া দেন, ও পদ দ্বারা কূপ খনন করতঃ গঙ্গাদেবীকে আনয়ন করেন। ইহাকেই লুপ্ত-গঙ্গা বলে। যাত্রিগণ পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। পঞ্জাবের রাজা মহাসিংহ এই মন্দিরের কপাট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এই মঠে গোপালজি ও গুরু নানক সাহেবের সেবা আছে। গুরু নানক পরম সাধু ছিলেন। ইনি যে ধর্ম্মমত প্রচার করেন, তাহার একখানি বড় গ্রন্থ আছে, উহাকে গ্রন্থ-সাহেব কহে। নানক-পন্থীদের মঠে ঐ গ্রন্থ-সাহেবের পূজা হইয়া থাকে। উহারা গুরুভক্ত। মহাত্মা নানক যদিও জাতিতে মুসলমান ছিলেন, তথাপি উঁহার ধর্ম্মমত অতি উদার ছিল। তিনি কোনও

ধর্ম্মাবলম্বীকেই ঘৃণা করিতেন না, বরং সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বীকেই শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। যেখানে গেলে রাম রহিম এক হইয়া যায়, বেদ কোরাণ এক হইয়া যায়, যেখানে সব ধাঁধাঁ মিটিয়া যায়, তিনি ধর্ম্মের সেই স্তরে উঠিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইঁহার মৃত্যু হইলে মুসলমান শিষ্যগণ ইঁহাকে কবর দিতে চাহিয়াছিলেন, এবং হিন্দুগণ দাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা দেখা যায় যে, ইনি হিন্দু ও মুসলমান সকলকেই সমভাবে দেখিতেন।

কবির মঠ।

মহাত্মা কবীর একজন পরম সাধু ছিলেন। ইঁহার উপদেশপূর্ণ দোঁহাবলী আছে। ইঁহার উপদেশ পাঠে দেখা যায়, সমস্ত ধর্ম্মেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কোন ধর্ম্মেই বিদ্বেষ ছিল না। তিনি জাতিতে মুসলমান হইলেও হিন্দুমতাবলম্বী সাধু ছিলেন। ধর্ম্মের চরমাবস্থায় উঠিলে, হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদ থাকে না। ইনিও এই শ্রেণীর সাধু ছিলেন। এই মহাত্মার নামে নানক-মঠের সন্নিকটে একটী মঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। যাত্রিগণকে কবীরের তোড়ানি বলিয়া, প্রসাদের জল খাইতে দেয়। এইখানে কবীরের সমাধি বলিয়াও একটী স্থান দেখা যায়। হরিদাসকে যেরূপ বেশ্যা দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছিল, এবং বেশ্যা যেরূপ অবশেষে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, কবীর

সম্বন্ধেও সেইরূপ উপাখ্যান আছে। কবীর বেশ্যাকে গ্রহণ করিয়া পবিত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক দোঁহাবলী আছে। "উঁহা মেরি যানা" ইত্যাদি দোঁহাটী তাঁহারই কৃত।

স্বর্গদ্বার-সাক্ষী।

স্বর্গদ্বারের নিকটস্থ সমুদ্রজলে তর্পণাদি করিলে, তাহা, স্বাক্ষী-স্বরূপ জগন্নাথের নিকট বলিয়া, গোপাল-মূর্তিকে সাক্ষী রাখিয়া যায়। স্বর্গদ্বারের নিকট, হনুমান্‌, রামজীর মন্দির, শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণজী, মহাদেবের মন্দির এবং বিদুরের বাড়ী আছে। তথায় ক্ষুদের পিঠা ও শাকভোগ দেওয়া হয়। ইহাকে কেহ কেহ সুদাম-পুরীও বলে। সম্ভবতঃ, মহাত্মা বিদুর তীর্থযাত্রা উপলক্ষে, এখানে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়াই, ইহার নাম বিদুর-মঠ। এই স্থানে রাধাকৃষ্ণ ও বিদুরজীর মূর্তি আছে। এই বিদুর শ্রীকৃষ্ণের বাল্যকালের সখা ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরাতে রাজা হইলেন, বিদুর তাঁহার স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে ভগবদ্দর্শনে চলিলেন। কিছু উপহার লইয়া যাইতে হয়, কিন্তু বিদুরের ঘরে উপহার দেওয়ার মত কিছুই ছিল না; অবশেষে এক মুষ্টি চাউল অঞ্চলে বাঁধিয়া লইলেন। বিদুরের এই এক মুষ্টি চাউল, ভগবান্‌ অতি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন, এবং এই উপহারের প্রতিদানে বিদুরের অতুল ঐশ্বর্য্য হইল। সেই হইতে বিদুরের ক্ষুদ্‌ কুঁড়া

চিরপ্রসিদ্ধ হইল। দুর্য্যোধনের মন্ত্রী বিদুরের সম্বন্ধেও এইরূপ একটী গল্প আছে। তাহা এই—বিদুরের স্ত্রী পদ্মাবতী কলা-ভ্রমে কলার বাকল খাওয়াইয়াছিলেন। ভগবান্ তাহাই পরমানন্দে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রেমের দ্বারা জিনিষের মূল্য স্থির করেন।

স্বর্গদ্বার।

স্বর্গদ্বার পঞ্চতীর্থের মধ্যে একটী তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কথিত আছে, ব্রহ্মা যখন শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি স্বর্গ হইতে এই স্থানে দেবগণ সহ নামিয়াছিলেন। এই জন্য ইহাকে স্বর্গদ্বার বলিয়া থাকে। তীর্থরাজ সমুদ্র,—ইহার উত্তর কূলে শ্রীক্ষেত্র বিরাজিত। পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রের আকৃতি শঙ্খের ন্যায়। এই শঙ্খের উদর ভাগ সমুদ্র-জলে নিমগ্ন। ইহার স্পর্শে সমুদ্র তীর্থরাজ-নামে অভিহিত হয়।

হরিদাস-মঠ।

এই মঠে ব্রহ্ম-হরিদাসের সমাধি আছে। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু, শ্রীহস্তে এই সমাধি দিয়াছিলেন। এই স্থানে একটী মন্দির আছে, তন্মধ্যে শ্রীমান্ নিত্যানন্দ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। দক্ষিণে নিত্যানন্দ, বামে অদ্বৈত এবং মধ্যস্থলে মহাপ্রভু বিরাজিত আছেন।

এইটী গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মঠ। যিনি "নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম" নাম প্রচার করেন, সেই চরণদাস বাবাজীর শিষ্যগণ কর্তৃক বিগ্রহের সেবা চলিতেছে। এই স্থানে অনেক গৌড়ীয় বৈষ্ণব বাস করেন।

শঙ্কর বা গোবর্দ্ধন মঠ।

এই মঠের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথের বিশেষ সম্পর্ক আছে, সুতরাং, এই মঠের বিবরণ এই গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। স্বর্গদ্বারে শঙ্করাচার্য্যের এই মঠ অবস্থিত। স্থানটী অতি নিভৃত। এই মঠের ভিতর প্রবেশ করিলেই, দুইটী মন্দির পাওয়া যায়। তাহার একটীতে রাধাকৃষ্ণ ও অপরটীতে শিবমূর্ত্তি আছেন। মন্দিরদ্বয়ের নিকটস্থ একটী ঘরে শ্বেত-প্রস্তর-নির্ম্মিত মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের একটী মূর্ত্তি আছে। সেই মূর্ত্তিটি দেখিলেই বোধ হয় যে, শঙ্করাচার্য্য অতি সুপুরুষ, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি-শালী ও অমানুষিক-শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। পুরীধামে যতগুলি মঠ আছে, তন্মধ্যে এইটী যে, প্রাচীন-কীর্ত্তি-প্রকাশক ও বহুদিনের স্থাপিত, তাহা, ইহা দর্শনে ও নিম্ন লিখিত বিবরণে অনুমিত হয়। এই মঠকে গোবর্দ্ধন, বালি বা শঙ্কর মঠ বলিয়া থাকে। যখন ভারত-বর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, অর্থাৎ বুদ্ধ-দেবের নির্ব্বাণের পর, এই ধর্ম্মের বিশেষ বিস্তার হয়। সেই সময়, এই বৌদ্ধ-ধর্ম্মের স্রোতের নিবৃত্তির জন্য, এই মহাত্মার

আবির্ভাব হয়। এই সময়ে, যদি এই মহাত্মার অভ্যুদয় না হইত, তাহা হইলে ভারতের হিন্দুধর্ম্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইত। শঙ্করাচার্য্য অনেকের নিকট, শঙ্করের অবতার বলিয়া পূজিত হইয়া থাকেন।

২২৫৫ যুধিষ্ঠিরাব্দে রাজ-দত্ত সাহায্যে, যখন, ভারত-বিখ্যাত স্বামী শঙ্করাচার্য্য, পুরীতে এই মঠ স্থাপন করেন, সেই সময়ে, বিপ্রলাভ বা শর-শঙ্খ-দেব উড়িষ্যার রাজা ছিলেন বলিয়া, মাদলা পঞ্জিকাতে লিখিত আছে। ইহার পূর্ব্বে বদরিকাশ্রমে যোষী বা জ্যোতির্ম্মঠ, দ্বারকায় সারদা-মঠ, মহীসুরে শিঙ্গারী বা শৃঙ্গবেরি মঠ স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রথমঃ পশ্চিমাম্নায়ঃ শারদা-মঠ উচ্যতে।
কীটবারঃ সম্প্রদায়স্তস্য তীর্থাশ্রমৈঃ শুভৈঃ॥
পূর্ব্বাম্নায়ো দ্বিতীয়ঃ স্যাদ্‌গোবর্দ্ধনমঠঃ স্মৃতঃ।
ভোগবারঃ সম্প্রদায়ো বনারণ্যে পাদম স্মৃতঃ॥
তৃতীয়স্তূত্তরাম্নায়ো জ্যোতির্নাম মঠো ভবেৎ।
শ্রীমঠশ্চেতি বা তস্য নামান্তরমুদীরিতম্॥
চতুর্থো দক্ষিণাম্নায়ঃ শৃঙ্গেরিতু মঠোভবেৎ।
সম্প্রদায়ো ভুরিবারঃ ভূর্ভুবো-গোত্রমুচ্যতে॥

পুরীতে শঙ্কর-মঠ-স্থাপনের পর, তন্মঠস্থ স্বামিদিগের হস্তেই জগন্নাথ-মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার, বহুকাল পর্য্যন্ত
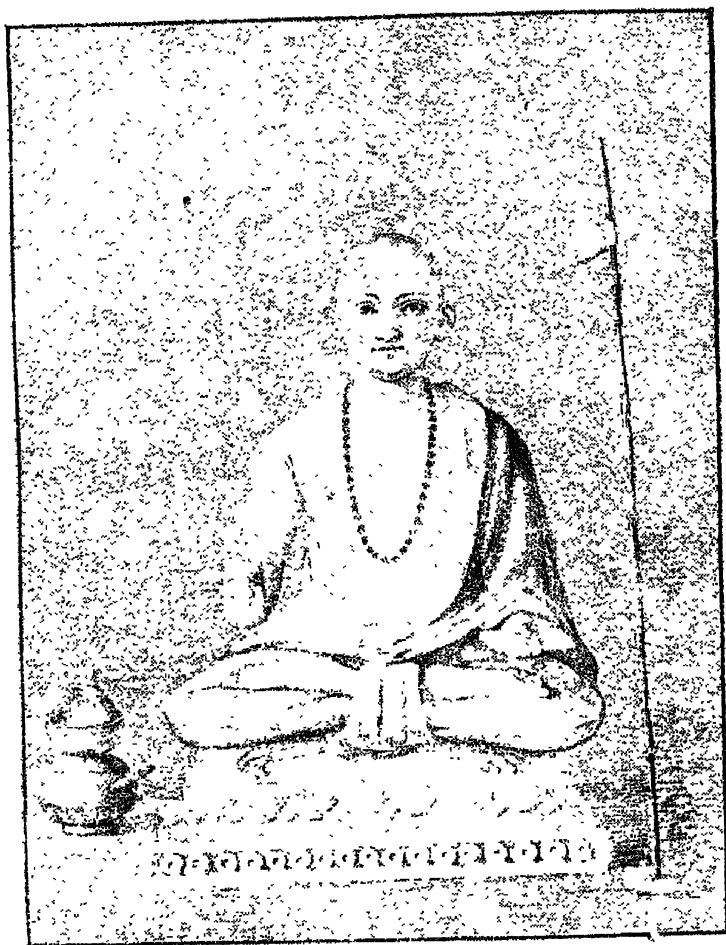
শঙ্করাচার্য্য স্বামী।

ন্যস্ত ছিল। সেই সময়ে জগন্নাথ-মন্দিরের বেষ্টনের মধ্যে, গোবর্দ্ধন-মঠের আদি আচার্য্যগণ, অনেক সময় অবস্থান করিতেন। বহুকাল পরে, মার্‌হাট্টা রাজা রঘুজীর আধিপত্য-সময়ে, রামানুজীয় মত প্রবল হওয়ায়, শঙ্কর-মঠ স্থানান্তরিত হইয়া, সমুদ্রতীরে স্থাপিত হয়। সেই মঠই বর্ত্তমান গোবর্দ্ধন-মঠ। ক্রমে ক্রমে, রামানুজীয় মত প্রচলিত হইলে, রত্ন-সিংহাসনের নিকটস্থ ভৈরবমূর্ত্তি, রামানুজীয়দের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়। তথাপি শঙ্করমঠের স্বামীদের প্রাধান্য অদ্যাবধি পূর্ব্ববৎ প্রবল আছে।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কলিযুগ ২৬২২ অব্দে ও ২৬৩১ যুধিষ্ঠিরাব্দে, বৈশাখী শুক্ল-পঞ্চমী তিথিতে, দাক্ষিণাত্যে কেরল-দেশান্তর্গত কাপটী-গ্রামবাসী শ্রীশিবগুরু-নামক ব্রাহ্মণের অংশে সীতা-দেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হন। মঠাম্নায়-গ্রন্থে, শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-কাল, যুধিষ্ঠিরাব্দ ২৬৩১ নির্ণীত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ-আরম্ভ-সময়ে, যুধিষ্ঠিরাব্দ বা কলির অতীতাব্দ ৩৫০ হইয়াছিল। যে সকল পণ্ডিত পাশ্চাত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত, কিন্তু উক্ত গ্রন্থ-সমূহে অনভিজ্ঞ, তাঁহারা অনুমান করেন যে, শঙ্করাচার্য্য সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর লোক। এই বিষয় নিয়া অনেক আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু একেবারে নিঃসন্দিগ্ধরূপে মীমাংসিত না হইলেও, তাঁহার আবির্ভাব কাল যে, সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে, তাহা স্থির হইয়াছে। সংস্কৃত-পদ্যে রচিত পুরীস্থ

শঙ্করমঠের "গুরুপরম্পরা" নামক (মঠাম্নায়) পুস্তকে দেখা যায় যে, শ্রীস্বামী শঙ্কর হইতে আরম্ভ করিয়া, বর্ত্তমান শ্রীমধুসূদন তীর্থ স্বামী পর্য্যন্ত ১৪৩ পুরুষ অতীত হইয়াছে। পদ্মপাদাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া, জ্ঞানানন্দ পর্য্যন্ত ১৯ পুরুষ মধ্যে, এই মঠের স্বামীরা "অরণ্য" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। জ্ঞানানন্দ, শিষ্য না করিয়া, মানবলীলা সম্বরণ করায়, কিছুকাল এই মঠের গদী শূন্য ছিল। অনন্তর, তীর্থ-নামক একজন স্বামী, কাশীধাম হইতে আসিয়া, এই মঠের অধিকারী হইয়াছিলেন। সেই সময়, এই মঠের মোহন্তদের "তীর্থ" উপাধি হইয়াছে। এই মঠের পঞ্চম পুরুষ, স্বামী বামদেব "পঞ্চদশী" গ্রন্থের রচয়িতা; একাদশ পুরুষ, স্বামী শ্রীধর, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ-সমূহের ব্যাখ্যা-কর্ত্তা। এই শ্রীধর, গীতার টীকাকার শ্রীধর কিনা, তাহা সন্দেহজনক; কারণ গীতার টীকাকার শ্রীধর স্বামীর টীকার ভাবানুসারে বুঝাযায়, তিনি পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি যে জ্ঞান-বাদী ছিলেন, তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারিনা। মঠাম্নায়-লিখিত শ্রীধর, অন্য কোন মহাপুরুষ হইতে পারেন। এই মঠের ত্রিষষ্ঠিতম পুরুষ, স্বামী রামচন্দ্রতীর্থ "সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা" ব্যাকরণের রচয়িতা বলিয়া, গুরুপরম্পরা-গ্রন্থে প্রকাশ। ইহার মধ্যে যে সময় গদী শূন্য ছিল, তাহাও দুই পুরুষের কম হইবে না। সুতরাং এই গোবর্দ্ধন মঠ, দুই সহস্র বৎসর স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া, অনুমান করা যায়।

বোধ হয়, এই সমস্ত পুস্তক, সময়-নির্দ্ধারক আধুনিক পণ্ডিতগণের হস্তগত হয় নাই; যদি হইত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া, অনুমানকে স্থাপন করিবার জন্য, ইঁহারা এতদূর বদ্ধপরিকর হইতেন না। মঠাম্নায়ে নির্দ্ধারিত যে শকাব্দ, আমারা তাহাই গ্রহণ করিলাম।

এই মহাপুরুষের প্রতিভা বাল্য-বয়স হইতেই উদ্ভাসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পঞ্চম বর্ষে তাঁহার উপনয়ন সংস্কার হয়, এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে, তিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে, তাঁহার এত পাণ্ডিত্য-লাভ হয় যে, এই সময়ে তিনি গীতা, উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি ষোলখানি গ্রন্থের ষোলটী ভাষ্য প্রণয়ন করেন, এবং শ্রীপদ্মপাদাচার্য্য, শ্রীসুরেশ্বরাচার্য্য শ্রীহস্তামলকাচার্য্য এবং শ্রীত্রোটকাচার্য্য নামক চারিজন মহাপণ্ডিতকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেন। প্রথমতঃ, তিনি বদরি-নারায়ণে জ্যোতির্ম্মঠ স্থাপন করেন, তার পর, আর তিন মঠ স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যে গোবর্দ্ধন-মঠ সর্ব্বশেষে স্থাপিত হয়। শ্রীপদ্মপাদাচার্য্য এই মঠের সেবকরূপে অভিষিক্ত হন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই চতুর্ম্মঠ স্থাপনের পর, দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হন। তিনি কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত, তাঁহার বৈদিক-ধর্ম্ম বিস্তার করেন, এবং বৌদ্ধদিগের মত খণ্ডন করেন। এতদুপলক্ষে বৈষ্ণব-মতাবলম্বী গৃহস্থাশ্রমী মহাপণ্ডিত কাশ্মীরবাসী মণ্ডন-মিশ্রের সহিত তুমুল বিচার হয়। মণ্ডনমিশ্রের

পত্নী পরম বিদুষী উভয়-ভারতী এই বিচারে মধ্যস্থ ছিলেন।

দেখুন, ভারতবর্ষের কতদূর অধঃপতন হইয়াছে! বর্ত্তমান স্ত্রী-শিক্ষার কতদূর অবনতি হইয়াছে, এবং তখন স্ত্রীশিক্ষা বা কতদূর উন্নত অবস্থায় ছিল। কতদূর পাণ্ডিত্যলাভ করিলে, শঙ্করাচার্য্য এবং মণ্ডন-মিশ্রের বিচারে মধ্যস্থ হওয়া যায়, তাহা পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। এই উভয়-ভারতী, স্বয়ং সরস্বতী অবতীর্ণা বলিয়া, কাশ্মীরে পূজিতা হইতেন। অনেক বিচারের পর, অবশেষে মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হন। মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হইলে, উভয়-ভারতী শঙ্করাচার্য্যের বিরুদ্ধে বিচার করিতে আরম্ভ করেন, এবং রতিশাস্ত্রের প্রশ্নেতে শঙ্করাচার্য্য তাঁহার নিকটে পরাজিত হন।

শঙ্করাচার্য্য, তদীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য, তাঁহার সন্ন্যাসি দেহ রাখিয়া, কোন গৃহস্থ রাজার মৃত দেহে প্রবেশ করেন। রাজা পুনর্জ্জীবিত হইলেন। এইরূপে কতকদিন গত হইলে, রাজার প্রধানা মহিষী বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বামীর যেরূপ আচরণ ছিল, তিনি, এখন সেই আচরণানুযায়ী চলিতেছেন না;—ইঁহার আচরণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহা দেখিয়া প্রধানা মহিষীর মনে সন্দেহের উদয় হইল। তৎকাল প্রচলিত পরকায়-প্রবেশের কথা রাণী অবগত ছিলেন। এস্থলেও পরকায়-প্রবেশ হইয়াছে মনে করিয়া, তিনি, রাজ্যে যত মৃতদেহ আছে, সমস্ত রাজবাড়ীতে

উপস্থিত করিবার জন্য ঘোষণা করিলেন। এদিকে, শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বদেহ তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা রক্ষিত হইতেছিল; এবং তাঁহার শিষ্যদের প্রতি আদেশ ছিল, যতদিন পর্য্যন্ত, তিনি রাজদেহেতে থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত, তাঁহার স্ব-প্রণীত মোহমুদ্গারের শ্লোক তাঁহাকে শুনান হইবে। কারণ, তিনি রাজদেহে প্রবেশ করিয়া, রাজভোগ গ্রহণ করিতেছিলেন—সুতরাং, যদি সাংসারিক ভোগে মুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি ভুলিয়া যান, এইজন্য "মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং" ইত্যাদি তাঁহার স্বপ্রণীত বৈরাগ্য-উত্তেজক শ্লোক তাঁহাকে শুনাইবার, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই সমস্ত শ্লোক অন্যত্র উদ্ধৃত হইয়াছে বলিয়া, এখানে দেওয়া হইল না। রাণীর লোক এইরূপ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেই, শঙ্করাচার্য্য বুঝিতে পারিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহার ধরা পড়িবার সম্ভাবনা। তখন রাজদেহ পরিত্যাগ করিয়া, তিনি পূর্ব্ব দেহে প্রবেশ করিলেন, রাজারও মৃত্যু উপস্থিত হইল। তারপর, উভয়-ভারতীর প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন উভয়েই বুঝিতে পারিলেন যে, শঙ্করাচার্য্য শঙ্করের অবতার, এবং উভয়-ভারতী সরস্বতীর অংশে অবতীর্ণা। সুতরাং তাঁহাদের বিচার এইখানেই শেষ হইয়া গেল, উভয়-ভারতী দেহ রাখিলেন।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য কাশীতে গুরুলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া,

একটী কিম্বদন্তী আছে। শঙ্করাচার্য্যের কাশীতে অবস্থান-কালে কোন ব্রাহ্মণের শিষ্য, শঙ্করাচার্য্যদ্বারা তাঁহার মৃত্যু গণনা করান। শঙ্করাচার্য্য গণনাদ্বারা তাঁহার বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে বলিয়া স্থির করেন, এবং দিন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। সেই ব্রাহ্মণ তাঁহার গুরুর নিকট শঙ্করাচার্য্যের গণনাবৃত্তান্ত অবগত করান। গুরু বলেন যে, তোমার কখনই ঐ তারিখে মৃত্যু হইবে না—তদনুসারে ব্রাহ্মণ আসিয়া পুনরায় শঙ্করাচার্য্যকে জানান। শঙ্করাচার্য্য পুনরায় গণনা করিয়া, তাঁহার গণনা অভ্রান্ত বলিয়া স্থির করেন, এবং ইহাও বলিয়া দেন যে, যদি আমার গণনা ভ্রান্ত হয়, তাহা হইলে, আমি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব; আর যদি আমার গণনা ঠিক হয়, তাহা হইলে, তোমার গুরুকে আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। গুরুও তাহাতেই সম্মত হইলেন।

ব্রাহ্মণের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল, গুরু ব্রাহ্মণকে সমাধিস্থ করিয়া মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। শঙ্করাচার্য্যের নির্দ্দিষ্ট সময়ানুসারে বজ্রপাত হইল, এবং ব্রাহ্মণকে যে স্থানে প্রোথিত করা হইয়াছিল, সেই স্থানেই বজ্র পড়িল। কিন্তু তিনি সমাধিস্থ থাকাতে বজ্রপাতে তাঁহার কোনও অনিষ্ট হইল না। গুরু পুনরায় তাঁহার সমাধিভঙ্গ করাইলেন। শঙ্করাচার্য্য এই ব্যাপারে পরাস্ত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রতিশ্রুতি অনুসারে ঐ

গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, এবং মনঃ-ক্ষোভে তাঁহার সমস্ত গ্রন্থ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু সমস্ত গ্রন্থ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করায়, তাঁহার মনে যে দুঃখ রহিয়া গেল, তাহা কাহারও নিকট ব্যক্ত করিলেন না বটে, কিন্তু গুরুজী তাহা বুঝিতে পারিলেন। তিনি শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন, "বইগুলি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া, তোমার মনে বড়ই দুঃখ হইয়াছে। তুমি গঙ্গদেবীর নিকট গিয়া, গ্রন্থগুলি ফিরাইয়া দিবার জন্য প্রার্থনা কর, তিনি তোমার সমস্ত পুস্তক ফিরাইয়া দিবেন।" গুরুর আদেশ অনুসারে শঙ্করাচার্য্য গঙ্গাদেবীর নিকট প্রার্থনা করিবামাত্র, সমস্ত পুস্তক তাঁহার করতলগত হইল। তখন, তিনি গুরুর প্রভাবে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে করিলেন, যে গুরুর এতদূর শক্তি, যিনি জীবন দান করিতে পারেন, পুস্তক নদীতে ফেলিয়া দিলে, যাঁহার কথামত গঙ্গাদেবী আবার সেই পুস্তক ফিরাইয়া দেন—তাঁহার নিকট ত অপ্রাপ্য কিছুই নাই, আমি সামান্য বিষয়ের জন্য কেন ক্ষোভ করিতেছি। এই ভাবিয়া পুস্তক পুনরায় গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। শঙ্করাচার্য্যের ষোল বৎসর মাত্র আয়ু ছিল। যখন তিনি বেদান্ত-ভাষ্য আরম্ভ করেন, সেই সময়ে তাঁহার ষোল বৎসর পূর্ণ হয়। বেদব্যাস সেই সময়ে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার আয়ু আরও ষোল বৎসর বৃদ্ধি করিয়া ৩২ বৎসর পরমায়ু নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন ; এবং বলিয়া যান যে, এখনও

আরও অনেক কার্য্য বাকী আছে, সুতরাং আরও ষোল বৎসর না হইলে, সে কার্য্য শেষ হইবে না। তিনি ৩২ বৎসরে জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া, ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

ভারতবর্ষের প্রধান দার্শনিক শঙ্করাচার্য্য বেদান্তের বিশুদ্ধাদ্বৈত-মত প্রচার করেন। তিনি "জীব-ব্রহ্মৈক্যং" "তত্ত্বমসি" "সোঽহং" প্রভৃতি তত্ত্ব শিক্ষা দেন। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব, পুরীধামে সার্ব্বভৌমের সহিত বেদান্ত-বিচারে শঙ্করাচার্য্যের মত খণ্ডন করেন। কাশীতেও প্রকাশানন্দের সহিত বিচারে, শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করেন। মহাপ্রভুর দার্শনিক মত, বেদান্তের বিরোধী নহে, বস্তুতঃ ইহা বেদান্তের অন্যতম ব্যাখ্যা মাত্র। শঙ্করাচার্য্য এবং মহাপ্রভু উভয়েরই উদ্দেশ্য অহঙ্কার বা মায়া নিবৃত্তি করা— শঙ্করাচার্য্যের উদ্দেশ্য জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া, অহঙ্কার নিবৃত্তি করা, এবং মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য, ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অহঙ্কার নিবৃত্তি করা। কিন্তু জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিলে, অহংজ্ঞানের বৃদ্ধি করিয়া, সোঽহং জ্ঞানে পরিণত করিতে হইবে। সুতরাং, জ্ঞান দ্বারা অহং-জ্ঞানের নিবৃত্তি করিতে হইবে, ইহার সহিত যুদ্ধ করিয়া, ইহাকে পরাস্ত করিতে হইবে। অপরদিকে ভক্তিমার্গের প্রধান অবলম্বনীয় প্রেম, দীনতা, হীনতা—আপনাকে তুচ্ছ এবং হেয় জ্ঞান করিতে হইবে, তৃণ হইতে নীচজ্ঞান করিতে হইবে। সুতরাং এই

মার্গ অবলম্বন করিলে, অহং জ্ঞানকে অতি সহজেই, পরাভূত করা যাইতে পারে।

জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গ ইহার মধ্যে কোন্‌টী সুগম এবং কোন্‌টী দুর্গম, তাঁহা রামায়ণের একটী গল্প দ্বারা সুন্দররূপে বুঝান যাইতে পারে। মহাবীর হনুমান্ সীতাদেবীর অন্বেষণে যখন সাগর-লঙ্ঘন করেন, তখন, পথে সমদ্রমধ্যে নিমজ্জমান মৈনাক পর্ব্বত, তাঁহার বপু বিস্তার করিয়া, হনুমানের গতিরোধ করেন। হনুমান্ এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্য, প্রকাণ্ড শরীর ধারণ করিলেন। তাহার পর মৈনাক ক্রমেই তাঁহার উত্তুঙ্গ শৈলদেহ বিস্তার করিতে লাগিলেন। হনুমান্‌ও ক্রমেই তাঁহার প্রকাণ্ড দেহ বিশাল হইতে বিশালতর করিতে লাগিলেন। অবশেষে হনুমান্ আয়তনে মৈনাক পর্ব্বতকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, একটী মক্ষিকার রূপ ধারণ করিয়া, পর্ব্বতের গাত্রস্থ একটী ছিদ্র দিয়া, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া গেলেন। হনুমান্ যদি ক্রমেই তাঁহার দেহ বিস্তার করিতে থাকিতেন, তাহা হইলে হয়ত, তিনি পরিণামে মৈনাক পর্ব্বতকে পরাস্ত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার বহু সময়ের আবশ্যক হইত। তিনি মক্ষিকার রূপ ধারণ করায়, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, মৈনাক অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলেন।

জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়াও হয়ত, পরিণামে অহংজ্ঞানকে

যুদ্ধ করিয়া পরাভূত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহা বহু-সময়-সাপেক্ষ। কিন্তু ভক্তিমার্গে অতিসহজেই, অল্প সময়ের মধ্যে, অহংজ্ঞানকে পরাভূত করা যায়।

প্রকাশানন্দকে পরাভূত করিবার জন্য, মহাপ্রভু দীনতার ভাব অবলম্বন করিয়া প্রকাশানন্দকে পরাজয় করিয়াছিলেন। হয়ত জ্ঞানমার্গের দ্বারা পরাজয় করিতে হইলে, প্রকাশানন্দ কিছুতেই পরাজিত হইতেন না—তাঁহার উপদেশ প্রকাশানন্দের হৃদয়কে স্পর্শ করিত না ; কারণ, তাঁহার হৃদয় অহঙ্কারে আবৃত ছিল। তাঁহাকে জ্ঞান দ্বারা পরাজিত করিতে হইলে, সার্ব্বভৌমকে যেরূপ ঐশ্বরিক ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া পরাভব করিয়াছিলেন, এক্ষেত্রেও তাহাই করিতে হইত। মহাপ্রভু সে উপায় অবলম্বন না করিয়া, এবার দীনতার দ্বারাই সহজে কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন।

জ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানকেই চরম বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার দর্শনমতে শক্তির কোনও স্থান ছিলনা—তিনি শক্তিকে বিশ্বাস করিতেন না। পরে তাঁহার এই মত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে। একদা শঙ্করাচার্য্য মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন যে, পথিমধ্যে একটী বৃদ্ধা রুগ্না স্ত্রীলোক পড়িয়া আছে। বৃদ্ধা অতি কাতর-স্বরে শঙ্করাচার্য্যকে পথ হইতে, তাহাকে সরাইয়া রাখিতে বলিল। শঙ্করাচার্য্য তখন অত্যন্ত অবসন্ন

এবং দুর্ব্বল বোধ করিতেছিলেন; তিনি বলিলেন, "আমার এখন এরূপ শক্তি নাই যে, তোমাকে পথ হইতে সরাইয়া রাখি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা বলিল, "কেন, তুমি ত শক্তি বিশ্বাস করনা।", ছদ্মবেশী বৃদ্ধা এই কথা বলিয়া ছদ্মবেশ পরিহার করিয়া, স্বীয় স্বরূপ (শক্তিমূর্ত্তি) প্রকাশিত করিলেন। ইহাতে শঙ্করাচার্য্য বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে ভক্তি-গদ্‌গদ-কণ্ঠে শক্তিদেবীর স্তব করিতে আরম্ভ করেন, পরে এই স্তবরাজি দ্বারা "আনন্দলহরী" গ্রন্থ-প্রণয়ন করেন।

টোটা-গোপীনাথ।

ইহা জগন্নাথের মন্দির হইতে দক্ষিণ দিকে, প্রায় দেড় মাইল দূরে সমুদ্রতীরে অবস্থিত। জগন্নাথের মন্দিরের দক্ষিণদ্বারের সম্মুখ দিয়া, যে রাস্তাটি গিয়াছে, ঐ রাস্তায় কিছুদূর গিয়া, বাম-ধারে যে রাস্তাটি দক্ষিণ দিকে গলির ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, সেই রাস্তায় কিছুদূর যাইয়া, চামুণ্ডাদেবীর মন্দির পাওয়া যায়। আরও কিছুদূর যাইয়া হরচণ্ডীর মন্দির পাওয়া যায়। আর অল্প কিছুদূর গেলেই, ডান ধারের মন্দিরে, বলদেব এবং দুইধারে রেবতী ও রুক্মিণী আছেন। বামধারের মন্দিরে রাধামাধব, মদন-মোহন ও গৌর-গদাধর আছেন।

টোটা-গোপীনাথ নাম হইবার কারণ এই যে, "টোটা" অর্থ বাগান। বাগানের মধ্যে গোপীনাথ আছেন বলিয়া,

ইঁহাকে "টোটা-গোপীনাথ" বলা হয়। কেহ বলেন, সমুদ্রের তটে আছেন বলিয়া, "তটে গোপীনাথ" শব্দের অপভ্রংশ "টোটা গোপীনাথ"। আর এক ব্যাখ্যা এই, মহাপ্রভু গোপীনাথের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার উরুদেশ কাটিয়া যায়, তাহা হইতে নাম হইল টোটা গোপীনাথ। পাণ্ডারা এখনও ঐ কাটাস্থান দেখাইয়া বলে, এই স্থান দিয়া মহাপ্রভু প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই কাটাস্থান দেখাইতে পাণ্ডারা পাঁচ সিকা নিয়া থাকে। একথা সত্য মিথ্যা আমাদের বিচার্য্য নহে,--যাহা প্রবাদ আছে, তাহাই বলা হইল। অন্যান্য গ্রন্থে মহাপ্রভু জগন্নাথের শরীরে প্রবেশ করেন, এইরূপ দেখা যায়। এই উভয় বিষয়ের মধ্যে কোনটী সত্য, তাহা বলা যায় না।

গদাধর এই টোটাগোপীনাথের সেবাইত ছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁহাকে এই ঠাকুর-সেবার জন্য নিয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন-স্বরূপ এখানে গৌর-গদাধর-মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। এই গোপীনাথ-প্রাঙ্গণে গদাধর ভাগবত পাঠ করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ এবং তাঁহার গণ ভাগবত শুনিতেন, এবং অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। ভাগবত-পাঠান্তে সমুদ্রতীরে বসিয়া নাম-জপ করিতেন।

গদাধর ভাগবত-পাঠ করিতেছেন ও প্রভু নিজে, নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহ, ভক্তগণ-পরিবৃত হইয়া পাঠ শুনিতেছেন, এই অবস্থার প্রতিমূর্ত্তি, রাজা প্রতাপরুদ্র চিত্রকর দ্বারা

ভক্তগণ সঙ্গে মহাপ্রভু উপবিষ্ট

H. RAY & SONS.

তুলাইয়াছেন। সেই মূর্ত্তি হইতে প্রতিকৃতি তুলিয়া, শ্রীবাসাচার্য্য নবদ্বীপে আনিয়াছিলেন। শ্রীবাসাচার্য্যের শিষ্যদের বংশধর হইতে, রাজা নন্দকুমার তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পান। সেই প্রতিমূর্ত্তি হইতে ফটো তুলিয়া, তাহার হাফটোন ছবি দেওয়া গেল।

টোটা-গোপীনাথের মন্দিরের সম্মুখেই একটী পর্ব্বত আছে। উহা বর্ত্তমানে বালির স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের নাম চটক পর্ব্বত। এই পর্ব্বত দর্শন করিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব বৃন্দাবনের গোবর্দ্ধন পর্ব্বত মনে করিয়া, ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই পর্ব্বত দেখিয়া তাঁহার গোবর্দ্ধন মনে পড়িয়াছিল, এবং সমুদ্র দেখিয়া যমুনা-ভ্রম হইয়াছিল। এই পর্ব্বত হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ-দেব ভাবে মাতোয়ারা হইয়া, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া ডুবিয়াছিলেন; পরে জালিয়াদের জালে লাগাতে, তাহারা তাঁহাকে তুলিয়াছিল। তৎপশ্চাৎ ভক্তগণের হরিনাম-কীর্ত্তনের পর, তাঁহার চৈতন্য-লাভ হয়। নীলাচলে তিনি এইরূপ বহুলীলা করিয়াছিলেন। অনেক গ্রন্থে দেখা যায়, সমুদ্রে পতিত হওয়ার পরেই, তিনি লীলা সম্বরণ করেন। এই মত একেবারেই ভ্রমাত্মক। ইহার পরেও তিনি অনেক লীলা করিয়াছিলেন।

শ্বেতগঙ্গা।

জগন্নাথ-মন্দিরের দক্ষিণ-দরজার সম্মুখ দিয়া, দক্ষিণ দিকে যে রাস্তাটী গিয়াছে, এই রাস্তায় কিছু দূর গেলে,

বাম-পার্শ্বে, রামদাস-মঠ পাওয়া যায়। সেই মঠে রঘুনাথজীর মূর্ত্তি আছে। ইহার নিকটেই রাঘবদাস-মঠ নামে, আর একটী মঠ আছে। ইহা হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলে, বারাহী-দেবীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তার পর চিটকি-মঠ, তাহাতে রাধামোহন বিরাজিত আছেন। এই রাস্তার বামদিকে একটী গলি গিয়াছে, তাহা দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলেই, শ্বেতগঙ্গা নামক বিস্তৃত সরোবর দেখা যাইবে। ইহার দক্ষিণতীরস্থ একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে শ্বেত-মাধব বিরাজিত আছেন। শ্বেত-মাধব সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, শ্বেত রাজা ত্রেতাযুগে শতবর্ষ অনশনে থাকিয়া, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পূজার্চ্চনা দ্বারা বরলাভ করিয়া, ভগবানের স্বারূপ্য লাভ করেন; এবং তদীয় আদি অবতার মৎস্যমূর্ত্তির সহিত, নির্ম্মল স্ফটিকবৎ শ্বেতমাধবরূপে শ্বেতগঙ্গা-সন্নিধানে অবস্থিতি করিতেছেন। ইঁহার দর্শনে মহাপুণ্য হয়। শ্বেত-গঙ্গার জল পাপ-নাশক ও অতি পবিত্র। জগন্নাথতীর্থে যাত্রিগণ, অনবধানতা-নিবন্ধন প্রসাদে পাদস্পর্শ করিয়া, যে অপরাধ করিয়া থাকেন, এই জল-স্পর্শে সেই অপরাধ হইতে মুক্ত হন। যাত্রিগণ জগন্নাথ হইতে প্রত্যাগমন সময়ে, এই জল মস্তকে ধারণ করিয়া পবিত্র হন। শ্বেতগঙ্গা সরোবরটী অতি সুন্দর; চতুর্দ্দিকে পাথরের সিঁড়ি আছে। এই সরোবরটী অত্যন্ত গভীর; মধ্যস্থলে ছোট একটী মন্দির আছে। ইহার উত্তর-পশ্চিম-কোণে একটী জল তুলিবার

কল আছে ; এবং তাহাতে চুঙ্গী বসাইয়া জল তুলিয়া নর্দ্দমা-পরিষ্কার প্রভৃতি কার্য্য করা হয়।

সার্ব্বভৌম বা গঙ্গামাতা-মঠ।

এই শ্বেত-গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে সার্ব্বভৌমের বাড়ী। বাড়ীটি প্রকাণ্ড। একটি মন্দিরের ভিতর রাধারমণ, রাধাবিনোদ, রাধামোহন ও সোণার-গৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সর্ব্বভৌমের নিকট বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের যে স্থানে মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমের নিকট বেদান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানের দেওয়ালে মহাপ্রভুর একটী ষড়্ভুজ মূর্ত্তি ও সর্ব্বভৌমের একটী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মহাপ্রভু ও সর্ব্বভৌমের বেদান্ত-বিষয়ে বিচার, এবং সার্ব্বভৌমকে যে মহাপ্রভু অবশেষে ষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাত্মা বাসুদেব সার্ব্বভৌমের জন্মস্থান নবদ্বীপ। ইনি সেই সময়ে একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই, মহারাজ প্রতাপরুদ্র ইঁহাকে বঙ্গদেশ হইতে অনেক যত্ন সহকারে আনিয়া, নিজের দ্বার-পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে বহু সম্মান করিতেন। যখন শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রথম পুরুষোত্তমে আসিয়া, মন্দিরে প্রবেশ করতঃ, জগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত

হন, এবং পাণ্ডাগণ-কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া, মণিকোঠায় সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন, তখন এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যই প্রভুকে নিজ গৃহে লইয়া যান, এবং শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার মোহ অপনয়ন করেন। তৎপরে, প্রভুর ভৃত্যগণ সেখানে গিয়া মিলিত হইলে, তাঁহাদের নিকট প্রভুর পরিচয় পাইয়া, নিজ বাড়ীতে বিশেষ যত্ন সহকারে প্রভুর সেবা করেন।

প্রভুর সহিত বেদান্ত-বিচারে পরাস্ত হইয়া, তাঁহার ষড়্‌ভুজমূর্ত্তি দর্শনের পর, জ্ঞানী ও তার্কিক-শিরোমণি সার্ব্বভৌম, আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া, প্রভুর নিকট স্তুতিবাদ করিয়া বলিলেন,—"আমি, শুষ্ক-জ্ঞানী ও তার্কিক ছিলাম, কেবল তোমার করুণাতেই আমি তোমাকে চিনিলাম। স্পর্শমণিকে সকলে চিনিতে পারে না, চিনিতে হইলে উহা দ্বারা লৌহকে স্পর্শ করিতে হয়। প্রভো, আমি শুষ্ক তর্ক ও শুষ্ক জ্ঞানের আলোচনা করিয়া, কঠিন লৌহাকারে পরিণত হইয়াছিলাম; তুমি আমাকে স্পর্শ করতঃ পবিত্র সুবর্ণ করিলে। সুতরাং, আমি এখন চিনিতে পারিলাম, তুমি স্পর্শমণি।

সার্ব্বভৌম হইল প্রভুর ভক্ত একজন।
মহাপ্রভুর সেবা বিনা নাহি অন্য মন ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শচীসুত গুণধাম।
এই ধ্যান, এই জপ, এই লয় নাম ॥

(চরিতামৃতে)

শ্রীগৌরাঙ্গের ষড়্‌ভুজ মূর্ত্তি

U. RAY & SONS.

সার্ব্বভৌম বলে আমি তার্কিক কুবুদ্ধি।
তোমার প্রসাদে মোর হৈল সম্পদ্ সিদ্ধি॥
মহাপ্রভু বিনে কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন্ হয়॥
তার্কিক শৃগাল সঙ্গে ভেউ ভেউ করি।
সেই দুখে এবে সদা কহি কৃষ্ণ হরি॥
কাঁহা বহির্ম্মুখ-তার্কিক-শিষ্যগণ-সঙ্গ।
কাঁহা এই সখ্য-সুধা-সমুদ্র-তরঙ্গ॥

প্রভু সার্ব্বভৌমের স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হইয়া, সমস্ত বৈষ্ণবগণের নাম গ্রহণ করিয়া, প্রসাদ বিতরণ করিতে লাগিলেন।

"তবে প্রভু সব বৈষ্ণবের নাম লঞা।
প্রসাদ দেন যেন কৃপা-অমৃত সিঞ্চিয়া॥"

(চরিতামৃত)

সার্ব্বভৌমের মনের সন্দেহ গিয়াছে কিনা, এবং মহাপ্রসাদে সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইয়াছে কিনা, জানিবার জন্য, মহাপ্রভু অতি প্রত্যূষে, সার্ব্বভৌম নিদ্রা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে, মহাপ্রসাদ সহ তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। ভট্টাচার্য্য গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্রই, তাঁহার হস্তে মহাপ্রসাদ অর্পণ করিলেন; তিনিও অবিচলিত-চিত্তে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিতে করিতে বলিতে

লাগিলেন, "শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতম্বা দূরদেশতঃ" ইত্যাদি।

জগন্নাথক্ষেত্রে, এখন পর্য্যন্ত সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি মন্দিরের দক্ষিণে, এবং মন্দিরের ভিতরে দেখিতে পাওয়া যায়।

কাধমোচন শিব।

জগন্নাথদেবের মন্দিরের দক্ষিণ-দ্বারে, যে রাস্তাটি পশ্চিম-দিকে লোকনাথ পর্য্যন্ত গিয়াছে, এই রাস্তার পশ্চিম দিকে অল্প অগ্রবর্ত্তী হইলেই, বাম-পার্শ্বে কপাল-মোচন-শিবের মন্দির দৃষ্ট হয়।

রুদ্রদেব ব্রহ্মার পঞ্চমমুণ্ড ছেদন করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে কোথাও সেই ব্রহ্মকপাল রাখিবার উপযুক্ত স্থান না পাইয়া, পরিশেষে শঙ্খের দ্বিতীয়াবর্ত্ত-স্থানে রাখিয়াছিলেন। তদবধি, সেই ব্রহ্মকপাল, কপালমোচন-শিব-রূপে অবস্থিত আছেন,—ইঁহাকে দর্শন ও পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ নাশ হয়। এই মন্দিরে কপাল-লোচন মহাদেব আছেন। সেই স্থানে আর একটি মন্দিরে গণেশ আছেন। সেই স্থানে একটি কূপ আছে, তাহার নাম মণিকর্ণিকা। সেই স্থানে পার্ব্বতী কুণ্ড আছে, এবং পার্ব্বতী আছেন। এক দিকে ষড়ানন আছেন, এবং আর এক দিকে গণেশ আছেন। ইহার কিছু দূর পশ্চিমে একটী মন্দির আছে, তাহাতে বনাম্র-শিব আছেন।

আর কিছুদূর যাইয়া, ডান ধারে পুলিশ ষ্টেশন আছে। তাহার সম্মুখে একটী কূপ আছে। সেই কূপ পুরী গোস্বামীর কূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

পুরী-গোস্বামীর কূপ।

ইহাকে পরমানন্দ-পুরী গোস্বামীর কূপ বলে। পরমানন্দ-পুরী, প্রভুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্থানীয়; এমন কি বিশ্বরূপের এক অংশ তাঁহাতে বিরাজিত, এরূপ কথাও অনেকে বলিয়া থাকেন। প্রভু পুরীকে অত্যন্ত মান্য করিতেন; আবার পুরীর যথাসর্ব্বস্ব ধন প্রভু। পুরী আপন মঠে বাস করিতেন—সেখানে একটি কূপ খনন করা হইয়াছিল। কূপের জল অত্যন্ত খারাপ, ইহা সকলেই জানিত, প্রভুও তাহা অবগত ছিলেন। কিন্তু এক সময়ে, কোনও অভিপ্রায়-সাধনের জন্য, মহাপ্রভু সেখানে কূপের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কূপের জল কিরূপ হইয়াছে।" পুরী বলিলেন, "অতি অভাগিয়া কূপ, জল অতি মন্দ, কেবল কর্দ্দমময়।" প্রভু এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "একি অবিচার! পুরী গোঁসাইয়ের কূপের জল ভাল নয়, শ্রীশ্রীজগন্নাথ কি কৃপণতা করিবার আর স্থান পাইলেন না? পুরী-গোঁসাইএর কূপের জল স্পর্শ করিলে জীব উদ্ধার হইবে, তাই বুঝি জগন্নাথ মায়া করিয়া জল এত মন্দ করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া, হাসিতে হাসিতে কূপের নিকট দাঁড়াইয়া দুই বাহু তুলিয়া প্রভু বলিলেন,

"হে জগন্নাথ! আমাকে এই বর দাও, যে তোমার আজ্ঞায় গঙ্গাদেবী এই কূপে প্রবেশ করেন।" মহাপ্রভু কৌতুক করিয়া এই কথা বলিলেন; তাঁহার ভক্তগণও কতক সেই ভাবে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। প্রভু বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

পরদিবস প্রাতঃকালে পরমানন্দপুরী দেখেন যে, তাঁহার কূপ অতি-পবিত্র-জলে পূর্ণ হইয়াছে।

আশ্চর্য্য দেখিয়া হরি বলে ভক্তগণ।
পুরী-গোঁসাই হইল আনন্দে অচেতন॥

সকলেই বুঝিলেন যে, কূপে শ্রীগঙ্গাদেবী আগমন করিয়াছেন। তখন ভক্তগণ মিলিয়া গঙ্গার স্তব পাঠ করিতে করিতে, কূপ প্রদক্ষিণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া প্রভুও আসিলেন, এবং সকলে মিলিয়া সেই কূপে স্নান করিলেন।

এই কূপের ভিতর উত্তর দিকে, একটী প্রস্তর খণ্ডে এই কয়েকটী কথা লিখিত রহিয়াছে; যথা—

পুরী গোস্বামীর কূপ।
খনিত চৈঃ তং
চৈঃ ৪১৮।
সংস্কর্ত্রী দাসী মৃণালিনী।

এই রাস্তায় পশ্চিমদিকে কিছুদূর গেলে একটীহনুমানের

মূর্ত্তি পাওয়া যায়; পরে কিছুদূর গেলে লোকনাথের বাড়ী দেখা যায়।

লোকনাথ।

ইনি সমুদ্রের নিকবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। ইঁহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; মন্দিরের পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে দুইটী দ্বার আছে। দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই, প্রথমে একটী অঙ্গন পাওয়া যায়। এই অঙ্গন কতকগুলি বৃক্ষদ্বারা শোভিত। পরে অপর একটী দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়। প্রথমে ছোট একটী মন্দির পাওয়া যায়, তাহাতে চন্দ্রদেব ও সূর্য্যদেব আছেন। অপর একটী মন্দিরে গণেশ আছেন। মাঝখানে লোকনাথের মন্দির। প্রথম স্তম্ভোপরি বৃষ দর্শন, দুইটী কোঠা পার হইয়া, তৃতীয় কোঠাতে একটী গর্ত্তের মধ্যে অন্ধকার-পূর্ণ স্থানে লোকনাথ বিরাজ করিতেছেন। ভিতর বড়ই অন্ধকার-পূর্ণ, প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন। ইহার সম্মুখেই একটী মন্দিরে প্রকাণ্ড একটী ছবি অঙ্কিত আছে, তাহাকে বৈকুণ্ঠেশ্বর বলিয়া থাকে।

লোকনাথের মন্দির-সংলগ্ন উত্তর দিকে ছোট একটী অঙ্গন আছে, তাহাতে ছোট একটী পাদপদ্ম মন্দির আছে। তৎ-সম্মুখে পার্ব্বতীর মন্দির। উত্তর দিকে একটী মন্দিরে একটী বৃষ আছে। পূর্ব্ব কোণে একটী মন্দিরে পঞ্চ পাণ্ডব অর্থাৎ পঞ্চ মহাদেব আছেন।

উত্তর দিকের দরজা দিয়া বাহির হইলেই, সম্মুখে একটী সরোবর আছে, তাহার নাম পার্ব্বতী-সরোবর।

শ্রীরামচন্দ্র, যখন সীতাদেবীর উদ্ধারার্থ লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে করিতে, নীলাচলের পশ্চিমে, শবর-দীপকের বন-মধ্যে উপস্থিত হন, তখন, তথায় অন্য শিবলিঙ্গ না পাইয়া, শবরদিগের দত্ত লাউ প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার্চ্চনা করিয়াছিলেন। লাউদ্বারা পূজা করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে লাউকানাথ বা লোকনাথ বলে। প্রতি বৎসর শিবরাত্রিতে এখানে মহামেলা হয়। উড়িয়াগণ জগন্নাথ অপেক্ষা লোকনাথকে অধিক ভয় করেন। কাহাকেও শপথ করাইবার সময় জগন্নাথের শপথ না করাইয়া, লোকনাথের শপথ করান। তাঁহাদের বিশ্বাস জগন্নাথ অধিক দয়ালু বলিয়া, অন্যায়কারীর শাস্তি প্রায় দেন না; কিন্তু লোকনাথের নিকট সেরূপ হইবার সম্ভবনা নাই। লোকনাথ অতি সত্বরই অন্যায়কারীকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে যে, অন্যায়কারীকে লোকনাথ তাঁহার সর্প পাঠাইয়া দেন।

মার্কণ্ডেয়-সরোবর।

ইহা জগন্নাথের মন্দিরের উত্তর দিকে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। মার্কণ্ডেয় যাইতে, পথে একটী মঠ পাওয়া যায়, তাহার নাম বরিসন্ত মঠ। এই মঠে রামচন্দ্র ও নরসিংহ আছেন। অল্প কিছুদূরে আর একটী মন্দির

আছে, তাহাতে শিব আছেন। ইহার পর মার্কণ্ডেয় সরোবর। সরোবরটী সুবিস্তৃত ও প্রস্তর দ্বারা চতুর্দ্দিকে বাঁধান, ইহার মধ্যস্থলে একটী বেদীর মত হইয়াছে। ইহা অতি পবিত্র তীর্থ বলিয়া ক্ষেত্র-মাহাত্ম্যে বর্ণিত রহিয়াছে। এই স্থানে মার্কণ্ডেয় মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া, এই সরোবরের নাম মার্কণ্ডেয়-সরোবর হইয়াছে। এখানে কতকগুলি মন্দির আছে, তাহার মধ্যস্থলে যে বড় মন্দিরটি, তাহাতে মার্কণ্ডেশ্বর মহাদেব বিরাজিত আছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিক পাথরে বাঁধান রহিয়াছে, মধ্যস্থলে একটী কুণ্ডমধ্যে তিনি বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি মন্দির আছে। পঞ্চপাণ্ডবের মন্দির,—তাহাতে পাঁচটী শিব আছেন; গণেশের মন্দির, তৎসম্মুখেই একটী মহাদেব আছেন; পার্ব্বতীর মন্দির—উত্তর দিকে একস্থানে দুইটী মহাদেব আছেন; গণেশের মন্দির; শিব-মন্দির; একটী সাধুর মন্দির আছে, তাহাতে অনেক দেবতা আছেন—জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, নৃসিংহ, রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, নারায়ণ-চক্র, বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেক আছেন। এই সরোবরের অপর একটী নাম আছে,—হরির খাত বা মার্কণ্ডেশ্বর সরোবর। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ভগবান্ কর্ত্তৃক তীর্থ-নির্ম্মাণে আদিষ্ট হইয়া, অক্ষয়-বটের বায়ু-কোণে সুদর্শন-চক্র দ্বারা এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রতি-বৎসর বারুণী উপলক্ষে এখানে স্নান করিতে হয়।

মৃত্যুঞ্জয়-লিঙ্গ।

হরির খাতের তীরে, মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তি মৃত্যুঞ্জয়-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি এই বিগ্রহের পূজা দ্বারা মৃত্যুকে জয় করিয়া, অন্তিমে মোক্ষ প্রাপ্ত হন। এই লিঙ্গ দর্শনে ও পূজনে মানব মৃত্যুকে জয় করতঃ, অনন্তকাল চরম শান্তিলাভ করে।

মার্কণ্ডেশ্বর-মহাদেব।

ইনি মার্কণ্ডেয়-সরোবর-তীরে প্রতিষ্ঠিত। মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন ইঁহার পাষাণময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। ইঁহাকে দর্শন করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল হয়।

চক্রতীর্থ।

ইহা পুরী-মন্দির হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। সমুদ্রতীর দিয়াও চক্রতীর্থে যাওয়া যায়। সমুদ্রের নিকট একটী কুণ্ডে জল আছে, তাহাকে চক্রতীর্থ বলে, ইহার কিছু উপরদিকে কয়েকটা মন্দির আছে। একটী মন্দিরে চক্রনারায়ণ আছেন ও তাঁহার বাম-ধারে মহালক্ষ্মী ও ডান-ধারে নৃসিংহ আছেন। সেই স্থানে বৃন্দাদেবীর একটী মূর্ত্তি আছে, তাঁহার মস্তকের উপর একটী তুলসী বৃক্ষ রহিয়াছে। প্রবাদ যে, এই স্থানে জগন্নাথের জন্ম হয়, এই নারায়ণ-চক্র তাহার সাক্ষী-স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন।

আর একটী মন্দির আছে, তাহাতে গৌরীশঙ্কর মহাদেব আছেন। অল্পদূরে অপর একটী মন্দির আছে, তাহাতে হনুমানজী আছেন। প্রবাদ আছে যে, এই হনুমান জগন্নাথের আদেশে সমুদ্রকে রক্ষা করিতেছেন। এই হনুমানের অন্য একটী নাম বেড়ী-হনুমান। ইহাকে বেড়ীদিয়া ভগবান্ এইখানে রাখিয়া দিয়াছেন। নিকটেই একটী স্থানে ছোট ছোট সমাধির মত মন্দির আছে। জনশ্রুতি আছে যে, ব্রহ্মহরিদাস এইখানে সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে ইহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আঠার নালা।

ইহা জগন্নাথের মন্দির হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত। আঠার নালার নিকট আলম্বা-দেবীর মন্দির আছে। ইন্দ্রদ্যুম্নের রাণীও তথায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন।

আঠার নালা একটি প্রকাণ্ড পুল, এই পুলের ভিতর দিয়া আঠারটি নালা আছে বলিয়া, ইহার নাম আঠার নালা। আঠার নালাও একটি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে এই পুল সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে যে, পুরীর নিকট দিয়া যে নদী গিয়াছে, তাহার সহিত সমুদ্রের যোগ ছিল। এই নদী এত ভীষণ ছিল যে, তাহা পার হইবার উপায় ছিল না। এই স্থানে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা পার হইবার জন্য, পুল প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে

পারিলেন না। তখন, রাজা ভগবানের আদেশ-অনুসারে তাঁহার আঠারটি পুত্র এই স্থানে কাটিয়া দেওয়ায়, এই পুল প্রস্তুত করিতে পারিলেন। এই পুলের এক একটি নালাতে একটি করিয়া পুত্র-সন্তান কাটিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

এই সম্বন্ধে অপর একটি জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থানে কিছুতেই লোক পার হইতে পারে না বলিয়া, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজার মনে বড় কষ্ট হইল। এই পারে না আসিলে, জগন্নাথ-দর্শন হয় না। রাজা ভক্ত ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ভক্ত-বৎসল ভক্তের কষ্ট দেখিয়া, ভক্তের ইচ্ছা পূর্ণ বরিবার নিমিত্ত এই স্থানটি বাঁধাইয়া দিলেন। এই পুল বহুকালের বলিয়া শুনা যায়। এখানে এখন কেবল নদীর রেখাটি মাত্র রহিয়াছে।

৸

ত্রিতাপহারী বিশ্বেশ্বর কাশী জনাকীর্ণ দেখিয়া, নির্জ্জনে থাকিতে অভিলাষ করতঃ, ভুবনেশ্বরের একাম্রকাননে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নীলাদ্রি-মহোদয়াদি গ্রন্থে ইঁহার মাহাত্ম্য বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। একটী আম গাছ ১০ মাইল ব্যাপিয়া রহিয়াছে বলিয়া, ইহাকে একাম্র-কানন বলে। এখানে বিন্দু-হ্রদ নামে একটী হ্রদ আছে।

বিন্দুহ্রদ দেখিতে অতি মনোহর। সেই হ্রদে স্নান করিয়া, ভুবনেশ্বর প্রভুকে দর্শন করিলে, জীব, জ ; ও
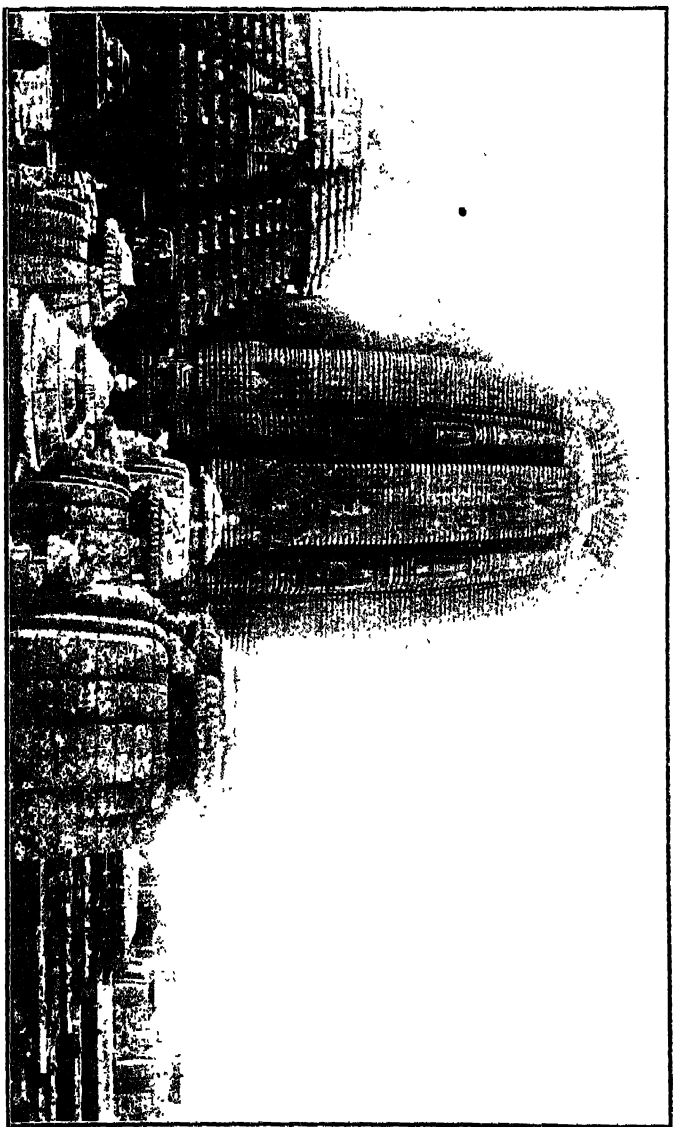
ভুবনেশ্বর মন্দির

অজ্ঞানকৃত পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই প্রভুর মন্দির, প্রথমতঃ সুনিপুণ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহুকাল পরে, সেই মন্দির ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে, উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা ললাটেন্দু-কেশরী ৫৮৮ শকাব্দে, পুনরায় এই মন্দিরের সংস্কার করেন। এই মন্দির দেখিতে অতি সুন্দর। ইহার কারুকার্য্য জগন্নাথের মন্দির অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর। এই কারুকার্য্য দেখিলে, ভারতে প্রাচীন শিল্পের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। এখানকার প্রসাদ জগন্নাথের প্রসাদের ন্যায়, অন্য জাতির স্পৃষ্ট হইলেও পবিত্র ব্রাহ্মণাদির গ্রাহ্য। ভুবনেশ্বরের মন্দির দীর্ঘে ৫২০ ফুট, প্রস্থে ৪৬৫ ফুট। ইহার এক কোণে ভগবতীদেবীর মন্দির আছে।

ভুবনেশ্বরের নিত্য পূজাপদ্ধতি জগন্নাথের পূজাপদ্ধতির ন্যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির, ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে ২।০ মাইল কিম্বা ২॥ মাইল দূরে হইবে।

বিন্দু-হ্রদ বা বিন্দু-সরোবর।

ইহা অতি পবিত্র তীর্থ। পৃথিবীর সকল তীর্থ হইতে বিন্দু বিন্দু করিয়া জল আসিয়া, এই সরোবরকে পূর্ণ করিয়াছিল, সেই জন্যই ইহাকে বিন্দু-সরোবর কহে। ভারতবর্ষে যেরূপ চারিটী ধাম আছে, তদ্রূপ এখানেও, চারিটী সরোবর আছে। যথা—বিন্দু-সরোবর, মানস-সরোবর, পম্পা-সরোবর ও নারায়ণ-সরোবর। ইহাদের প্রত্যেকেই অতি পবিত্র তীর্থ।

প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে ভগবতী অসুর-দলন করিয়া ক্লান্ত হইয়া, এই স্থানে নিদ্রিত হইয়া পড়েন, তৎপর জাগরিত হইয়া মহাদেবের নিকট জল চান্। মহাদেব তখন ত্রিশূল দ্বারা এই সরোবর খনন করেন।

বিন্দুং বিন্দুং সমাহৃত্য নির্ম্মিতস্ত্বং পিণাকিনা।
বৃজিনং হর মে সর্ব্বং বিন্দুসাগর তে নমঃ॥

ভুবনেশ্বরের মন্দির ব্যতীত, এখানে বহু শিব-মন্দির আছে। বোধ হয় কাশী ব্যতীত এত অধিক শিব-মন্দির আর কোথাও নাই। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত মন্দির গুলি প্রধান; যথা—

কোটি-তীর্থেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, কেদারেশ্বর, যমেশ্বর, গোয়ালিনীশানেশ্বর, জলেশ্বর, মুক্তেশ্বর, একাম্রেশ্বর ইত্যাদি। কেদার-গৌরীর নিকটে, গৌরী-কুণ্ড, মরিচাকুণ্ড, দুগ্ধকুণ্ড, এরূপ চারিটী কুণ্ড আছে। এই কুণ্ডে, পর্ব্বতের কোন দূরস্থ ঝরণার জল ভূম্যন্তর্গত পথ দিয়া শেষোক্ত কুণ্ডে আসিয়া পড়ে। এই কুণ্ডের জল অতীব স্বাস্থ্যকর, এবং দুগ্ধ-সন্নিভ বলিয়া ইহাকে দুগ্ধকুণ্ড বলে। এই কুণ্ডের জল পান করিলে পেটের অসুখ দূর হয়। পুরীতে যেমন পেটের অসুখ বৃদ্ধি পায়, এখানে আবার এই কুণ্ডের জলে তাহা দূরীভূত হয়। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া, অনেকে আজকাল ভুবনেশ্বরে বাড়ী করিতেছেন।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি অতি মনোরম স্থান, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলানিকেতন। এখানে বহু গুহা বিদ্যমান আছে, দেখিলে মনে হয়, এইখানে এক সময়ে বহু সাধু বাস করিতেন। এখানে যেমন অনেক শিব-মন্দির আছে, তদ্রূপ আশ্রমও অনেক দৃষ্ট হয়। এই স্থানে এক সময়ে বৌদ্ধদের আধিপত্য ছিল, তাহার অনেক চিহ্ন পাওয়া যায়। এই স্থান ভুবনেশ্বর হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। খণ্ডগিরির উচ্চতা ১২৪ ফিট, উদয়গিরির উচ্চতা ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে এই দুই স্থান অতীব রমণীয়।

সাক্ষি-গোপাল।

একদা দুই বিপ্র তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হন। বড় বিপ্র বৃন্দাবনে গিয়া অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন, ছোট বিপ্র বিশেষরূপ সেবা শুশ্রূষা করিয়া, তাঁহার আরোগ্য সম্পাদন করেন। ইহাতে বড় বিপ্র অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হন, এবং ছোট বিপ্রের নিকট তাঁহার এই মত প্রকাশ করেন। ছোট বিপ্র ইহাতে বলিলেন, "আমা অপেক্ষা আপনারা বংশ-মর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ, অতএব, কেমন করিয়া এই বিবাহ হইতে পারে?" তখন

বড় বিপ্র বলিলেন, “সে যাহাই হউক, আমি অবশ্যই তোমার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব।” ছোট বিপ্র বলিলেন “যদি আপনার একান্তই এইরূপ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি যেরূপ প্রতিশ্রুতি করিলেন, তাহার সাক্ষী রাখা আবশ্যক; কারণ, আপনার পুত্রগণের প্রতিবাদে আপনি হয়ত, পরে ইহা অস্বীকার করিতে পারেন।” বড় বিপ্র তখন সাক্ষী কোথায় পান ভাবিতেছেন; ছোট বিপ্র বলিলেন, “এই যে গোপালজী আছেন—ইঁহাকে আমরা সাক্ষী মানিব।” তখন বড় বিপ্র সেই ঠাকুরের সমক্ষে, ছোট বিপ্রকে তাঁহার কন্যা সম্প্রদান করিবেন বলিয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন।

তৎপর তাঁহারা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। যাহা আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহাই হইল। বড় বিপ্রের পুত্রেরা তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহারা কিছুতেই এরূপ কুলের মর্য্যাদা-নাশক কার্য্য করিতে দিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প হইলেন। পিতাও তখন পুত্রদের ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন। এদিকে ছোট বিপ্র, বড় বিপ্রের প্রতিজ্ঞার কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ আর কোনরূপ জবাব করেন না। বড় বিপ্রের পুত্রেরা ছোট বিপ্রকে বলিলেন, “আপনারা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার সাক্ষী কে?” তখন ছোট বিপ্র বলিল, “স্বয়ং গোপালজী এই প্রতিজ্ঞার

সাক্ষী আছেন।" পুত্রেরা বলিল, "গোপালজী কি এই প্রতিজ্ঞার সাক্ষী দিবেন?" ছোট বিপ্র বলিলেন, "অবশ্যই দিবেন।" বড় বিপ্রের পুত্রেরা তখন মনে করিল, গোপালজীও সাক্ষী দিবেন না, বিবাহও করিতে হইবে না। এইরূপ মনে করিয়া তাঁহারা ছোট বিপ্রকে বলিলেন, "যদি তোমার গোপালজী সাক্ষী দেন, তবে বিবাহ হইবে, নচেৎ হইবে না।"

ছোট বিপ্র এই কথা শুনিয়া, ব্রজধামে চলিলেন, এবং ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া, সমস্ত কথা জানাইলেন এবং বলিলেন, "ঠাকুর সাক্ষ্য দিবার জন্য তোমাকে যাইতে হইবে।" তখন ঠাকুর, ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বিগ্রহের কি চলিবার ক্ষমতা আছে?" ছোট বিপ্র বলিলেন, "বিগ্রহ কি কথা কয়? যখন কথা বলিতে পার, তখন চলিতেও পার।" ভক্তের নিকট তর্কে পরাস্ত হইয়া ঠাকুর বলিলেন, "এ কথা সত্য, কিন্তু যাইবার সময় তুমি পিছনের দিকে চাহিতে পারিবে না। যখনই তুমি পিছনের দিকে চাহিবে, তখনই আমি সেই খানে থাকিয়া যাইব, আর, কোথায়ও যাইব না।" ছোট বিপ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছ, তাহা আমি কিসে বুঝিব?" ঠাকুর বলিলেন, "আমার নূপুর-ধ্বনি তুমি শুনিতে পাইবে।" তৎপর ছোট বিপ্র অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, ভগবান্ নূপুরের রুণু রুণু শব্দ

করিতে করিতে, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ নূপুর-ধ্বনি শুনিয়া আনন্দ-ভরে যাইতেছেন ;—যখন পুরীধামে আসিলেন, তখন নূপুরের ভিতর বালি প্রবেশ করায় আর শব্দ হইল না, শব্দ বন্ধ হইল, আর শুনা গেল না। অমনি ঠাকুরের পশ্চাৎ আগমনে সন্দেহ করিয়া, ব্রাহ্মণ ফিরিয়া তাকাইলেন ; গোপালজীও চিরকালের মত ঐ স্থানে রহিয়া গেলেন। এই স্থান হইতে তাঁহার নিজ গ্রাম বেশী দূর নহে। নিজ গ্রামে গিয়া, সাক্ষী দিবার জন্য ঠাকুরের আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করায়, গ্রামের সমস্ত ভদ্রলোক গোপালজীকে দেখিতে গমন করিলেন, এবং গোপালজীর নিকট বড় বিপ্রের অঙ্গীকার বার্ত্তা অবগত হইয়া, সকলেই হৃষ্টচিত্তে ছোট বিপ্রের সহিত বড় বিপ্রের কন্যার বিবাহ দিলেন। এই সময় হইতে এস্থানের নাম সাক্ষি-গোপাল হইল।

সাক্ষি-গোপাল পুরী হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। অদ্যাপি ছোট বিপ্রের ও বড়বিপ্রের বংশধরগণ বর্ত্তমান আছেন। সাক্ষি-গোপাল গোপাল মূর্ত্তি নহেন, ইনি ত্রিভঙ্গঠাম মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি। এই স্থানে সাক্ষি-গোপালের নবযৌবনের দিন খুব উৎসব হয়।

রায় রামানন্দ।

জগন্নাথ-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে, এই মহাপুরুষের সম্বন্ধে আলোচনার সবিশেষ প্রয়োজন।

জগন্নাথের ইতিহাসে ইনি একজন বিশেষ স্মরণীয় ব্যক্তি। আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিতে গেলে, ইঁহার মত লোক তখন ছিলনা। ইনিই প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন, বিদ্যানগরে ইঁহার প্রধান আবাসস্থান ছিল। কেহ কেহ বলেন যে, ইঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের বাসস্থান বর্দ্ধমান জিলায় ছিল। যাহা হউক, সে বিষয়ের বিচার এই খানে নিষ্প্রয়োজন। আমরা এই গ্রন্থে বিদ্যানগরই রায় রামানন্দের আবাসস্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলাম। তিনি কায়স্থ, কি ক্ষত্রিয়, এই সম্বন্ধে নানা মত চলিতেছে—চৈতন্য-চরিতামৃতে তিনি কায়স্থ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। বহুস্থানে তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া লিখায় আমরাও সেই মতের পক্ষপাতী। ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত রসিক-মোহন বিদ্যাভূষণ মহাশয় যে, রায় রামানন্দকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিলাম না। রায় রামানন্দ কায়স্থই হউন বা ক্ষত্রিয়ই হউন, ইহাতে কিছু আসে যায় না; কারণ, তিনি যে গৌরবে গৌরবান্বিত, যে সম্মানে সম্মানিত, যে অলঙ্কারে ভূষিত, তাহাতে জাতির ভেদাভেদে তাঁহার সম্মানের কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। সুতরাং চৈতন্যচরিতামৃতে যাহা লিখিত আছে, তাহাই আমরা পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহো বিদ্যানগরে॥

শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে ॥
সন্ন্যাসী পণ্ডিত-গণের করিতে গর্ব্ব নাশ।
নীচ শূদ্র দ্বারা করে ধর্ম্মের প্রকাশ ॥
ভক্তিতত্ত্ব প্রেম কহে রায়ে করি বক্তা।
আপনি প্রদ্যুম্ন-মিশ্র সহ হয় শ্রোতা ॥

বিদুরও জাতিতে শূদ্র ছিলেন ; সুতরাং জাতিত্বে, ভক্তিতত্ত্বে এবং মন্ত্রিত্বে তিনি বিদুর-সদৃশ। বিদুর যদিও শূদ্র-জাতীয় ছিলেন, কিন্তু তিনি ভক্তিদ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এত বাধ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী ভগবান্কে কলার খোসাও খাওয়াইয়াছিলেন।

নানোপচার-কৃত-পূজনমার্ত্তবন্ধোঃ
প্রেম্নৈব ভক্তহৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জঠরা পিপাসা
তাবৎ সুখায় ভবতো নন্থ ভক্ষ্য-পেয়ে ॥

দুর্য্যোধন বহু উপচারে সেবাদ্বারা ভগবানের প্রীতি লাভ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু বিদুর এবং বিদুর-পত্নী সামান্য খাদ্য দিয়াই তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রেমই একমাত্র বস্তু, যাহা দ্বারা ভক্ত ও ভগবানের হৃদয় দ্রবীভূত হয়।

এখন বিদুরের সহিত রায় রামানন্দের তুলনা করিয়া দেখা যাউক। ভক্তপ্রবর বিদুর দুর্য্যোধনের মন্ত্রী ছিলেন, রামানন্দও প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন। বিদুর ভক্তিতে ভগবান্‌কে বাঁধিয়াছিলেন, রায় রামানন্দও মহাপ্রভুকে দূরদেশে তাঁহার বাড়ীতে আকর্ষণ করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্তিতে, মন্ত্রিত্বে এবং জাতিত্বে উভয়ের সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে; কিন্তু আমরা রামানন্দকে প্রেমেতে উচ্চ স্থান দিতে চাই। বিদুর দাস্য-ভাবের ভক্ত ছিলেন; রামানন্দ সখ্যভাবের অধিকারী। মহাপ্রভু যখন শ্রীমতীর ভাবে বিভোর থাকিতেন, তখন রামানন্দকে বিশাখা বলিয়া সম্বোধন করিতেন। সুতরাং মহাপ্রভুর সহিত রায় রামানন্দের ব্রজভাবের সখীসম্বন্ধ। দাস্য-ভাব অপেক্ষা সখীভাব উচ্চতর। এই হিসাবে বিদুর অপেক্ষা রামানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব মনে করি।

"যার যেই ভাব সেই সর্ব্বোত্তম।
তটস্থ হইয়া বিচারিলে আছে তারতম॥

(চৈতন্যচরিতামৃত)

ইতঃপূর্ব্বে লিখিয়াছি যে, রায় রামানন্দ গৌরবান্বিত, সম্মানিত ও অলঙ্কৃত; এই তিনটি বিশেষণ দ্বারা তাঁহাকে বিশেষিত করা হইয়াছে। তাঁহার কি সম্মান, কি গৌরব ও কি অলঙ্কার ছিল—যাহাতে তিনি এত বড় উচ্চ পদ লাভ করিতে পারেন, এখন বিচার করিব। রায় রামানন্দের

দুই অবস্থা, একদিকে মহাসংসারী, অপরদিকে মহাসাধু। বহিরঙ্গ লোকের নিকট তিনি রাজমন্ত্রী—নানা জাঁকজমকে বাস করিতেন। সাংসারিক লোক কেহ বুঝিতে পারিত না যে, এত দূর প্রগাঢ় ভক্তি তাঁহার ভিতরে লুক্কায়িত রহিয়াছে। যাঁহাদের বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি ছিল, কেবল তাঁহাদের নিকটই তিনি ধরা দিতেন, তাঁহারাই এই অতলস্পর্শী ভাব বুঝিতে পারিতেন; তাই, মহাপ্রভু দেখা-মাত্রই বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। সাংসারিক লোকের নিকট তিনি মন্ত্রী বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন; অপরদিকে মহাপুরুষদের নিকটেও কৃষ্ণভক্ত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সুতরাং ইনি উভয়দিকেই গৌরব ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যিনি জগতে খ্যাত, তাঁহার আর অন্য যশের প্রোয়জন নাই।

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বর কীর্ত্তি।
কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্ত বলি যাহার হয় খ্যাতি॥

শ্রীমতী যখন অভিসারে গমন করিতেছেন, তখন সখীরা বলিতেছেন, তুই অমনি করে যাস্‌নি; তোকে সাজাইয়া দিই।" শ্রীমতী বলিতেছেন, "আমার অলঙ্কারের প্রয়োজন কি? কৃষ্ণনামই আমার সর্ব্বাঙ্গের আভরণ, আমি অন্য গহনা চাই না। আমার হাতের অলঙ্কার কৃষ্ণসেবা, পায়ের অলঙ্কার তাঁহার নিকট যাওয়া, চক্ষুর অলঙ্কার তাঁহার

রূপ-দর্শন, কর্ণের অলঙ্কার তাঁহার গুণ-শ্রবণ, মুখের অলঙ্কার তাঁহার নাম-কীর্ত্তন ; সুতরাং আমার অন্য অলঙ্কারের আর প্রয়োজন নাই। রামানন্দেরও এই অলঙ্কার। এই অলঙ্কার যাঁহার ভূষণ, তাঁহার অন্য অলঙ্কারের কিছু প্রয়োজন নাই।

এখন পাঠক দেখুন, রামানন্দ সাংসারিক হিসাবে—মন্ত্রিত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত ; কৃষ্ণভক্তের নিকট তিনি কৃষ্ণভক্ত বলিয়া খ্যাত ও সম্মানিত, আর কৃষ্ণসেবা তাঁহার অলঙ্কার, সুতরাং, সেই অলঙ্কারে তিনি অলঙ্কৃত বা ভূষিত।

রায় রামানন্দ বিষয়ী-সমাজে সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী ও প্রগাঢ় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। পূর্ব্বে মন্ত্রিনিয়োগ-সম্বন্ধে নিয়ম ছিল—যাঁহারা নানা-শাস্ত্র-বিশারদ, পণ্ডিত, স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ, শুচি ও পবিত্র-চরিত্র, রাজনৈতিক-বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইতেন। রায় রামানন্দও সেই শ্রেণীর মন্ত্রী ছিলেন। রায় রামানন্দের পণ্ডিত্যের পরিচয়, তাঁহার লিখিত জগন্নাথ-বল্লভ নামক নাটকে প্রকাশিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক-গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীত-গোবিন্দ।
স্বরূপ-রামানন্দ-সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ॥

রায়ের নাটক-গীতিই জগন্নাথবল্লভ নাটক। এই স্থলে উক্ত নাটকের দুই একটী গান উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

মৃদুতর-মারুত-বেল্লিত-পল্লব-বল্লী-বলিত-শিখণ্ডম্।
তিলক-বিড়ম্বিত-মরকত-মণিতল-বিম্বিত-শশধর-খণ্ডম্॥
যুবতি-মনোহর-বেশম্।
কলয় কলানিধিমিব ধরণীমনু পরিণত-রূপ-বিশেষম্॥
খেলা-দোলায়িত-মণি-কুণ্ডল-রুচি-রুচিরানন-শোভম্।
হেলা-তরলিত-মধুর-বিলোচন-জনিত-বধূজন-লোভম্॥
গজপতি-রুদ্র-নরাধিপ-চেতসি জনয়তুমুদমনুবারম্।
রামানন্দ-রায়-কবি-ভণিতং মধুরিপু-রূপমুদারম্।

লোচনদাস ঠাকুর ইহার যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহাও নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

যুবতী-মনোহর ওনা বেশ গো।
অবনী-মণ্ডলে সখি চাঁদের উদয় যেন
সুধাময় রূপের বিশেষ গো॥
চূড়ার উপরে শোভে নানা ফুলদাম গো
তাহে উড়ে ময়ূরের পাখা।
যেন, চাঁদের উপরে চাঁদ উদয় করিল গো
ললাটে চন্দন-বিন্দু রেখা॥

সঘনে দোলায় কাণে মকর-কুণ্ডল গো
কুলবতীর কুল মজাইতে।
উহার নয়ন-কুসুমশর মরমে পশিল গো
ধৈরয ধরিতে নারে চিতে॥
এমন সুন্দর রূপ কোথা হ'তে এল গো
মনোভব ভুলিল দেখিয়া।
লোচন মজিল সই ও রূপ সাগরে লো
কি বা সে নাগর বিনোদিয়া॥

জগন্নাথবল্লভের আর একটী গান উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

চিকুর-তরঙ্গিত-ফেণপটলমিব
কুসুমং দধতী কামং।
নটদপসব্যদৃশা দিশতীব চ
নর্ত্তিতুমতনুমবামম্॥
রাধা মাধববিহরা।
হরিমুপগচ্ছতি মন্থর-পদগতি
লঘু লঘু তরলিত-হারা।
শঙ্কিত-লজ্জিত- রসভর-মধুর-
দৃগন্ত-লবেন।
মধু-মথনং প্রতি সমুপহরন্তী
কুবলয়-দাম রসেন॥

গজপতি-রুদ্র-নরা- ধিপমধুনাতন-
মদনং মধুরেণ।
রামানন্দ-রায়-কবি- ভণিতং সুখয়তু
রস-বিসরেণ॥

শ্রীরামরায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের সহিতও সেইরূপ সম্বন্ধ। সুতরাং শ্রীরামানন্দের চরিত্র আলোচনা করিতে গেলেই, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে, যে লীলা-কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার জীবনের প্রধান অঙ্গ।

সহজে চৈতন্যচরিত ঘন-দুগ্ধ-পূর।
রামানন্দ-চরিত্রে তাহা খণ্ড প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলা তাতে কর্পূর মিলন।
ভাগ্যবান্ যে বা সেই করে আস্বাদন॥

কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে, রায় রামানন্দ ও শ্রীগৌরাঙ্গের মিলন-লীলা যেরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অতি অপূর্ব্ব। ইহাতে অতি নিগূঢ়তম ব্রজরহস্য জগতের নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—তাহাতে প্রেমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, ও কৃষ্ণতত্ত্ব এই মিলন-লীলায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ অংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া, রায় রামানন্দের জীবনীর দিগ্‌দর্শন করান হইল।

মহাপ্রভু সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়াই, দক্ষিণ-তীর্থ-যাত্রায় গমনের জন্য উৎকন্ঠিত হইলেন।

নিত্যানন্দ কহে ঐছে কৈছে হয়।
একাকী যাইবে তুমি কে ইহা সহয়॥
এক দুয়ে সঙ্গে চলুক না পড়ে হট রঙ্গে।
যারে কহ সেই দুই চলুক তোমার সঙ্গে॥
প্রভু কহে, তুমি সব রহ নীলাচলে।
দিন কত তীর্থ আমি ভ্রমিব একলে॥
নিত্যানন্দ প্রভু কহে যে আজ্ঞা তোমার।
দুঃখ সুখ যে হোক্ কর্ত্তব্য আমার॥
কিন্তু এক নিবেদন করি আর বার।
বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার॥
কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ।
ইঁহা সঙ্গে করি লহ এই নিবেদন॥

প্রভু স্বীকার করিলেন এবং সার্ব্বভৌমের নিকট বিদায় লইতে চলিলেন। কিন্তু তাঁহার আগ্রহে আরও কিছুদিন থাকিতে হইল।

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি করিবে গমন।
দিন কত রহ দেখি তোমার চরণ॥
তাঁহার বিষয়ে প্রভু শিথিল হইল মন।
রহিলা দিবস কত না করি গমন।

তখন সর্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"যদি আমাদিগকে নিতান্তই উপেক্ষা করিয়া, দক্ষিণ-বনে যাত্রা করেন, তাহা হইলে একটী নিবেদন—বিদ্যানগরে শ্রীল রায় রামানন্দ, রাজা প্রতাপ-রুদ্রের অমাত্য, অতি সুপণ্ডিত এবং পরম ভক্ত। তাঁহার ন্যায় রসিক, প্রেমিক ও ভক্ত আর নাই। তিনি আপনার কৃপালাভের উপযুক্ত পাত্র। আপনি কৃপা করিয়া, তাঁহাকে দর্শন দান করেন, ইহাই আমার নিবেদন, বিষয়ী বলিয়া তাঁহাকে উপেক্ষা করিবেন না। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

তবে সার্ব্বভৌম কহে প্রভুর চরণে।
অবশ্য পালিবে প্রভু মোর নিবেদনে॥
রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে।
অধিকারী হয়েন তিঁহ বিদ্যানগরে॥
শূদ্র বিষয়ী জ্ঞানে উপেক্ষা না করিবে।
আমার বচনে তাঁরে অবশ্য মিলিবে॥
তোমার সঙ্গের যোগ্য তিঁহ একজন।
পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তাঁর সম॥
পাণ্ডিত্য আর ভক্তি-রস দোঁহের তিঁহ সীমা।
সম্ভাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা॥
অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তাঁর না বুঝিয়া।
পরিহাস করিয়াছি তাঁরে বৈষ্ণব জানিয়া॥

তোমার প্রসাদে এবে জানিনু তাঁর তত্ত্ব।
সম্ভাষিলে জানিবে তাঁর যেমন মহত্ত্ব॥
অঙ্গীকার করি প্রভু তাহার বচন।
তারে বিদায় দিতে তারে কৈল আলিঙ্গন॥
এত বলি মহাপ্রভু করিয়া গমন।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল তাহে সার্ব্বভৌম॥
তারে উপেক্ষিয়া কৈল শীঘ্র গমন।
কে বুঝিতে পারে মহা প্রভুর চিত্তমন॥
মহানুভাবের চিত্তের স্বভাব এই হয়।
পুষ্প-সম কোমল কঠিন বজ্রময়॥
"বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো নু বিজ্ঞাতুমর্হতি॥"
(উত্তর-রামচরিত)

যদিও মহাপ্রভুর দক্ষিণাত্য-ভ্রমণ, আমাদের গ্রন্থের বিষয় নহে, কিন্তু রায় রামানন্দের সম্মিলনের অনুরোধে, একবার পাঠকদের বিত্যানগরে যাইতে হইবে। একবার শুনুন যে, কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব রামানন্দ এবং মহাপ্রভুর আলাপে প্রকটিত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস যে, এরূপ সংক্ষেপে এরূপ গভীর তত্ত্বের আলোচনা এবং মীমাংসা, অন্য কোন শাস্ত্রে পর্য্যালোচিত হয় নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নীলাচল হইতে

সার্ব্বভৌমাদি সমস্ত ভক্তের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, গোদাবরীর দিকে চলিলেন। জগন্নাথ হইতে বিদ্যানগর পর্য্যন্ত, মহাপ্রভু যেখানে যে দেবালয়ে উপস্থিত হইতেন, সেইখানেই, ভাবের আবেশে নাম সংকীর্ত্তনাদি করিতে থাকিতেন। একে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি অতি সুন্দর, তাহাতে আবার ভাবের আবেশ। রূপলাবণ্য যেন উছলিয়া পড়িতেছে। এই রূপ দেখিবামাত্রই, সমস্ত গ্রামের লোক, প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিবার জন্য, এবং নাম শ্রবণ করিবার জন্য সমবেত হইত।

প্রথমতঃ তিনি আলালনাথে উপস্থিত হইলেন। এই আলালনাথে চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত। এই মূর্ত্তি অতি সুন্দর। এইরূপ বহু স্থানে বহু দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া, নামকীর্ত্তন করিলেন এবং সমস্ত দেশেই তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রচারে কোন কষ্ট নাই—বাগ্‌বিতণ্ডা নাই—প্লাটফরমে বক্তৃতা নাই, যেন মহাপ্রেমের প্রবাহেতে সমস্ত দেশ ভাসাইয়া নিয়া যাইতেছেন। দক্ষিণদেশে ধর্ম্মপ্রচারই তাঁহার ভ্রমণের উদ্দেশ্য। তাঁহার দর্শন-মাত্রই সমস্ত দেশ বৈষ্ণব হইল।

এই ভাবে তিনি রায়-রামানন্দকে দেখিবেন বলিয়া, বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলেন। গোদাবরী-তীরে মহাপ্রভু আসন পরিগ্রহ করিলেন, ধ্যানস্থ হইয়া নাম করিতেছেন, এমন সময়, রায় রামানন্দ তাঁহার তুরী, ভেরী, ডঙ্কা বাজাইয়া

স্নানের জন্য নদীর ঘাটে আসিতেছেন। নদীর তীরে আসিয়া, এই নূতন সন্ন্যাসীর রূপ দেখিয়াই, তিনি মোহিত হইলেন। তিনি সন্ন্যাসীর বহিরাবরণ দেখিয়া ভুলিবার লোক ছিলেন না। অনেক সন্ন্যাসীকে তিনি উপদেশ দিতেন, কিন্তু এই সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্রই যেন, চির-পরিচিতের ন্যায় তিনি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার মন প্রাণ যেন টানিয়া লইল—পরিচয়ের প্রয়োজন হইল না—অমনি পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন; এবং প্রেমে বিভোর হইয়া উভয়েই মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুকাল পরে উভয়েই চৈতন্য লাভ করিলেন, তখন মহাপ্রভু রায় রামানন্দকে বলিতেছেন, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

সার্ব্বভৌম সঙ্গে মোর মনঃ নির্ম্মল হইল।
কৃষ্ণভক্তি তত্ত্বকথা তাঁহারে পুছিল॥
তিঁহো কহে আমি নাহি জানি কৃষ্ণকথা।
সবে রামানন্দ জানে তিঁহো নাহি হেথা॥
তোমার ঠাঁই আইলাম তোমার মহিমা শুনিয়া।
তুমি মোরে স্তুতি কর সন্ন্যাসী জানিয়া॥
কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥
সন্ন্যাসী বলিয়া মোরে না কর বঞ্চন।
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব কহি পূর্ণ কর মন॥

এখন, অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেমের যে মহাতত্ত্ব, তাহা মহাপ্রভু রাম রায়ের মুখে প্রকটন করিতেছেন। সেই তত্ত্ব এখানে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।—

প্রভু কহে আইলাম শুনি তোমার গুণ।
কৃষ্ণ-কথা শুনি শুদ্ধ করাইতে মন॥
যৈছে শুনিল তৈছে দেখিল তোমার মহিমা।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমরস জ্ঞানের তুমি সীমা॥

এই কথার পর মহাপ্রভু তাঁহাকে সন্ধ্যার পর আসিতে বলিলেন;—রায় রামানন্দও সন্ধ্যার পর আসিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং প্রভুর পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে বিদায় দিয়া, এক ভক্ত ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গমন করিলেন। উভয়েই অতি উৎকণ্ঠার সহিত দিবাভাগ অতিবাহিত করিলেন। মহাপ্রভু ভাবিতেছেন, কতক্ষণে রাম রায় আসিবে, এবং তাহার মুখে কৃষ্ণপ্রেমের তত্ত্ব শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। অপরদিকে, রাম রায়ও ভাবিতেছেন, কতক্ষণে সন্ধ্যা হইবে, এবং কতক্ষণে এই অসামান্য মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। দিন কাটিয়া গেল, সন্ধ্যা আসিল—পরমভক্ত রামরায় মহাপ্রভুর চরণোপান্তে উপস্থিত হইয়া, দীনভাবে উপবেশন করিলেন। তখন ধর্ম্মকথা আরম্ভ হইল। মহাপ্রভু বলিলেন, তোমার
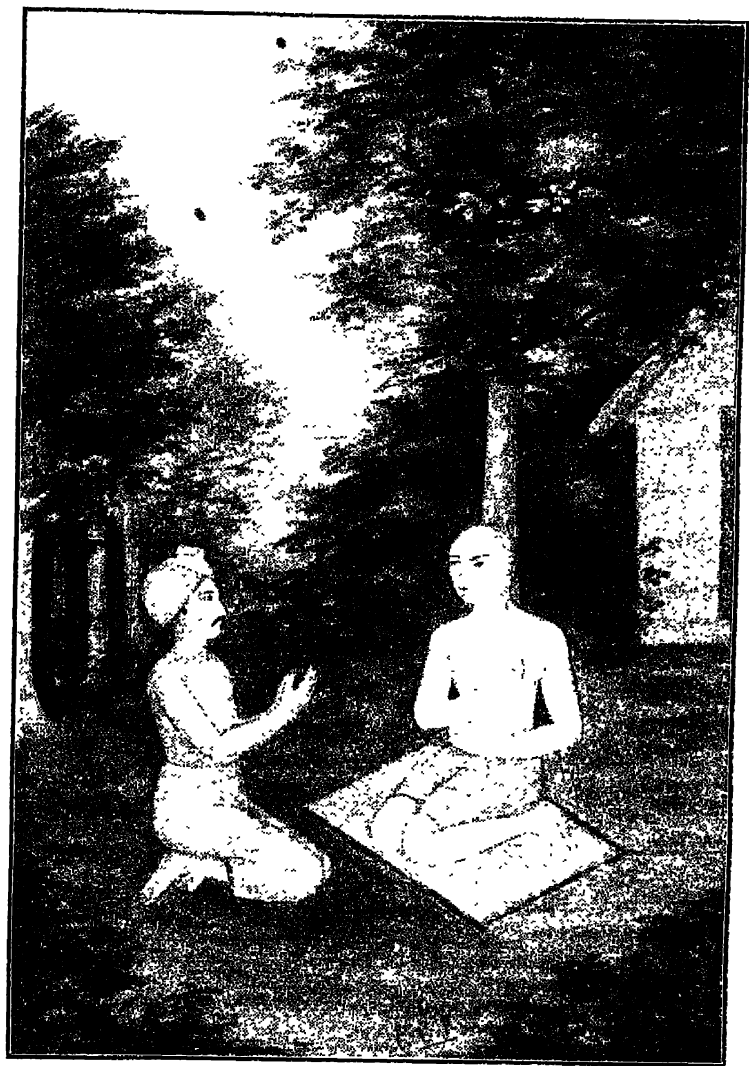
গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও শ্রীরায় রামানন্দ

মুখে ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য পিপাসু হইয়া, এইখানে উপস্থিত হইয়াছি। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রভু কহে রায় কহ সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
"বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যস্তৎ-তোষ-কারণম্" ॥

(বিষ্ণুপুরাণ)

অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচারী পুরুষ কর্ত্তৃকই সেই পরম পুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হয়েন। ইহাতেই তাঁহার পরিতুষ্টি হয়; এতদ্ব্যতীত তাঁহার পরিতোষের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্ব-সাধ্যসার॥

প্রমাণ যথা—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং" ॥

(গীতা)।

ভগবান্ বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা কর, যাহা আহার কর, যাহা হবন কর, যাহা দান কর, যাহা তপস্যা কর, তাহা আমাতেই অর্পণ কর।

প্রভু ইহাতেও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না,—বলিলেন, ইহাও বাহ্য।

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে সর্ব্বধর্ম্ম-ত্যাগ সর্ব্ব-সাধ্য-সার।

প্রমাণ যথা—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ"॥
(গীতা)।

ভগবান্ বলিতেছেন, "সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও। আমিই তোমাকে পাপ হইতে রক্ষা করিব। তজ্জন্য শোক করিও না। সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও,—ইহা দ্বারা গীতার অন্য শ্লোকে যে বলিয়াছেন—

"যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় ভজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥"

সেই বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। অন্যান্য দেবতার ভজনা করিয়া যে ফল পাইবে, একমাত্র আমাকে ভজনা করিলে, তাহা অপেক্ষা, অধিকতর ফল লাভ হইবে।

অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন যে, নিত্যনৈমিত্তিকাদির অননুষ্ঠানে পাপশ্রুতি আছে, সেই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ"—"তোমার কোনও ভয় নাই, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।"

ইহাতেও মহাপ্রভুর তৃপ্তি হইল না,—আবার বলিলেন, "ইতঃপর কি আছে বল।"

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তি সাধ্য-সার॥

প্রমাণ যথা—

"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥"

সর্ব্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান, সদা প্রসন্নচিত্ত, কোন অনুশোচনা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, সমস্তভূতে সমজ্ঞান—এই অবস্থা লাভ হইলে, পরাভক্তিলাভের অধিকারী হওয়া যায়।

এখন পাঠক বিবেচনা করুন, আমরা গীতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছি; তথাপি মহাপ্রভুর তৃপ্তি হইতেছে না—তিনি ইহাতেও বলিলেন, ইহাও বাহ্য।

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞান-শূন্য-ভক্তি সাধ্য-সার॥

প্রমাণ যথা রূপগোস্বামীকৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে—

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা"॥

জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিতে প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন না দেখিয়া, রামরায় জ্ঞান-কর্ম্ম-বর্জ্জিত ভক্তির অবতারণা করিলেন। ইহা

শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিলেন, ইহা হয়। এখন তাঁহারা ভক্তি-রাজ্য ছাড়াইয়া প্রেম-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্য-ভক্তি সর্ব্বসাধ্যসার॥

যথা—

"যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিংবা দাসানামবশিষ্যতে॥"

যাঁহার নাম শ্রুতিমাত্রে লোক নির্ম্মল ও নিষ্পাপ হইয়া যায়। এই জগতে যে তাঁহার দাস হয়, তাহার আর কি অভাব থাকে। শ্রীভগবানের দাসগণের পক্ষে সমস্তই হস্তস্থিত আমলকবৎ করতলগত।

দাস্য-ভক্তির কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, ইহাও হয়; ইহার উপর যাহা থাকে তাহা বল।

প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে সখ্য-প্রেম সর্ব্ব-সাধ্য-সার॥

যথা চরিতামৃতে—

সখা শুদ্ধ-সখ্যে কর স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥

এই প্রেমের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল ব্রজ-বালকগণ। এই ভাবে "ভগবান্" বোধ নাই,—শ্রীকৃষ্ণ এবং

গোপ-বালকদিগের মধ্যে সমান ভাব। প্রভু এই ব্রজরসের কথা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলেন। তাই বলিতেছেন—

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্ব-সাধ্য-সার॥

শ্রীমদ্‌ভাগবৎ বলিতেছেন—

"নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এব মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পাপৌ যস্যাস্তনং হরিঃ"॥

নন্দগোপ কি মহৎ কার্য্যই করিয়াছিলেন, যাহাতে ভগবান্‌কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইলেন; মহাভাগ্যবতী যশোদাই বা কি তপস্যা করিয়াছিলেন, যাহার ফলে পূর্ণব্রহ্ম হরি তাঁহার স্তনপান করিলেন। সখ্যেতে ভক্তের সহিত ভগবান্ সমানভাবে খেলা করিয়া থাকেন;—এইভাবে বিভোর হইয়া গোপবালকগণ উচ্ছিষ্ট ফল, শ্রীকৃষ্ণের মুখে তুলিয়া দিয়াছেন। বাৎসল্যেতে নিজে ন্যূন হইয়া ভক্তকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া থাকেন। এই প্রেমেতে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে নন্দের "বাধা" বহিয়াছিলেন;—এই ভাবেতে শ্রীমতী যশোমতী তাঁহাকে যষ্টিহস্তে তাড়না করিয়াছেন, রজ্জু দ্বারা তাঁহাকে উদূখলে বন্ধন করিয়াছেন। এই প্রেমেতে ঈশ্বরবোধ একেবারে থাকে না;—ভক্ত স্নেহ-পরবশ হইয়া, নিজেকে পিতামাতার ভাবে এবং ভগবান্‌কে পুত্রভাবে সেবা করিয়া থাকেন। ব্রজধামে ব্রজেশ্বরী,

ব্রজরাজ নন্দ, রোহিণী, উপনন্দ প্রভৃতি সকলে, এই রসের ভক্ত ছিলেন।

কেবল যে, ব্রজধামেই এই রসের রসিক ছিলেন, তাহা নহে, অন্য সময়েও এইরূপ ভক্তের আবির্ভাব দেখা যায়। ভক্তমালে এইরূপ একজন স্ত্রীলোক-ভক্তের কথা লিখিত আছে। তিনি যশোমতী কর্ত্তৃক কৃষ্ণের উদূখলে বন্ধনের বিষয় শুনিয়া অচৈতন্য হয়েন। যশোমতী কৃষ্ণের কোমল অঙ্গে, কি করিয়া এত আঘাত দিলেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই রসেতে মহাপ্রভু সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার আকাঙ্ক্ষা আরও বৃদ্ধি হইল ;—তিনি বলিলেন অতঃপর কি আছে বল।

প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে মধুর-ভাব সর্ব্ব-সাধ্য-সার ॥

যথা চরিতামৃতে—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণ-প্রাপ্তি এই প্রেম হইতে।
এই প্রেমের কহে ভাগবতে ॥
এই প্রেমের অনুরূপ না পারি ভজিতে।
অতএব ঋণ হয় কহে ভাগবতে ॥
"ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপিবা।

যা মাংভজন্ দুর্জ্জর-গেহ-শৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা" ॥

গোপীদের অনুরূপ ভজন করিতে অসমর্থ হইয়া, ভগবান্ গোপীদের প্রেম-ঋণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন ; অতএব, কান্ত-ভাবই সর্ব্ব-সাধ্য-সার।

এই রসের দৃষ্টান্ত ব্রজগোপী ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টি হয় না। ইহার মধ্যে, আবার শ্রীমতী রাধিকা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। তাঁহার ভাবে ঋণী হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে দাসখত দিয়াছিলেন। রাধার প্রেমই সাধ্য-শিরোমণি। তাহার প্রমাণ যথা পদ্মপুরাণে—

"যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা ॥"

শ্রীমতী যেমন কৃষ্ণের প্রিয়া, তাহার কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ প্রিয়। সকল গোপীর মধ্যে শ্রীমতী রাধিকাই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা। এই জন্যই ত্রিজগতে রাধাপ্রেমের উপমা নাই।

এইরূপে, শ্রীরামরায় দেখাইলেন, কান্তভাবে কৃষ্ণভজন সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতম। মহাপ্রভু ইহার পর স্বীকার করিলেন, ইহাই সাধ্য-সাধনের চরমসীমা বটে। তবু মহাপ্রভু বলিলেন, "ইহার পর আরও কিছু বল।" তখন রামরায় বলিলেন, "ইহার পর যে কোনও তত্ত্ব আছে, তাহা

আমি জানি না, তবে তোমার কৃপা হইলে, কিম্বা তুমি জানাইলে বলিতে পারি। এ পর্য্যন্ত আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাও তোমার কৃপায়। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুকের পাঠ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট॥
হৃদয়ে প্রেরণ করাও জিহ্বায় কহাও বাণী।
কি করিয়ে ভালমন্দ কিছুই না জানি॥

প্রভু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "আমাকে সন্ন্যাসী বলিয়া তুমি বঞ্চনা করিও না।" রামরায় বলিলেন,

আমি নট তুমি সূত্র-ধার।
যেমতে নাচাও তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি বীণাধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥

এই কথা বলিয়া, অনেক চিন্তার পর বলিলেন, "আমার স্বরচিত একটী গান আছে, তাহাই শুনাইতেছি। দেখুন আপনার মনোমত হয় কিনা।"

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥

এ সখি সে সব প্রেম-কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
নাখোঁজলু দূতী না খোঁজলু আন
দুঁহুকে মিলনে মধ্যেত পাঁচ-বাণ॥
অবশোই বিরাগ তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ প্রেমক ঐছন রীতি॥

এই গীতের অর্থ অতি গভীর। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহাশয় একরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে অনুবাদ করিতেছি।—নায়ক নায়িকার নয়ন-ভঙ্গি দ্বারা পূর্ব্ব-রাগের সঞ্চার হইল। তাহার প্রত্যহ বৃদ্ধি হইতে চলিল, তাহার শেষ হইল না। তিনি আমার পতি ও আমি তাঁহার পত্নী, ইত্যাকার ভাবেতে আমাদের প্রণয়ের সঞ্চার হয় নাই; তথাপি আমাদের উভয়ের মন কন্দর্পের দ্বারা পিষ্ট হইয়া মিলিত হইল, এই আমি জানি। অতএব, এই সকল কথা শ্রীকৃষ্ণকে বলিবে। তুমি শ্রীকৃষ্ণের বিস্মরণশীল দূতী—তোমাদের স্বভাব, ভুলিয়া যাওয়া; তাই তুমিও ভুলিয়া যাইতে পার। যখন আমাদের প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, তখন, দূতী অথবা অন্য কেহ আমাদের মিলন করায় নাই, কেবল কামদেবই আমাদের মিলনের মধ্যস্থ-স্বরূপ ছিলেন। এখন, প্রেমের শিথিলতা হইয়াছে, তাই, তুমি দূতী হইয়াছ। সুপুরুষের এই রীতি।

এই গানটীতে বহু তত্ত্ব নিহিত আছে। প্রথম দুই পংক্তি দ্বারা প্রেমের নিত্যত্ব প্রমাণিত হইয়াছে। তৎপরের পংক্তিতে "না সো রমণ, না হাম রমণী" এই পদ দ্বারা রাধাকৃষ্ণের স্ত্রীপুংস্ত্বাদি-রাহিত্য বর্ণিত হইয়াছে। "দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি", এই পংক্তিদ্বারা শ্রীউজ্জ্বল-নীলমণি-কার প্রেম-বিলাস-বিবর্ত্ত-প্রতিপাদনার্থ যে একটী শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে হয়। শ্লোক যথা—

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুণী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্।
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্॥
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে।
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গার-কারু-কৃতী॥

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে মহাভাবের উদাহরণে বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে গোবর্দ্ধনপতি, শৃঙ্গার-রসরাজ! তুমি অতি সুপণ্ডিত শিল্পী। তোমার এবং শ্রীরাধার অন্তর এবং বাহির সাত্ত্বিক-বৃত্তিদ্বারা দ্রব করিয়া, উভয়ের চিত্তকে অভিন্নভাবে সংযোজিত করিয়াছ, যেন ব্রহ্মাণ্ডরূপ মন্দিরমধ্যে চিত্র করিবার নিমিত্ত, নবানুরাগ-হিঙ্গুলের দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে।

এই শ্লোক দ্বারা রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের একত্ব প্রমাণিত হইয়াছে, "দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি" ইহা দ্বারাও

উক্ত ভাবেরই অভিব্যক্তি হইয়াছে। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নহে, শাস্ত্র পরমাণ ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥
মহাভাব-স্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি ॥

ইহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন, "এই কথা আর প্রকাশ করিও না।" ইহা বলিয়া শ্রীহস্তে মুখ আচ্ছাদন করিলেন।

প্রভু কহে সাধ্য-বস্তু-অবধি এই হয়।
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয় ॥

এখন, প্রভু এই কথা ছাড়িয়া, সাধনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্ব, শ্রীরাধাতত্ত্ব কি, তাহার ব্যাখ্যা করিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর।

এই তত্ত্ব সবিস্তারে লিখিলে গ্রন্থের কলেবর অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়; সুতরাং আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। আর কয়েকটী কথা লিখিয়াই এই তত্ত্ব শেষ করিব। এখন, রামরায় প্রভুকে এক নিগূঢ় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন;—সে প্রশ্নটী এই, যথা চরিতামৃতে—

পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুই শ্যাম-গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিকা।
তার গৌর-কান্ত্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা॥
তাতে এক প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন॥
এইমত দেখি তোমা হয় চমৎকার।
অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার॥

রায় রামানন্দ, ইতিমধ্যে একদিন পূজায় বসিয়া, তাঁহার ইষ্টধ্যান করিতেছিলেন; ধ্যানে সহসা শ্যামরূপ ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসীবেশধারী শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তিতে মিশিয়া গেলেন। শ্যামসুন্দরের পরিবর্ত্তে গৌর-সুন্দর হৃদয়ে উদিত হইলেন। শ্রীরামরায় বিস্মিতভাবে চক্ষুঃ উন্মীলিত করিলেন। আবার পুনরায় ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন—এই মূর্ত্তি হৃদয়পট অধিকৃত করিয়া বসিয়া আছে। এখনও তাঁহার এই ঘটনা স্মরণ হইল। শ্রীমুখ হইতে এই কথা পরিষ্কার করিবার জন্য, এবং জগৎকে জানাইবার জন্য, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রভু ইহার উত্তরে, প্রকৃত কথা না বলিয়া, অন্যভাবে উত্তর দিলেন।

কৃষ্ণ প্রতি তোমার অতি গাঢ় প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥

মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণস্ফূরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তাঁর মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্রে হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥
রাধাকৃষ্ণে তোমার মহা প্রেমা হয়।
যাহা তাহা রাধাকৃষ্ণ তোমারে স্ফূরয়॥

রামরায় যে উত্তর দিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি।

রায় কহে প্রভু তুমি ছাড় ভারি ভুরি।
মোর আগে নিজ তুমি না করিও চুরি॥
রাধার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
অনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলা ত্রিভুবন॥

এইবার প্রভু ধরা পড়িলেন, আর গোপন থাকিতে পারিলেন না। ব্রজগোপীদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরিয়া, যেমন লুকাইতে পারিলেন না, আবার, তাঁহার দ্বিভুজ মুরলী-ধর মূর্ত্তি ধরিতে হইল। এখানেও তাহাই হইল, যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

তবে হাসি তাঁরে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥
দেখি রামানন্দ হইল আনন্দে মূর্চ্ছিত।
ধরিতে না পারি দেহ পড়িলা ভূমিতে॥

এইক্ষণ, রামরায় যাহা দেখিলেন, তাহা রসরাজ মহাভাব, দুই একরূপ। এই ভাব দেখাইয়া প্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

আলিঙ্গন করি প্রভু কৈল আশ্বাসন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোন জন॥
মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইনু তোমারে॥

তুমি এই কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না—তুমি এক বাতুল, আর আমি এক বাতুল। এইরূপে সমস্ত প্রেমতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, রায় রামানন্দের মুখ দিয়া মহাপ্রভু প্রকটিত করিলেন। রায় রামানন্দ বুঝিতে পারিলেন, এখন তিনি বিদ্যানগর ত্যাগ করিয়া দক্ষিণামুখে যাইবেন। রামানন্দ মহাপ্রভুকে আরও কয়েকদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভু বলিলেন—

নীলাচলে তুমি আমি রব এক সঙ্গে।
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণ-কথা -রঙ্গে

রামরায়ের প্রার্থনানুসারে মহাপ্রভু আরও কয়েকদিন রহিলেন, এবং পরমার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইল। চৈতন্যচরিতামৃতে রায় রামানন্দ ও মহাপ্রভুতে আরও কতিপয় প্রশ্নোত্তরের উল্লেখ আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

কীর্ত্তিগণ-মধ্যে জীবের কোন বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যাহার হয় খ্যাতি॥
সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যার সেই মহাধনী॥
দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণ-ভক্ত-বিরহ বিনা দুঃখ নাহি আর॥

এইরূপ অনেক কথা হইল। কথায় কথায় ভাবের তরঙ্গ এত উথলিয়া উঠিল যে, রামরায় প্রভুর পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন, এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে ভাবাবেশে আলিঙ্গন দিয়া হৃদয়ে ধারণ করিলেন। এখন রামরায়ের বিরহের পালা। মহাপ্রভু অতঃপর রামরায়কে বলিলেন, "এখন আমি দাক্ষিণাত্যে যাইব, আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমি সত্বরই দাক্ষিণাত্য ঘুরিয়া আসিতেছি; তুমি বিষয় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইতে থাক। আমরা অবশিষ্ট কাল নীলাচলে দুইজনে একত্র থাকিব এবং রসময় রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব-কথায় পরমসুখে কাল যাপন করিব"। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ নীলাচলে।
আমি তীর্থ করি পহুঁ আসিব অল্পকালে॥
দুইজনে নীলাচলে রব একসঙ্গে।
সুখে কাল গোঙায়িব কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥

রামানন্দ এই কথা শুনিয়া, অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়া, মৃত-প্রায় হইলেন—অশ্রুজলে দেহ ভাসিয়া গেল—একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন—ধৈর্য্য রাখিতে পারিলেন না। মহাপ্রভু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। তৎপর দিন মহাপ্রভু বিদ্যানগর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বিরহ-কাতর রামানন্দ রায় দিনরাত্র মহাপ্রভুর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে গেলেন। আমরা আর তাঁহার সঙ্গে চলিব না। মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করিয়া, দুই বৎসর পরে পুনরায় বিদ্যানগরে উপস্থিত হইলেন;—রায় রামানন্দের দীর্ঘ-বিরহের অবসান হইল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহার এইরূপ বর্ণনা আছে।—

সপ্ত গোদাবরী দেখি তীর্থ বহুতর।
পুনরপি আইলা প্রভু বিদ্যানগর॥
রামানন্দ রায় শুনি প্রভুর আগমন।
আনন্দে আসিয়া কৈল প্রভুর মিলন॥

দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে চরণ ধরিয়া।
আলিঙ্গন করে প্রভু তারে উঠাইয়া॥
দুইজনে প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন।
প্রেমাবেশে শিথিল হ'ল দুজনার মন॥

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু বিদ্যানগরে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া, নীলাচলে গমন করিলেন। রায় রামানন্দও বিষয়-কার্য্য ত্যাগ করিয়া, নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত উপস্থিত হইলেন। যথা চরিতামৃতে—

রায় কহে তোমার আজ্ঞা রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল॥
আমি কহিনু আমা হইতে না হয় বিষয়।
চৈতন্যচরণে রব যদি আজ্ঞা হয়॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হইল।
আসন হইতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈল॥
তোমার নাম শুনি হইল মহা-প্রেমাবেশ।
মোর হাতে ধরি কহে পিরীতি বিশেষ॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাই সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ॥

প্রভুর সহিত পুনর্ম্মিলনের পর উভয়েই পুরীতে গেলেন। ইতঃপর রামরায়ের সমস্ত জীবন মহাপ্রভুর গম্ভীরা-লীলাতেই

পর্য্যবসিত হইয়াছিল; অতএব, তাঁহার সম্বন্ধে স্বতন্ত্ররূপে আর লিখিবার প্রয়োজন নাই। এখন, মহাপ্রভুকে নিয়া তাঁহার কার্য্য। প্রভু ভাবে বিভোর—রায় রামানন্দও সেই ভাবে বিভাবিত। কিন্তু তাঁহার সকল সময়েই চিন্তা, মহাপ্রভু কোথায় যান—সমুদ্রে পড়েন, কি মূর্চ্ছিত হন;—আর চিন্তা, কি ভাবে প্রভুকে একটু সুস্থ রাখা যায়—তিনি কৃষ্ণ-বিরহে দিনরাত্রি অস্থির।

"কাঁহা কর কাহা যাও।
কাহা গেলে কৃষ্ণ পাও॥"

এই ভাবানুযায়ী শ্লোক পাঠ করেন, এবং স্বরূপ গান দ্বারা প্রভুর মন শান্ত করেন।

রামানন্দের সহিত প্রদ্যুম্ন-মিশ্রের কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে; সুতরাং এই স্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রোয়োজন।

গম্ভীরা-লীলা

মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ শেষ করিয়া, পুরীতে আসিয়াছেন। কাশীমিশ্রের বাড়ীতে মহাপ্রভু এখন বাস করেন। ভক্তগণ আবার মহাপ্রভুর সমাগমে পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছেন। রায় রামানন্দও এখন সংসার ত্যাগ করিয়া, মন্ত্রীর কার্য্য হইতে, প্রতাপরুদ্রের নিকট অবসর গ্রহণ

করিয়া, প্রভুর চরণ-প্রান্তে নিয়ত বাস করিতেছেন। এখন তাঁহার অন্য সেবা নাই, অন্য কার্য্য নাই—মহাপ্রভুই তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব। গম্ভীরা কাশীমিশ্রের বাড়ীর মধ্যে একটী কোঠার নাম। কোঠাটী অতি ক্ষুদ্র—এই জন্যই বোধ হয় ইহাকে "গম্ভীরা" বলে; অর্থাৎ গহ্বরের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়াই, গম্ভীরা। এই স্থান মহাপ্রভুর দ্বাদশবর্ষ-ব্যাপক লীলাক্ষেত্র।

মহাপ্রভুর ভাব এখন ক্রমশঃই গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে—ভাবে দিবানিশি বিভোর থাকেন। অভ্যাস বশতঃ সামান্যরূপ আহার নিদ্রা করিয়া থাকেন, কিন্তু তখনও ভাবের বিরাম নাই। এই সময়ে বিরহের ভাব অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল—শ্রীমতীর কৃষ্ণবিরহে যে ভাব হইয়াছিল, মহাপ্রভুও সেই ভাবে বিভোর,—দিবা নিশি কেবলই অশ্রুবিসর্জ্জন। ইহার ভিতর কতভাব হইয়াছে, কত কথা হইয়াছে, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? সামান্যরূপ দিগ্‌দর্শন জন্য কিছু আভাস দিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

এখন মহাপ্রভু দিনের বেলায় একটুকু অন্যমনা থাকেন; দশজনের সঙ্গে আলাপ করিতে হয়, কীর্ত্তন শুনেন, শাস্ত্রীয় কথা হয়, টোটা-গোপীনাথে গদাধরের ভাগবত-পাঠ শুনেন,—এই ভাবে দিন একরূপে কাটিয়া যায়। কিন্তু রাত্রি হইলে, প্রভুর বিরহভাব গভীর হইতে থাকে। সারা রাত্রি কখনও কাঁদেন, কখনও প্রলাপ করেন, কখনও বা এত হৃদয়-

বিদারক শোক প্রকাশ করেন যে, যাঁহারা নিকটে থাকেন, তাঁহারাও তাহা সহ্য করিতে পারেন না। কৃষ্ণবিরহে যে এত দুঃখ আছে, তাহা যাঁহারা কখনও কিছু আস্বাদন না করিয়াছেন, তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। যত রকমের কষ্ট আছে, কৃষ্ণ-বিরহের মত, এত কষ্ট কিছুতেই নাই।

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥
"চিন্তাচ জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দ্দশা দশ॥

চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, কৃশতা, দেহ-মালিন্য, প্রলাপ, ব্যাধি, উম্মত্ততা, মোহ ও মৃতবদবস্থা।

শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণবিরহে এই দশ দশা হইয়াছিল। মহাপ্রভু ও সেই ভাবে বিভাবিত,—তিনিও কৃষ্ণবিরহে এই সমস্ত দশা প্রাপ্ত হইতেন।

পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্ম্মের আকার।
মুখে ফেণ পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার॥
অচেতন রহিয়াছেন যেন কুষ্মাণ্ড ফল।
বাহিরে জড়িমা অন্তরে আনন্দ-বিহ্বল॥

(চরিতামৃত।)

প্রভু পড়িয়া আছেন দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাসায় শ্বাস নাহি বয়॥
উন্মাদ প্রলাপ চেষ্টা করে রাত্রি দিনে।
রাধা-ভাবাবেশে বিরহ বাড়ে অনুক্ষণে॥
আচম্বিতে স্ফূরে কৃষ্ণের মথুরা-গমন।
উদ্‌ঘূর্ণা দশা হইল উন্মাদ-লক্ষণ॥
রামানন্দের গলা ধরি করেন প্রলাপন।
স্বরূপে পুছেন জানি নিজ সখীজন॥
পূর্ব্বে যেমন বিশাখাকে রাধিকা পুছিলা।
সেই শ্লোক পড়ি প্রলাপ করিতে লাগিলা॥

(চৈতন্য-চরিতামৃত।)

তথাহি ললিত-মাধবে—

"ক্ব নন্দকুল-চন্দ্রমাঃ ক্ব শিখিচন্দ্রিকালঙ্কৃতিঃ।
ক্ব মন্দমুরলীরবঃ ক্বনু সুরেন্দ্রনীলদ্যুতিঃ॥
ক্ব রাসরস-তাণ্ডবী ক্ব সখি জীববক্ষৌষধি
র্নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক্ব বত হা হতা ধিগ্‌বিধিং॥"

কোনও সময় বা, স্বরূপ ও রামরায়ের গলা ধরিয়া প্রভু বলিতেছেন—

এই মত গৌর-রায় বিষাদে করে হায় হায়
হা হা কৃষ্ণ গেলে তুমি কতি।

গোপী-ভাব হৃদয়ে তার বাক্যে বিলাপয়ে
গোবিন্দ দামোদর মাধবেতি ॥
তবে স্বরূপ রামরায় করিয়া নানা উপায়
মহাপ্রভুর করে আশ্বাসন ।
গায়েন মঙ্গল-গীত প্রভুর কি যাইতে চিত
প্রভুর কিছু স্থির হইল মন ॥
এই মত বিলাপেতে অর্দ্ধরাত্রি গেল ।
গম্ভীরাতে স্বরূপ গোঁসাই প্রভুকে শোয়াইল ॥
প্রেমাবেশে মহাপ্রভুর গরগর মনঃ ।
নাম-সঙ্কীর্ত্তন করি করেন জাগরণ ॥
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিলা ।
গম্ভীরা-ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিলা ॥
মুখে গণ্ডে নাকে ক্ষত হইল অপার ।
ভাবাবেশে না জানে প্রভু পড়ে রক্তধার ॥
উন্মাদ-দশায় প্রভুর স্থির নহে মন ।

* * * *

যেই করে, যেই বলে উন্মাদ-লক্ষণ ॥
এই মত মহাপ্রভু রজনীদিবসে ।
প্রেমসিন্ধুতে মগ্ন রহি কভু ডুবে ভাসে ॥
এককালে বৈশাখের পূর্ণমাসী দিনে ।
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিলা উদ্যানে ॥

জগন্নাথ-বল্লভ নাম উদ্যান-প্রধানে।
প্রবেশ করিলা প্রভু লইয়া ভক্তগণে ॥

প্রভু একসময়ে প্রলাপের অবস্থায় কৃষ্ণ-দর্শন করিয়াছিলেন—

এখনি দেখিনু—
আপনার দুর্দ্দৈবে পুনঃ হারাইনু।
চঞ্চল স্বভাব কৃষ্ণের না রয় একস্থানে,
দেখা দিয়ে মন হরি করি অন্তর্দ্ধানে।

কৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, প্রভু অত্যন্ত অধীর হইয়া পড়িলেন; তখন, তিনি স্বরূপ গোসাঞিকে বলিলেন—

স্বরূপ গোসাঞিকে কহে গাও এক গীত।
যাতে আমার হৃদয়ের হয়ত সম্বিত ॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে মধুর করিয়া।
গীত-গোবিন্দের পদ গায় প্রভুকে শুনাইয়া ॥

তথাহি গীতগোবিন্দে সখীর প্রতি শ্রীরাধিকার উক্তি—

"রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসং।
স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসং ॥"

হে সখি! যিনি এই বৃন্দাবনে মহাসমারোহে বিবিধ ক্রীড়া পরিহাস করিয়াছিলেন, আজ সেই ব্রজরাজের কথাই আমার মনে পড়িতেছে।

স্বরূপ গোসাঞি যবে এই পদ গাইলা।
উঠি প্রেমাবেশে প্রভু নাচিতে লাগিলা॥
সেই পদ পুনঃ পুনঃ করান গায়ন।
পুনঃ পুনঃ আস্বাদয়ে করেন নর্ত্তন॥

এই ভাবে মহাপ্রভু নৃত্য ছাড়িতেছেন না দেখিয়া, স্বরূপ গোসাঞি গান ছাড়িয়া দিলেন। এই দিন মহাপ্রভুকে এই ভাবে শান্ত করিলেন।

"কৃষ্ণবিচ্ছেদ-বিভ্রান্ত্যা মনসা বপুষা ধিয়া।
যদ্ যদ্ ব্যধত্তো গৌরাঙ্গস্তল্লেশঃ কথ্যতেঽধুনা॥"

(কৃষ্ণদাস কবিরাজ।)

শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ-জনিত ভ্রান্তি-বশতঃ গৌরাঙ্গ মনে, শরীরে এবং বুদ্ধিতে, যে যে ভাব-চেষ্টা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সংপ্রতি তৎসমুদায়ের কিঞ্চিৎ কথিত হইতেছে।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য স্বয়ং ভগবান্;
জয় জয় গৌরচন্দ্র! ভক্তগণ-প্রাণ।
জয় জয় নিত্যানন্দ! চৈতন্য-জীবন;
জয়াদ্বৈতাচার্য্য জয় গৌর-প্রিয়তম।
শ্রীস্বরূপ শ্রীবাসাদি প্রিয় ভক্তগণ।
শক্তি দেহ করি যেন চৈতন্য-বর্ণন॥

প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব-গম্ভীর ;
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর।
বুঝিতে না পারি যাহা বর্ণিতে কে পারে ?
সেই বুঝে, বর্ণে, চৈতন্য শক্তি দেন যারে।
স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস ;
এ দোঁহার কড়্চাতে এ লীলা প্রকাশ।
সে কালে এই দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে ;
আর সব কড়্চা-কর্ত্তা রহে দূর-দেশে।
ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন।
সংক্ষেপ বাহুল্যে করে কড়্চা গ্রহণ।
স্বরূপ সূত্র-কর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার ;
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার।
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন ;
হইবে ভাবের জ্ঞান, পাইবে প্রেম-ধন।
কৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীর যে দশা হইল ;
কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল।
উদ্ধব-দর্শনে যৈছে রাধার বিলাপ ;
ক্রমে ক্রমে হইল প্রভুর সে উন্মাদ বিলাপ
রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান ;
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধাজ্ঞান

দিব্যোন্মাদে ঐছে হয়, কি ইহা বিস্ময়
অধিরূঢ়-ভাবে দিব্যোন্মাদ প্রলাপ হয়।

শেষ দ্বাদশ বৎসর—

শেষ যে রহিল প্রভুর দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ-স্মৃতি হয় নিরন্তর॥
শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব-দর্শনে।
এই মত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥
নিরন্তর হয় প্রভুর বিরহ-উন্মাদ।
ভ্রম-ময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ॥
রোমকূপে রক্তোদ্‌গম দন্ত সব হালে।
ক্ষণে অঙ্গ ক্ষীণ ক্ষণে অঙ্গ হালে॥

এই দ্বাদশ বৎসরই প্রভুর নানা ভাবের উদয় হইত। যাহা দেখিতেন, তাহাতেই বৃন্দাবনের স্ফূর্তি হইত। কখনও বিরহে কাঁদিতে কাঁদিতে মনে করিতেছেন, এই বুঝি কৃষ্ণ আসিলেন।

পড়ে পাতার উপর পাত।
বুঝি এল প্রাণনাথ॥

রামরায় ও স্বরূপকে, ললিতা বিশাখা মনে করিয়া, তিনি তখন বলিতেছেন,—

সুখের রাতি জ্বালাও বাতি
মন্দির কর আলা।
কুসুম তুলিয়া বোঁটা ফেলি দিয়া
গাঁথ হে মালতী-মালা॥

তখন বাসর-শয্যা প্রস্তুত হইল; এখন শ্রীমতীকে সাজাইতে হয়। প্রভু বলিলেন, "আমাকে আর সাজাইতে হইবে না। তোমরা কি জাননা, আমার সমস্ত গায়ের সব অলঙ্কার আছে? আমার ভূষণের অভাব কি?"

যথা মহাজনপদ—

* * * *

আমি পরেছি শ্যাম-নামের হার॥
হস্তের ভূষণ আমার চরণ-সেবন।
বদনের ভূষণ আমার শ্যাম-গুণ-গান॥
কর্ণের ভূষণ আমার নাম-শ্রবণ।
নয়নের ভূষণ আমার রূপ-দরশন॥
যদি তোরা সাজাবি মোরে।
কৃষ্ণ-নাম লিখ মোর অঙ্গ ভরে॥

এখন ভাবিতেছেন কৃষ্ণ আসিলে কি করিবেন,—তিনি মনে করিলেন, "সহজে কথা বলিব না।"

আমার আঙ্গিনায় আওবে যবে রসিয়া।
পালটী চলব হাম ঈষৎ হাসিয়া॥

এই ভাব মনে হওয়াতেই প্রভু ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন। এই ভাবে বিভোর আছেন—তখন তিনি সখীদিগকে বলিতেছেন—"দেখ দেখি সখি, সে এলো কি না ?" প্রভুই তখন বলিতেছেন—"আর আসিল না।" আবার কোনও একটী শব্দ হইলেই চমকিয়া উঠিতেছেন,—ভাবিতেছেন এই বুঝি আসিল। এইরূপ উৎকণ্ঠাতে রাত্রি শেষ করিলেন। যখন দেখিলেন প্রভাত হইল, অমনি পুনঃ শ্রীগম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন।

সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া দেখলো সজনি
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুনঃ কহে রাই না আসিল বঁধু
মরমে রহিল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব পাষাণে ধরিয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা ফুলের এ মালা
সেজ বিছায়নু ফুলে।
সব হ'ল বাসি আর কেন সই
ভাসাগে যমুনা জলে॥

কৃষ্ণ-বিরহে সাধারণতঃ অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়, তাহাই পুস্তকাদিতে পাঠ করি। কিন্তু মহাপ্রভু অষ্ট সাত্ত্বিক

ভাবের উপর, আবার সময় সময়, অত্যদ্ভুত অলৌকিক কুষ্মাণ্ডাকার হইয়া যাইতেন। চৈতন্যচরিতামৃতে এই বিষয়ের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত-চন্দ্র জয় ভক্ত-বৃন্দ॥
এই মত মহাপ্রভু রাত্রি দিবসে;
উন্মাদের চেষ্টা প্রলাপ করে প্রেমাবেশে।
একদিন প্রভু স্বরূপ-রামানন্দ-সঙ্গে;
অর্দ্ধ-রাত্রি গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
যবে যেই ভাব প্রভু করয়ে উদয়;
ভাবানুরূপ গীত গায় স্বরূপ মহাশয়।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীত-গোবিন্দ;
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ।
মধ্যে মধ্যে আপনি প্রভু শ্লোক পড়িয়া;
শ্লোকের অর্থ করেন প্রলাপ করিয়া।
এই মতে নানা ভাবে অর্দ্ধ রাত্রি হইলা।
গোসাঞিকে শয়ন করাই দোঁহে ঘরে গেলা।
গম্ভীরার দ্বারে গোবিন্দ করিলা শয়ন;
অর্দ্ধরাত্রি প্রভু করে নাম সংকীর্ত্তন।

আচম্বিতে শুনে প্রভু কৃষ্ণবেণু-গান ;
ভাবাবেশে প্রভু তাঁহা করিল পয়ান।
তিন দ্বারে কপাট তৈছে আছেত লাগিয়া ;
ভাবাবেশে প্রভু গেলা বাহির হইয়া।
সিংহদ্বারের দক্ষিণে আছে তেলেঙ্গা গাভীগণ।
তাঁহা যাই পড়িলা প্রভু হইয়া অচেতন।
এথা গোবিন্দ প্রভুর শব্দ না পাইয়া ;
স্বরূপেরে বোলাইল কপাট খুলিয়া।
স্বরূপ গোসাঞি সঙ্গে লইয়া ভক্তগণ ;
দিয়াটি জ্বালিয়া করে প্রভুর অন্বেষণ।
ইতি উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা ;
গাভীগণ-মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা।
পেটের ভিতর হস্তপদ কুর্ম্মের আকার ;
মুখে ফেণ পুলকাঙ্গ নেত্রে অশ্রুধার
অচেতন পড়িয়াছে যেন কুষ্মাণ্ড ফল ;
বাহিরে জড়িমা, অন্তরে আনন্দে বিহ্বল।
গাই সব চৌদিকে শুঁকে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ;
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ।
অনেক করিল যত্ন না হইল চেতন ;
প্রভু উঠাইয়া ঘরে আনিল ভক্তগণ।

উচ্চ করি শ্রবণে করে নাম সংকীর্ত্তন।
অনেক ক্ষণে মহাপ্রভু পাইল চেতন।
চেতন পাইল হস্তপদ বাহির আইল;
পূর্ব্ববৎ যথাযোগ্য শরীর হইল।
উঠিয়া বসিয়া প্রভু চাহে ইতি উতি;
স্বরূপেরে কহে তুমি আমা আনিলে কতি?
বেণু-শব্দ শুনি আমি গেলাম বৃন্দাবন;
দেখি গোষ্ঠে বেণু বাজায় ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
সঙ্কেত বেণুনাদে রাধা গেলা কুঞ্জঘরে।
কুঞ্জেতে চলিলা কৃষ্ণ ক্রীড়া করিবারে।
তাঁর পাছে পাছে আমি করিনু গমন;
ভূষণ-ধ্বনিতে আমার হরিল শ্রবণ।
গোপীগণ সহ বিহার হাস পরিহাস;
কণ্ঠ-ধ্বনি উক্তি শুনি মোর কর্ণোল্লাস।
হেন কালে তুমি সব কোলাহল করি;
আমা ইহা লইয়া আইলা বলাৎকারে ধরি।
শুনিতে না পাইনু সেই অমৃত-সম বাণী।
শুনিতে না পাইনু ভূষণ-মুরলীর ধ্বনি॥
ভাবাবেশে স্বরূপে কহে গদ্‌গদ্‌-বাণী;
কর্ণ-তৃষ্ণায় মরি আমি, রসামৃত শুনি।

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর ভাব জানিয়া ;
ভাগবতের শ্লোক পড়ে মধুর করিয়া।

আর একদিন, সেইরূপ শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া, মহাপ্রভু রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া বলিতেছেন—

এত কহি গৌর হরি দুজনায় কণ্ঠি ধরি
কহে শুন স্বরূপ রামরায়।
কাঁহা করো কাঁহা যাও কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাও
দুহে মোরে কহ সে উপায়॥

দুই জনে প্রভুকে করেন আশ্বাসন ;
স্বরূপ গায় রায় করে শ্লোক-পঠন।
কর্ণামৃত বিদ্যাপতি শ্রীগীত-গোবিন্দ,
ইহার শ্লোক প্রভুর বাড়ায় আনন্দ।
একদিন মহাপ্রভু সমুদ্রে যাইতে,
পুষ্পের উদ্যান তথা দেখে আচম্বিতে।
বৃন্দাবন-ভ্রমে তথা পশিল যাইয়া,
প্রেমাবেশে বুলে তাহা কৃষ্ণ অন্বেষিয়া।
রাসে রাধা লইয়া কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান হইল।
পাছে সখীগণ যৈছে চাহি বেড়াইল।
সেই ভাবাবেশে প্রভু প্রতি তরুলতা,
শ্লোক পড়ি পড়ি বলে যায় যথা তথা।

এইরূপে প্রভুর দিন যায় রাত্রি আসে। ভক্তগণ সকলেই ব্যস্ত—প্রভু কখন কি করেন। প্রভুর সঙ্গে সকল সময়েই কেহ কেহ থাকেন। রাত্রিতে, রায় রামানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ, শঙ্কর—ইঁহারাই থাকেন। এত সতর্কতার ভিতরেও প্রভু এক দিন, সমস্ত কবাট বন্ধ, এরূপ অবস্থায় রাত্রিতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন,—এই ঘটনা চৈতন্যচরিতামৃতে যেরূপ বিবৃত আছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি—

রামানন্দ রায় তবে গেলা নিজঘরে।
স্বরূপ গোসাঞি গোবিন্দ শুইলেন দ্বারে॥
সব রাত্রে মহা প্রভু করেন জাগরণ।
উচ্চ করি করেন নাম-সংকীর্ত্তন॥
শব্দ না পাইয়া স্বরূপ কবাট কইল দূরে।
তিন দ্বার দেওয়া আছে প্রভু নাই ঘরে॥
চিন্তিত হইল সবে প্রভু না দেখিয়া।
প্রভু চাহি বুলে সবে দিয়াটি জ্বালিয়া॥
সিংহদ্বারের উত্তর দিশায় আছে এক ঠাঁই।
তার মধ্যে পড়িয়াছে চৈতন্য গোসাঞি॥
দেখি স্বরূপ গোসাঞি আদি আনন্দিত হইলা।
প্রভুর দশা দেখি পুনঃ চিন্তিত হইলা॥

প্রভু পড়িয়াছে দীর্ঘ হাত পাঁচ ছয়।
অচেতন দেহ নাশায় শ্বাস নাহি বয়॥
এক এক হস্ত পাদ দীর্ঘ তিন হাত।
অস্থি গ্রন্থি ভিন্ন চর্ম্ম আছে মাত্র তাত॥
হস্ত পদ গ্রীবা কটি অস্থি সন্ধি যত।
এক এক বিতস্তি ভিন্ন হইয়াছে তত॥
চর্ম্মমাত্রে উপরে সন্ধির আছে দীর্ঘ হইয়া।
দুঃখিত হইলা সবে প্রভুকে দেখিয়া॥
মুখে লালা ফেণা প্রভুর উত্তান-নয়ন।
দেখিয়া সকল ভক্তের দেহ ছাড়ে প্রাণ॥
স্বরূপ গোসাঞি তবে উচ্চ করিয়া।
প্রভুর কাণে কৃষ্ণ-নাম কহে ভক্ত লইয়া
বহুক্ষণে কৃষ্ণ-নাম হৃদয়ে পৌঁছিল।
হরিবোল বলি প্রভু গর্জ্জিয়া উঠিল॥
চেতন পাইতে অস্থি সন্ধি লাগিল।
পূর্ব্ব-প্রায় যথাবৎ শরীর হইল॥
সিংহদ্বারে দেখি প্রভুর বিস্ময় হইলা।
কাঁহা করো কি এই স্বরূপে পুছিলা॥
স্বরূপ কহে উঠ প্রভু চল নিজ ঘর।
তথাই তোমাকে সব করিব গোচর॥

এত বলি প্রভু ধরি ঘরে লইয়া গেল।
তাহার অবস্থা সব কহিতে লাগিল॥
শুনি মহাপ্রভু বড় হইল চমৎকার।
প্রভু কহে কিছু স্মৃতি নাহিক আমার॥
সবে দেখি হয় মোর কৃষ্ণ বিদ্যমান।
বিদ্যুৎপ্রায় দেখা দিয়া হয় অন্তর্দ্ধান॥

* * * *

এইত কহিল প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
যাহার শ্রবণে লোকে লাগে চমৎকার॥
লোকে নাহি দেখে ঐছে শাস্ত্রে নাহি শুনি।
হেন ভাবে ব্যক্ত করে ন্যাসি-চূড়ামণি॥
শাস্ত্র-লোকাতীত যেই যেই ভাব হয়।
ইতর লোকের তাতে না হয় নিশ্চয়॥

* * * *

এক দিন মহাপ্রভু সমূদ্রে যাইতে।
চটকা পর্ব্বত দেখিলেন আচম্বিতে॥
গোবর্দ্ধন-শৈল-জ্ঞানে আবিষ্ট হইলা।
পর্ব্বত-দিকেতে প্রভু ধাইয়া চলিলা॥

* * * *

বৈষ্ণব দেখিয়া প্রভুর অর্দ্ধবাহ্য হইল।
স্বরূপ গোসাঞিকে কিছু কহিতে লাগিল॥

গোবর্দ্ধন হইতে মোরে কে ইঁহা আনিল।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা দেখিতে না পাইল ॥
ইহা হইতে আজি মুই গেনু গোবর্দ্ধনে।
দেখো যদি কৃষ্ণ করে গোধন-চারণে ॥
গোবর্দ্ধন-চারি-কৃষ্ণ বাজাইল বেণু।
গোবর্দ্ধনের চৌদিকে চরয়ে সব ধেনু ॥
বেণুনাদ শুনি এল রাধা ঠাকুরাণী।
সব-সখীগণ-সঙ্গে করিয়া সাজনী ॥
* রাধা লইয়া কৃষ্ণ প্রবেশিলা কন্দরাতে।
সখীগণ চাহি কেহ ফুল উঠাইতে ॥
হেনকালে তুমি সব কোলাহল কৈলা।
তাঁহা হইতে ধরি মোরে ইঁহা লইয়া আইলা ॥
কেন বা আনিলে মোরে বৃথা দুঃখ দিতে।
পাইয়া কৃষ্ণের লীলা না পাইনু দেখিতে ॥
এত বলি মহাপ্রভু করেন ক্রন্দন।
তাঁর দশা দেখি বৈষ্ণব করেন রোদন ॥

বাগান দেখিয়া প্রভুর নিধুবন, নিকুঞ্জবনের কথা মনে পড়িত,—চটক পর্ব্বত দেখিয়া গোবর্দ্ধনের কথা মনে হইত,—সমুদ্র দেখিয়া যমুনার কথা স্ফূর্ত্তি পাইত। একদিন সমুদ্র-দর্শন করিয়া, যমুনা-ভ্রমে তাহাতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন।

এই ঘটনা আমরা চৈতন্যচরিতামৃত হইতে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

এইরূপ মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হইতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
চন্দ্র-কান্ত্যে উচ্ছলিত তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হইল মূর্চ্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসে তরঙ্গের গণে॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥
কোণার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লইয়া যায়।
কভু ডুবাইয়া রাখে কভু বা ভাসায়॥
যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥
ইঁহা স্বরূপাদিগণ প্রভু না দেখিয়া।
কাঁহা গেল সবে কহে চমকিত হইয়া॥
মহাপ্রভু গেলা প্রভু লখিতে নারিলা।
প্রভু না দেখিয়া সংশয় করিতে লাগিলা॥

* * * * *

এত বলি সবে ফিরে প্রভুরে চাহিয়া।
সমুদ্রের তীরে আইলা কত জন লইয়া॥
চাহিয়া বেড়াইতে ঐছে শেষ রাত্রি হৈল।
অন্তর্দ্ধান হইল প্রভু নিশ্চয় জানিল॥
প্রভুর বিচ্ছেদে কারো দেহে নাহি প্রাণ॥
অনিষ্ট-আশঙ্কা বিনা মনে নাহি আন॥

তথাহি অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাটকে—

অনিষ্টা-শঙ্কীনি বন্ধু-হৃদয়ানি ভবন্তি হি।

তখন—

সমুদ্রের তীরে আসি যুকতি করিলা।
তিরাই পর্ব্বত দিকে কত জন গেলা॥
চটক পর্ব্বতে কিবা গেলা কোণার্কেতে।
গুণ্ডিচা মন্দিরে কিবা গেলা নরেন্দ্রেতে॥
পূর্ব্ব-দিশায় চলে স্বরূপ লইয়া কতজন।
সমুদ্রের তীরে নীরে করে অন্বেষণ॥
বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ॥
দেখে এক জালিয়া আসে কাঁধে জাল করি।
হাসে কাঁদে নাচে গায় কহে হরি হরি॥

জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবার চমৎকার।
স্বরূপ গোসাঞি তারে পুছে সমাচার॥
কহ জালিয়া এই দিকে দেখিলে একজন।
তোমার এই দশা কেন কহত কারণ॥
জালিয়া কহে ইহা এক মনুষ্য না দেখিল।
জাল বাহিতে এক মৃত মোর জালে আইল॥
বড় মৎস্য বলি আমি উঠাইনু যতনে।
মৃতক দেখিতে মোর ভয় হইল মনে॥
জাল খসাইতে তার অঙ্গ-স্পর্শ হইল।
স্পর্শ-মাত্র সেই ভূত হৃদয়ে পশিল॥
ভয়ে কম্প হইল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ্‌গদ্ বাণী মোর উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শন-মাত্র মনুষ্যের পৈশে সে কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত॥
অস্থি-সন্ধি ছুটি চর্ম্ম করে নড় বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ মোর নাহি রহে ধড়ে॥
মরা-রূপ ধ'রে রহে উত্তান-নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু রহে অচেতন॥

সাক্ষাৎ দেখিছ মোরে পাইল সেই ভূত।
মুই মইলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রীপুত ॥
সেই ভূতের কথা ভাই কহনে না যায়।
ওঝা ঠাঁই যাইছি যদি সে ভূত ছাড়ায় ॥
একা রাত্রে বুলি মৎস্য মারিয়া নির্জ্জনে।
ভূত প্রেত আমার না লাগে নৃসিংহ-স্মরণে ॥
এই ভূত নৃসিংহ-নামে চাপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখি ভয় লাগে মনে ॥
তথা না যাইও আমি নিষেধি তোমারে।
তাঁহা গেলে সেই ভূত লাগিবে সবারে ॥
এত শুনি স্বরূপ গোসাঞি যত তত্ত্ব জানি।
জালিয়াকে কিছু কয় সুমধুর বাণী ॥
স্বরূপ কহে যাঁহে তুমি কর ভূত-জ্ঞান।
ভূত নহে তিঁহ কৃষ্ণ-চৈতন্য ভগবান্ ॥
প্রেমাবেশে পড়িল তিঁহ সমুদ্রের জলে।
তারে তুমি উঠাইলে আপনার জালে ॥

* * * * *

শুনি সেই জালিয়া আনন্দিত হইল।
সবা লইয়া গেল মহাপ্রভুকে দেখাইল।

ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ শব-কায়।
জলে শ্বেত-তনু বালু লাগিয়াছে গায়।

* * * *

সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্ত্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণ-নাম কহে প্রভুর কাণে॥
কতক্ষণে প্রভুর কাণে শব্দ প্রবেশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহি উঠিল॥

* * * * *

অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ-বচনে।
আভাষে কহেন সব শুনে ভক্তগণে॥
কালিন্দী দেখিয়া আমি গেলাম বৃন্দাবন।
দেখি জলকেলি করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥
রাধিকাদি-গোপীগণ-সঙ্গে একত্র মিলি।
যমুনায় মহারঙ্গে করে জলকেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ-সঙ্গে।
এক সখী সখীগণে দেখায় সে রঙ্গে॥

যথা রাগ :—

পট্টবস্ত্র অলঙ্কারে সমর্পিয়া সখী-করে
সূক্ষ্ম-শুক্ল-বস্ত্র-পরিধান।
কৃষ্ণ লইয়া কান্তাগণ কৈল জলাবগাহন
জল-কেলি রচিল সুঠাম॥

সখী হে, দেখ কৃষ্ণের জল-কেলি রঙ্গে।

কৃষ্ণ মত্ত-করিবর চঞ্চল-কর-পুষ্কর
গোপীগণ করিণীর সঙ্গে ॥

আরম্ভিল জলকেলি অন্যান্যে জল ফেলাফেলি
হুড়াহুড়ি বর্ষে জল-ধার।

সবে জয় পরাজয় নাহি কিছু নিশ্চয়
জলযুদ্ধ বাড়িল অপার ॥

বর্ষে তবে তড়িদ্‌ঘন সিঞ্চে শ্যাম-নবঘন
ঘন বর্ষে তড়িৎ উপরে।

সখীগণের নয়ন তৃষিত-চাতকীগণ
সে অমৃত সুখে পান করে ॥

সহস্রকর জলসেঁচে সহস্র-নেত্রে গোপী দেখে
সহস্র পদে নিকটে গমনে।

সহস্র মুখ-চুম্বনে সহস্র বপুঃ-সঙ্গমে
গোপী নর্ম্ম শুনে সহস্র কাণে ॥

কৃষ্ণ রাধায় লইয়া বলে গেলা কণ্ঠ-মগ্ন-জলে
ছাড়িল তাঁহা যাহা অগাধ পাণি।

তিঁহ কৃষ্ণ-কণ্ঠ ধরি ভাসে জলের উপরি
গজোদ্‌ঘাতে যৈছে কমলিনী ॥

যত গোপ-সুন্দরী　　কৃষ্ণ তত রূপ ধরি
সবার বস্ত্র করিল হরণ।
যমুনা-জল নির্ম্মল　　অঙ্গ করে ঝল্ মল্
সুখে কৃষ্ণ করে দরশন॥
পদ্মিনী-লতা সখীচয়　　কৈল কারও সহায়
কার হস্তে পদ্ম সমর্পিল।
কেহ মুক্ত-কেশপাশ　　আগে কৈল অধোবাস
হস্তে কেহ কুঞ্চলি ধরিল॥
কৃষ্ণের কলহ রাধার সনে　　গোপীগণ সেই ক্ষণে
হেমাব্জ-বনে গেল লুকাইতে।
আকণ্ঠ বপু জলে পৈশে　　মুখ-মাত্র জলে ভাসে
পদ্মে মুখে না পারি চিনিতে॥
এথা কৃষ্ণ রাধা-সনে　　কৈল যে আছিল মনে
গোপীগণ অন্বেষিতে গেলা।
তবে রাধা সূক্ষ্মগতি　　জানিয়া সখীর স্থিতি
সখী মধ্যে আসিয়া মিলিলা॥
যত হেমাব্জ জলে ভাসে　　তত নীলাব্জ তার পাশে
আসি আসি করয়ে মিলন।
হেমাব্জ নীলাব্জে ঠেকে　　যুদ্ধ হয় প্রত্যেকে
কৌতুক দেখে তীরে গোপীগণ॥

চক্রবাক্ মণ্ডল "পৃথক্ পৃথক্ যুগল
জল হইতে করিল উদ্গম।
উঠিল পদ্মমণ্ডল পৃথক্ পৃথক্ যুগল
চক্রবাকে কইল আচ্ছাদন ॥
উঠিল বহু রক্তোৎপল পৃথক্ পৃথক্ যুগল
পদ্মগণে কৈল নিবারণ।
পদ্ম চাহে লুটি নিতে উৎপল চাহে রাখিতে
চক্রবাক লাগি দোহার মন ॥
পদ্মোৎপল অচেতন চক্রবাক্ সচেতন
চক্রবাকে পদ্ম আস্বাদয়।
ইহা দোহার উল্টা স্থিতি ধর্ম্ম হইল বিপরীতি
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ন্যায় হয় ॥
মিত্রের মিত্র সহবাসী চক্রবাকে পদ্ম লুটে আসি
কৃষ্ণের রাজ্যে ঐছে ব্যবহার।
অপরিচিত শত্রু মিত্রে রংখে উৎপল এবড় চিত্রে
এ বড় বিরোধ অলঙ্কার ॥
অতিশয়োক্তি বিরোধাভাস দুই অলঙ্কার প্রকাশ
করি কৃষ্ণ কপট দেখাইল।
তাহা করি আস্বাদন আনন্দিত মোর মন
নেত্র-কর্ণযুগ যুড়াইল ॥

ঐছে বিচিত্র ক্রীড়া করি তীরে আইলা শ্রীহরি
সহ কান্তাগণ।
গন্ধতৈল-মর্দ্দন আমলকী-উদ্বর্ত্তন
সেবা করে তীরে সখীগণ॥
পুনরপি কৈল স্নান শুষ্ক বস্ত্র পরিধান
রত্ন-মন্দিরে কৈল আগমন।
বৃন্দাকৃত সম্ভার গন্ধপুষ্প অলঙ্কার
বন্যবেশ করিল রচন॥
গঙ্গাজল অমৃত কেলি পীযূষ গ্রন্থি কর্পূর কেলি
সরপুলী অমৃত পদ্ম চিনি।
খণ্ড খিরিসা বৃক্ষ ঘরে করি নানা ভক্ষ্য
রাধা যাহা কৃষ্ণ লাগি আনি॥
ভক্ষ্যের পরিপাটী দেখি কৃষ্ণ হইল মহাসুখী
বসি কৈল বন্য ভোজন।
সঙ্গে লঞা সখীগণ রাধা কৈল ভোজন
দোঁহে কৈল মন্দিরে শয়ন॥
কেহ করে বীজন কেহ পাদ-সম্বাহন
কেহ করায় তাম্বূল ভক্ষণ।
রাধাকৃষ্ণ নিদ্রা গেলা সখীগণ শয়ন কৈলা
দেখি আমার সুখী হইল মন॥

হেনকালে মোরে ধরি মহা কোলাহল করি
তুমি সব ইঁহা লঞা আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ
সে সুখ ভঙ্গ করাইলা॥

মহাপ্রভু বিরহের গভীর তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া, কেবল যে বিরহের ভাবেই উচ্ছলিত হইতেন, তাহা নহে, এই বিরহের ভিতরেই আবার কখনও মান, কখনও মাথুর, কখনও পূর্ব্বরাগ, কখনও রাস, এইরূপ নানা ভাব উপস্থিত হইত। এপর্য্যন্ত বিরহাবস্থায় মহাপ্রভুর যে সমস্ত লীলা হইয়াছে,—যথা রাসস্থলী-দর্শন, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ ও গোপী-গণের জলকেলী-দর্শন ইত্যাদি—তাহা চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। ইহার সমস্তেরই মূলভাব বিরহ। কৃষ্ণ-দর্শনে এই বিরহের পর্য্যবসান হয়, আবার কৃষ্ণের অদর্শন হয়, আবার বিরহ উপস্থিত হয়। ইহার ভিতরেই দশ দশার সমস্ত ভাব উপস্থিত হয়। ক্রমাগত এইরূপ বিরহের ভাবে জ্বরজ্বর হইয়া, প্রভুর দেহ ক্ষীণ ও মলিন হইতে লাগিল। শ্রীমতীর যেমন বিরহেতে "উঠিলে বসিতে নারে" এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল; মহাপ্রভুর ও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। শ্রীমতীর এই সমস্ত অবস্থা, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রণীত গ্রন্থে, কৃষ্ণ-কর্ণামৃতে ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত আছে। স্বরূপ গাহিতেন ও রায় রামানন্দ

শ্লোক পাঠ করিতেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি হইতে দুই চারিটী পদের উল্লেখ করিতেছি, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন শ্রীমতীর কি অবস্থা হইয়াছিল।

মহাপ্রভুও শ্রীমতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া এই সমস্ত দশা প্রাপ্ত হইতেন।

বিদ্যাপতির পদ—

কত দিন মাধব রহব মথুরাপুর
কবে ঘুচব বিহি বাম।
দিবস লিখি লিখি নখর খোয়ায়নু,
বিছুরল গোকুল নাম।
হরি হরি কাহে কহব এ সংবাদ।
সোঙরি সোঙরি উহু
ক্ষীণ ভেল মঝু দেহ
জীবনে আছয়ে কিবা সাধ।
পুরব পিয়ারী নারী হাম আছনু
অব দরশন হুঁ সন্দেহ।
ভ্রমর ভ্রমরী ভ্রমি সবহুঁ কুসুমে রমি
না তেজই কমলিনী লেহ।
আশা নিগড় করি জীউ কত রাখব
অবহি যে করত পরাণ।

বিদ্যাপতি কহ আশাহীন নহ
আওব সে বর কান।

সজনি কো কহু আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি-পার কিয়ে পাওব,
মধু-বনে নাহি পাতিয়াই।

এখন তখন করি, দিবস গোঙায়নু
ছোড়নু জীবক আশা।

বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়নু
খোয়নু এ তনু আশে।

হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব
কি করবি মাধব-মাসে।

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব
কি করব বারিদ মেহে

ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব
কি করব গো পিয়া লেহে।

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর যুবতি
অব নাহি হোত নিরাশ।

সো ব্রজ-নন্দন হৃদয়-আনন্দন
ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ।

এইরূপে বিরহের ভাবে শ্রীমতীর দেহ ক্ষীণ হইয়াছে, এবং জীবনের আশায় নৈরাশ্য আসিয়াছে। মহাপ্রভুরও এই দশাই হইয়াছিল। তিনিও নখে লিখিতেন।

"ভূমির উপরে বসি নিজ নখে ভূমি লিখে
অশ্রু-গঙ্গা নেত্রে বহে কিছু নাহি দেখে।'

চৈতন্যচরিতামৃত।

আর একটী পদ উদ্ধৃত করিতেছি—

কে মোরে মিলাইয়া দিবে সে চাঁদ বয়ান ;
আঁখি তিরপিত হবে জুড়াবে পরাণ।
কে মোরে মিলাইয়া দিবে নন্দসুত কাণ
রতন-ভূষণ দিব কাটিয়া পরাণ।
আমি উঠি বসি করি কত পোহায়নু রাতি।
হিয়া মোর নাহি ফাটে নিলাজ স্ত্রী-জাতি।
কেহ ত বলেনা মোরে ঘরে এল পিয়া।
কত আর রাখিব প্রাণ আশায় বাঁধিয়া।

ভাটিয়ারি সুরে নৌকার মাঝিরা সচরাচর যে সমস্ত গান করিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং অতি গভীর-ভাবব্যঞ্জক। তাহার মধ্যে একটী নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

ও বিশাখে শ্যামকে দেখা প্রাণ যাবার কালে।
বুঝি কৃষ্ণ বিনে প্রাণ মোর যায় গো সই।
তোমরা মোর প্রিয় সখী বসে আছ অষ্ট সখী (গো)
তোদের কাছে মোর মনের কথা গো সই।
হস্ত দিয়ে দেখ বুকে প্রাণ আছে কেমন সুখে (গো)
কুমারের প'ণের মত জ্বলছে দিবানিশি গো সই।
আমি কেন একা যাব কৃষ্ণকে যে সঙ্গে নিব (গো)
বড় যতন করে রতন পেয়েছি গো সই।
আমার প্রাণ অন্ত হলে না পোড়াইও দাবানলে
আমার এ দেহ বেঁধে রেখ তাল-তমাল-ডালে গো সই।

রায় রামানন্দ কোন্ শ্লোক পড়িতেন এবং স্বরূপ কোন্ গান গাহিতেন, তাহার স্থিরতা নাই। মহাপ্রভুর যখন যে ভাব হইত, সেই ভাবের অনুকূল যে গান, তাহাই গাহিতেন। মহাপ্রভু এই সময়ে বিরহের ভাব-তরঙ্গে ভাসিতেছেন, আমরাও সেই জন্য বিরহ-ভাবাত্মক যে সকল গান তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। এই গান দ্বারা মহাপ্রভুর প্রাণের অবস্থা এবং ভাবের অবস্থা পাঠকের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য। তজ্জন্য কৃষ্ণ-কর্ণামৃতে বিল্বমঙ্গল কৃত একটী স্তব উদ্ধৃত হইল।

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈক-সিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥

উন্মাদের লক্ষণ করায় কৃষ্ণ-স্ফূরণ
ভাবাবেশে উঠে প্রণয় মান।
সোল্লুণ্ঠ বচন-রীতি মান গর্ব্ব ব্যাজ স্তুতি
কভু নিন্দা কভু ত সম্মান॥
তুমি দেব ক্রীড়ারত ভুবনের নারী যত
তাহে কর অভীষ্ট ক্রীড়ন।
তুমি মোর দয়িত মোতে বৈসে তোমার চিত
মোর ভাগ্যে কৈলা আগমন॥
ভুবনের নারীগণ সভা কর আকর্ষণ
তাহা কর সব সমাধান।
তুমি কৃষ্ণ চিত্ত-হর ঐছে কোন পামর
তোমারে বা কোন করে মান॥
তোমার চপল মতি না হয় একত্র স্থিতি
তাতে তোমার নাহি কিছু দোষ।
তুমি ত করুণাসিন্ধু আমার প্রাণের বন্ধু,
তোমায় মোর নাহি কভু রোষ॥

তুমি নাথ ব্রজপ্রাণ ব্রজের কর পরিত্রাণ,
বহু কার্য্যে নাহি অবকাশ।
তুমি আমার রমণ সুখ দিতে আগমন,
এ তোমার বৈদগ্ধ্য-বিলাস॥
মোরবাক্য নিন্দা মানি, কৃষ্ণ ছোড় গেল জানি,
শুন মোর এ স্তুতি-বচন।
নয়নের অভিরাম, তুমি মোর ধনপ্রাণ,
হা হা পুন দেহ দরশন॥
স্তম্ভ কম্প প্রস্বেদ বৈবর্ণ্য অশ্রু স্বরভেদ,
দেহ হইল পুলকে ব্যাপিত।
হাসে কাঁদে নাচে গায়, উঠি ইতি উতি ধায়,
ক্ষণে ভূমে পড়িয়া মূর্চ্ছিত॥
মূর্চ্ছায় হইল সাক্ষাৎকার উঠি করে হুহুঙ্কার,
কহে এই আইলা মহাশয়।
কৃষ্ণের মাধুরী গুণে, নানা ভ্রম হয় মনে,
শ্লোক পড়ি করায় নিশ্চয়॥

"হে দেব, হে দয়িত" ইত্যাদি বিল্বমঙ্গলের এই স্তোত্র দ্বারা শ্রীমতীর উন্মাদের লক্ষণ বর্ণনা করিয়া, কৃষ্ণ-ভাবাবেশে সময়ে সময়ে তাঁহার উপর প্রণয়-মানের সঞ্চার হইতেছে। মানগর্ভ ব্যাজ-স্তুতি দ্বারা, কভু নিন্দা, কভু সম্মান দেখান

হইতেছে। পরবর্ত্তী কবিতা দ্বারা পূর্ব্ব শ্লোকের ভাবের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। প্রভুর দিব্যোন্মাদের অবস্থায়, এক সময়ে নানা ভাবের প্রকাশ হইত তাহাই দেখাইতেছেন—

ঔৎসুক্য চাপল্য দৈন্য রোষামর্ষ আদি সৈন্য
প্রেমোন্মাদ সবার কারণ।
মত্তগজ ভাবগণ, প্রভুর দেহ ইক্ষুবন
গজযুদ্ধ বনের দলন।
প্রভুর হইল দিব্যোন্মাদ তনু মনের অবসাদ
ভাবাবেশে করে সম্বোধন॥

মহাপ্রভু বিরহের অবস্থায় চণ্ডীদাসের গান শুনিতে ভালবাসিতেন। তাহারই দুই একটী উদ্ধৃত করিতেছি—

বিরহ-কাতরা বিনোদিনী রাই
পরাণে বাঁচে না বাঁচে।
নিদান দেখিয়া আসিনু হেথায়
কহিনু তোহারি কাছে॥
যদি দেখিবে তোমার প্যারী।
চল এইক্ষণে রাধার শপথ
আর না করিও দেরী॥
কালিন্দী-পুলিনে কমলের শেজে
রাখিয়া রাইয়ের দেহ।

কোন সখী অঙ্গে লিখে শ্যাম নাম
নিশ্বাস হেরয়ে কেহ ॥
কেহ কহে তোর বঁধুয়া আসিল
সে কথা শুনিয়া কাণে।
মেলিয়া নয়ন চৌদিক নেহারে
দেখিয়া না সহে প্রাণে ॥
যখন হইনু যমুনা পার
দেখিনু সখীরা মেলি।
যমুনার জলে রাখে অন্তর্জ্জলে
রাই দেহ হরি বলি ॥
দেখিতে যদ্যপি সাধ থাকে তব
ঝাঁট্ চল ব্রজে যাই।
বলে চণ্ডীদাসে বিলম্ব হইলে
আর না দেখিবে রাই ॥

শ্রীমতীর এই অবস্থা চণ্ডীদাসের গানের দ্বারা বর্ণনা করিয়া, শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহাই বর্ণনা করা হইল। ইতিপূর্ব্বে "ও বিশাখে" ইত্যাদি যে গানটী লিখিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা বিরহে যে, কি তীব্র যাতনা তাহাই প্রকাশ পাইতেছে ;—বিরহে যে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে

পারে, তাহাও দেখান হইল। গানটী গ্রাম্য ভাষায় লিখিত হইলেও ভাবে মুগ্ধ হইতে হয়।

পাঠক, রাধার এবং মহাপ্রভুর ভাবব্যঞ্জক আরও কয়েকটী গান শুনুন।—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণপতি হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধিনু প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে?
রাধা বলি কেহ সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে!
ঐ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়?
শীতল বলিয়া শরণ লইনু
ও দুটী কমল পায়।

না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে যদি নাহি দেখি
তরাসে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরম রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

সখী হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যেই আপনারে খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর সুধাও॥
নয়ন-পুতলী করি লইনু মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুন জ্বালি সকলি পোড়ায়েছি
জাতি কুল শীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কত কিনা বলে মোকে
না করিয়া শ্রবণ-গোচরে।
স্রোতের বিথার জলে এ তনু ভাসায়নু
কি করিবে কুলের কুকুরে?

খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
কাণু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপত কহে পিরীতি এমতি হলে
তার গুণ তিন লোকে গায়॥

চণ্ডীদাস—

শ্যামসুন্দর স্মরণ আমার
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণ ধন
শ্যাম সে গলার হার।
শ্যাম সে বেশর শ্যাম বেশ মোর
শ্যাম শাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন
শ্যাম দাসী হলো রাধা।
শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
ভাগ্যে মিলাইল বিধি।
কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর
বঁধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে রাখিহ শ্যামেরে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে।

তুমি সে আমার প্রাণ !
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি,
কুল শীল জাতি মান ॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী, হাম অতি হীনা,
না জানি ভজন পূজন ॥
পিরীতি-রসেতে ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি, তুমি মোর গতি,
মন নাহি আন ভায় ॥
কলঙ্কী বলিয়া, ডাকে সব লোকে,
তাহাতে নাহিক দুঃখ।
তোমার লাগিয়া, কলঙ্কের হার,
গলায় পরিতে সুখ।
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস, পাপপুণ্য সম,
তোহারি চরণ খানি।

পিরীতি-নগরে, বসতি করিব,
পিরীতে বাঁধিব ঘর।
পিরীতি দেখিয়া, পড়শী করিব,
•পিরীতে বাঁধিব চাল।
পিরীতি-আশকে, সদাই থাকিব,
পিরীতে গোঙাব কাল॥
পিরীতি-পালঙ্কে শয়ন করিব
পিরীতি-শিথান মাথে।
পিরীতি-বালিশে আলিস ত্যজিব
থাকিব পিরীতি সাথে॥
পিরীতি-সরসে, সিনান করিব,
পিরীতি-অঞ্জন লব।
পিরীতি ধরম পিরীতি করম
তে পরাণ দিব॥
পিরীতি-নাসায়, বেশর করিব,
ভুলিবে নয়ন কোণে।
পিরীতি-অঞ্জন লোচনে পরিব
• দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে

অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে মনে ॥
(সখীরে) নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হাহা কুলাঙ্গনাগণ গ্রহিবারে ধৈর্য্যগণ
যাহে হেন দশা হইল মোরে ॥
শুনিয়া ললিতা কহে অন্য কোন শব্দ নহে
মোহন-মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিয়া কেনে হৈলা তুমি বিমোহনে
রহ নিজ চিতে ধরি থেহ ॥
রাই কহে কেবা জন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে একত্রে করিয়া।
জল নহে হিমে জনু কাঁপাইছে সব তনু
শীতল করিয়া মোর হিয়া ॥
অস্ত্র নহে মন ফুটে কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে উষ্ণ অতি, পোড়ায় আমার মতি,
চণ্ডীদাস ভাবি না পায় ওর ॥

কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে।
নিরবধি দেখি কালা শয়নে স্বপনে ॥

কাল কেশ এলাইয়া বেশ নাহি করি।
কাল অঞ্জন আমি নয়ানে না পরি॥
আলো সই মুঞি শুনিলাম নিদান।
বিনোদ বঁধুয়া বিনে না রহে পরাণ॥
মনের দুঃখের কথা মনে সে রহিল।
কুটিল সে শ্যামশেল বাহির নহিল॥
চণ্ডীদাস কহে রূপ শেলের সমান।
নাহি বাহিরায় শেল দগধে পরাণ॥

উপরে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির যে সমস্ত পদাবলী উদ্ধৃত করা হইল, তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ও শ্রীমতীর ভাব একইরূপ। শ্রীমতী রাধিকার যে দশটি ভাব হইয়াছিল, মহাপ্রভুরও সেই সমস্ত ভাব হইয়াছিল। স্বর্গীয় কৃষ্ণকমল গোস্বামী মহাশয়ও, মহাপ্রভুর এবং শ্রীমতী রাধিকার ভাবের সাম্য দেখাইবার জন্য দিব্যোন্মাদ ভাব বর্ণন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত কয়েকটী গান উদ্ধৃত করা গেল।—

এখন আমার বেঁচে আর ফল কি বল, সজনি!
আমার বিচ্ছেদ জ্বালায়, প্রাণ জ্বালায়
কিবা দিবা কি রজনী, গো সজনি!

কৃষ্ণ-শূন্য বৃন্দারণ্য জীবন হ'লো প্রেমশূন্য
আমার যথা গৃহ তথারণ্য
মরিলে বাঁচি এখনি—গো সজনি !

সখি, আমি কই ব্রজমাঝে রমণী সমাজে,
ছিলাম শ্যাম-গরবিণী গো, সজনী ;
হলো দারুণ বিধি বাম হারাইলাম শ্যাম
হ'লাম প্রেম-কাঙ্গালিনী গো—সজনি।
সখি গরল খাইয়ে মরি কিংবা বিষধর ধরি
নইলে অনলে প্রবেশ করি
ত্যজিব জীবন এখনি, সজনী।
যখন বিরলে বসিয়ে নয়ন মুদে দেখি—
তখন যেন প্রাণ-সই গো।
ও সে নটবর বেশে দাঁড়ায় এসে দেখি।
দিয়ে গলে পীতাম্বর বলে পীতাম্বর রাধে বিধুমুখী !
একবার বদন তুলে নয়ন মেলে দেখ দেখি।
অমনি দেখি বলে যদি আঁখি মেলে দেখি।
দেখি দেখি করি পুনঃ নাহি দেখি
না দেখিলে দেখি দেখিলে না দেখি
একি দেখি বল দেখি !

মহাপ্রভুরই ন্যায়, কৃষ্ণকমল গোস্বামীর রাধা, এই বলিয়া পাগলিনীর মত ধাবিতা হইয়া, অতি করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।—

কোথা রইলে প্রাণনাথ ওহে নিঠুর মুরলী-বদন।
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ ওহে নিঠুর মুরলী-বদন॥

মহাপ্রভুও কৃষ্ণান্বেষণে বাহ্যজ্ঞানশূন্য—দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান নাই। স্বরূপ, রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ তাঁহাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও সান্ত্বনা করিতেছেন—এই চিত্র গোস্বামী মহাশয়ের "রাই উন্মাদিনী"তে রাধা চরিত্রে অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। প্রেমোন্মাদিনী শ্রীমতী কৃষ্ণান্বেষণে দিশাহারা হইয়া গমন করিতেছেন;

আর ললিতা বলিতে লাগিলেন—

ধীরে ধীরে চল্ গজগামিনী!
অমন করে যাস্‌নে যাস্‌নে যাস্‌নে গো ধনি।
(তোরে বারে বারে বারণ করি, রাই!)
(ধীরে ধীরে চল গজগামিনী)
একে বিষাদে তোর কৃশ তনু
মরি মরি হাঁটিতে কাঁপিছে জানু (গো)—
তুই কি আগে গেলে কৃষ্ণ পাবি।
(চঞ্চলা হইলি কেন?)

না জানি কোন গহন বনে প্রাণ হারাবি ॥
কত কণ্টক আছে গো বনে
ও রাই ফুটিবে দুটি চরণে !
কত বিজাতি ভুজঙ্গ আছে
ও তোর কমল-পদে দংশে পাছে (গো—)
গহন-কানন-মাঝে।
হল নয়ন-ধারায় পিছল পথ
(আর কাঁদিসনে গো, বিনোদিনী)
বলি যাস্‌নে রাধে এত দ্রুত (গো—)।
মোদের কাঁধে দুটি বাহু থুয়ে ;—
কমলিনী চল গো পথ নিরখিয়ে।
(আমরা তো তোর সঙ্গে যাব)

গোস্বামী মহাশয়ের আর একটী গান উদ্ধৃত করা হইল। ইহাতে মেঘ দেখিয়া শ্রীমতীর কৃষ্ণভ্রম বর্ণিত হইয়াছে।—

কি ভাবিয়া মনে, দাঁড়ায়ে ওখানে (এস হে—)
একবার নিকুঞ্জ-কাননে কর পদার্পণ।
একবার আসিয়ে সমক্ষে, দেখিলে স্বচক্ষে,
জান্‌বে, সবে কত দুঃখে রক্ষে করেছি জীবন।

* * * * *

ভাল ভাল বঁধু ভালত আছিলে,
ভাল ভাল সময় আসি দেখা দিলে ;
আর ক্ষণেক পরে দেখা দিলে সখা দেখা হত না।
তোমার বিরহে সবার হ'ত যে মরণ।
আমার মত তোমার অনেক রমণী
তোমার মত আমার তুমিই গুণমণি ;
যেমন দিনমণির কত কমলিনী
কিন্তু কমলিনীগণের একই দিনমণি।

শ্রীমতীর প্রার্থনায় মেঘ নিকটে আসিবার নয়—মেঘ চলিতে লাগিল ; শ্রীমতী কৃষ্ণভ্রমে তাহাকে ব্যাকুল ভাবে বলিতে লাগিলেন—

ওহে তিলেক দাঁড়াও দাঁড়াও হে,
অমন করে যাওয়া উচিত নয়।
দাঁড়াও হে দুঃখিনীর বঁধু—
ওহে যে যার শরণ লয়—
নিঠুর বঁধু, বল তারে কি বধিতে হয়।

মহাপ্রভুর ভাবের অবধি নাই। বিরহের পর মূর্চ্ছা হইত; তৎপর কৃষ্ণদর্শন। যখন তাঁহার কৃষ্ণ দর্শন করিয়া তৃপ্তি-লাভ না হইত, তখন বিধিকে নিন্দা করিতেন। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

এ মাধুর্য্যামৃত সদা যেই পান করে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাড়ে নিরন্তরে॥
অতৃপ্ত হইয়া করে বিধির নিন্দন!
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন॥
কোটি নেত্র নাহি দিল সবে দিল দুই।
তাহাতে নিমেষ! কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি॥

৺ কৃষ্ণকমল গোস্বামীরও রচিত এই ভাবের একটী গান আছে। যথা—

কি হেরিব শ্যাম, রূপ নিরুপম,
নয়ন তো মম মনোমত নয়।
যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন
হ'তেছিল সম্মিলন—
নয়ন পলক দিল হেন সুখের সময়।
শ্যাম দরশনে আমার ত্রিবিধ বৈরি
বল কেমনে ওরূপ নয়ন-ভরে হেরি।
ঘরে গুরু লোক নয়ন-পলক
আমার সুখেতে উপজে শোক।
তাহে আনন্দ মদন দুই দুরাশয়।
সখি যে হেরিবে কৃষ্ণানন
তারে কোটি নেত্র না দেয় কেন।

যদি ছিল বা দুইটী নয়ন
তাহে কৈল পক্ষ আচ্ছাদন।
(বিধি সৃজন জানে না—)
সখি কি তপ করিয়া মীন।
পেল দুইটী চক্ষু পক্ষ্ম-হীন॥
আমি সেই তপ করি
মীনের মত নেত্র ধরি
হেরি হরি পরাণ ভরিয়া।
দিল পক্ষ্ম তাহে নাহি ছিল ক্ষতি।
যদি দিত আঁখির উড়িতে শকতি॥
তবে চকোরের মত সে লাবণ্যামৃত
আঁখি উড়ি উড়ি পান করিত।
তবে পিয়াসা মিটিত হেন মনে লয়।

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলী-লব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়-কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাং।
চেতঃপ্রাঙ্গণ-সঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্ কৃতিম্
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥

এই শ্লোকের দ্বারাও বিধিকে নিন্দা করা হইতেছে। এমন অমৃতময় নাম জপিবার জন্য, বিধি একটী মাত্র জিহ্বা প্রদান করিয়াছেন। এই নাম জপ করিবার জন্য অসংখ্য

রসনা না হইলে স্পৃহার নিবৃত্তি হয় না। বিধি দুইটী মাত্র কর্ণ দিয়াছেন, তাহাতে শ্রবণ-পিপাসা নিবৃত্তি হয় না; অর্ব্বুদ কর্ণ কেন হইল না, এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। কৃষ্ণকমল গোস্বামীর গানের দ্বারাও সেই ভাবেই বিধিকে নিন্দা করা হইয়াছে। বাস্তবিক এই ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য কোনও ভাষা নাই; কোনও ইন্দ্রিয় নাই। যখন একটী ইন্দ্রিয়, কোনও গভীর ভাব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করে, আর সেই ইন্দ্রিয়ের শক্তিতে কুলায়না, তখনই, এইরূপ মনে হয় যে, সহস্র জিহ্বা ইত্যাদি হইলে, এই ভাব ব্যক্ত করা যাইত।

মহাপ্রভুর ভাবের অবধি নাই। দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া কত ভাবেই যে, মহাপ্রভু প্রেমের বিকার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। বিরহই তাহার কেন্দ্রস্থল,—সেখান হইতেই সমস্ত ভাবের উদ্ভব হইয়াছে। এইভাব প্রকাশ করিবার জন্য, বিদ্যাপতি ও জয়দেব হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

মাধব পেখনু সে ধনি রাই।
চিত-পুতলী জনু এক দিঠে চাই॥
বেঢ়ল সকল সখী চৌপাশা।
অতি ক্ষীণ শ্বাস বহত তহ নাসা॥

অতি ক্ষীণ তঁনু জনু কাঞ্চন রেহা।
হেরইতে কোই না ধন নিজ দেহা॥
কঙ্কণ বলিয়া গলিত দুই হাত।
খুলল কবরী না সম্বরি মাথ॥
চেতন মুরছন বুঝই না পারি।
অনুক্ষণ ঘোর বিরহ-জ্বর ভারি॥
বিদ্যাপতি কহে নিরদয় দেহ।
তেজল অব জগজন-অনুলেহ॥

(বিদ্যাপতি।)

মাধব কত পারবো রাধা।
হা হরি হা হরি কহত হি বেরি বেরি
অব জীউ করব সমাধা॥
ধরণী ধরিয়া ধনি যতন হি বৈঠত
পুনহি উঠই নাহি পারা।
সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী
বৈরী মদন-শর বিরহা॥
অরুণ-নয়ান-লোরে তিতল কলেবরে
বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরিগণ তহি শেষা॥

কি কহব খেদ ভেদ জনু অন্তর
ঘন ঘন উতপত শ্বাস।
ভণয়ে বিদ্যাপতি সোই কলাবতী
জীবন বন্ধন আশ পাশ ॥
(বিদ্যাপতি।)

ভাব-সম্মিলনে আনন্দ হইয়াছে, সাময়িক বিরহে নিবৃত্তি হইয়াছে ; তাই বিদ্যাপতি প্রকাশ করিতেছেন—

কি কহব রে আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর ॥
পাপ সুধাকর যত দুঃখ দেল।
পিয়া-মুখ-দরশনে তত সুখ ভেল ॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম পিয়া দূরদেশে না পাঠাই ॥
শীতের ওঢ়নী পিয়া গিরীষের বা,।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না, ॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
সুজনক দুঃখ দিবস দুই চারি ॥
(বিদ্যাপতি।)

জয়দেব—

পশ্যতি দিশি দিশি রহসি ভবন্তম্
ত্বদধর-মধুর-মধুনি পিবন্তম্।

নাথ হরে সীদতি রাধা বাস-গৃহে ।
ত্বদভিসরণ-রভসেন স্খলন্তী
পততি পদানি কিয়ন্তি চলন্তী ।
বিহিত-বিশদ-বিস-কিশলয়-বলয়া
জীবতি পরমিহ তব রতি-কলয়া ।
মুহুরবলোকিত-মণ্ডন লীলা
মধুরিপুরহমিতি ভাবন-শীলা ।
ত্বরিতমুপৈতি ন কথমভিসারম্
হরিরিতি বদতি সখীমনুবারম্ ।
শ্লিষ্যতি চুম্বতি জলধর-কল্পম্
হরিরুপগত ইতি তিমিরমনল্পম্ ।
ভবতি বিলম্বিনি বিগলিত-লজ্জা
বিলপতি রোদিতি বাসক-সজ্জা ।
শ্রীজয়দেব-কবেরিদ-মুদিতম্
রসিকজনং তনুতামতি মুদিতম্ ।

এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়-নামকীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোক-বাহ্যঃ ॥

এই মহাভাবের লক্ষণ শ্রীমতীর যেরূপ হইয়াছিল, মহাপ্রভুরও সেইরূপ হইত। মহাপ্রভু কখনও ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিয়া, দীনভাবে প্রেমভিক্ষা করিতেছেন ; যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

অতি দৈন্যে পুনঃ মাগে দাস্য-ভক্তিদান।
আপনাকে করে সংসারী জীব অভিমান ॥

মহাপ্রভুর এই যে বিভোর অবস্থা, ইহাতেও তিনি ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য নাম সংকীর্ত্তন সম্বন্ধে উপদেশ দিতে ভুলেন নাই। যথা চৈতন্য-চরিতামৃতে—

নানা ভাব উঠে প্রভুর হর্ষ শোক রোষ
দৈন্য উদ্বেগ আদি উৎকণ্ঠা সন্তোষ।
সেই সেই ভাবে নিজে শ্লোক পড়িয়া
শ্লোকের অর্থ আস্বাদয়ে দুই বন্ধু লইয়া।
কোন দিন কোন ভাবে শ্লোক-পঠন।
সেই শ্লোক আস্বাদিতে রাত্রি জাগরণ।
হর্ষে প্রভু কহে শুন স্বরূপ রাম রায়।
নাম-সংকীর্ত্তন-কেলি পরম উপায়।
সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন,
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ।

নাম-সংকীর্ত্তনে হয় সর্ব্বানর্থ-নাশ
সর্ব্বশুভোদয় কৃষ্ণে পরম উল্লাস।
সর্ব্বশক্তি নামে দিল করিয়া বিভাগ
আমার দুর্দ্দৈব, নামে নাহি অনুরাগ।
যেরূপে লইলে নাম প্রেম উপজয়।
তাহার লক্ষণ শুন স্বরূপ রামরায়।
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া মহাপ্রভু যে লীলা করিয়াছেন, তাহা ভাষায় বর্ণনাতীত; আমরা আর কি লিখিব? মহাপ্রভুর ভাব এবং শ্রীমতীর ভাবের একত্ব দেখাইবার জন্য, কবিরাজ গোস্বামীর একটী পয়ার উদ্ধৃত করিতেছি।—

উদ্বেগে দিবস না যায় ক্ষণে যুগ সম;
বর্ষার মেঘ-প্রায় অশ্রু বর্ষে নয়ন।
গোবিন্দ-বিরহে শূন্য হইল ত্রিভুবন;
তুষানলে পোড়ে যেন না যায় জীবন।
কৃষ্ণ উদাসীন হইল করিতে পরীক্ষণ;
সখী সব কহে "কৃষ্ণে কর উপেক্ষণ"।
এতেক চিন্তিতে রাধার নির্ম্মল হৃদয়;
স্বাভাবিক প্রেমার স্বভাব করিল উদয়।

ঈর্ষা, উৎকণ্ঠা, দৈন্য, প্রৌঢ়ি, বিনয় ;
এত ভাবে এক ঠাঁই করিল উদয়।
এত ভাবে রাধার মন অস্থির হইল ;
সখীগণ আগে প্রৌঢ়ি শ্লোক যে পড়িল।
সেই ভাবে প্রভু সেই শ্লোক উচ্চারিল ;
শ্লোক উচ্চারিতে তদ্রূপ আপনি হইল।

শ্লোক যথা—

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মা-
মদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু সএব নাপরঃ॥"

তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া পাদসেবাতেই নিয়োগ করুন, বা মহাদুঃখে পাতিত করিয়া নিষ্পেষিতাই করুন, কিম্বা আমাকে দর্শনসুখে বঞ্চিতা রাখিয়া নিদারুণ মর্ম্মপীড়াই প্রদান করুন, কিম্বা বহুবল্লভ হইয়া যথেচ্ছা বিহারই করুন, হে সখি! তিনি পর নহেন, আমারই প্রাণনাথ। এই বলিয়া আবার কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোক উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন।—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং ত্বদলোক-কাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহং।

দীন আমরা, আমাদের হৃদয়ও যেন দীনদয়ার্দ্রনাথ মথুরানাথের জন্য ব্যাকুল হইয়া কৃতার্থ হয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চরণে এই প্রার্থনা করিয়া, আমরা এইখানেই মহামহীয়সী, পরম-ভাবময়ী, রসময়ী গম্ভীরা-লীলার দিগ্‌দর্শনমাত্র করিয়াই উপসংহার করিলাম।

প্রভুর অপ্রকট।

এতক্ষণ পর্য্যন্ত গম্ভীরা লীলাতে ছিলাম। মহাপ্রভু বিরহের দুঃখে বিভোর ছিলেন। যদিও বিরহকে দুঃখ বলা যায়, বাস্তবিক বিরহ দুঃখ নহে, সুখের চরমসীমা,—প্রেমের শেষ অবস্থা। ইহাতে সুখের এবং দুঃখের একত্র মিশ্রণ; এই ব্যাপারে সুখেরও অবধি নাই, দুঃখেরও অবধি নাই,—বিষামৃতে একত্র মিলন।

পিরীত সুখের সাগর দেখিয়া
নাহিতে নামিলাম তায়।
নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে
লাগিল দুঃখের বায়॥
কিবা নিরমল, প্রেম-সরোবর,
নিরমল তার জল।

দুঃখের মকর ফিরে নিরন্তর
প্রাণ করে টলমল ॥
গুরুজন-জ্বালা জলের শিহালা
পড়স জীয়ল মাছে।
কুল পাণীফল কাঁটা যে সকল,
সলিল বেড়িয়া আছে ॥
কলঙ্ক-পানায় সদা লাগে গায়
ছাঁকিয়া খাইল যদি।
অন্তর বাহিরে কুটু কুটু করে
সুখে দুঃখ দিল বিধি ॥
কহে চণ্ডীদাস শুন বিনোদিনী
সুখ দুঃখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুঃখ যায় তার ঠাঞি ॥

যে এই পিরীতি করে, যদিও সে দিবারাত্র পুড়িয়া মরে, তবু ইহার "লেহা" ছাড়িয়া উঠিতে পারে না। দিন রাত এই দুঃখে জড়িয়া থাকিতেই সুখ বোধ করে। এতক্ষণ পাঠক-বর্গকে এই সুখ দুঃখের ভিতরে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। এখন এই স্তর পরিত্যাগ করিয়া, আমরা গভীরতর শোকের স্রোতে পাঠককে ভাসাইতে বাধ্য হইতেছি। গম্ভীরা-

লীলার পরই, মহাপ্রভু, ১৪৫৫ শকের আষাঢ় মাসের সপ্তমী তিথিতে, ৪৮বৎসর বয়ঃক্রমে, অপ্রকট হন। নবদ্বীপের ভক্তগণ রাসের সময় সকলে আসিয়াছেন। মহাপ্রভু তাঁহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বৃন্দাবনের কথা কহিতেছেন। যথা চৈতন্যমঙ্গলে—

হেন কালে মহাপ্রভু কাশীমিশ্র-ঘরে।
বৃন্দাবন-কথা কহে আনন্দ-অন্তরে॥

মহাপ্রভুর তিরোভাব সম্বন্ধে ৺ক্ষেত্রধামে দুই রকমের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। অদ্যাপি টোটাগোপীনাথের ঠাকুর দর্শন করিতে গেলে, পাণ্ডারা ঠাকুরের জানুদেশে ফাটা দেখাইয়া বলে যে, এই স্থান দিয়া মহাপ্রভু গোপী-নাথের দেহে প্রবেশ করিয়াছেন। গোপীনাথের দেহে প্রবেশ করিতে হইলে যে, ফাটা স্থান দিয়া প্রবেশ করিতে হইবে, এইরূপ কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। তবে ঈশ্বরেচ্ছা কি, তাহা কিছু বুঝা যায় না। ভক্তদিগের নিকট এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করার জন্য, যদি মহাপ্রভুর ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সবই সম্ভবে। পাণ্ডামহলে এইরূপই শুনা যায় যে, তিনি গোপীনাথের দেহে প্রবেশ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু অমিয় নিমাই চরিত ষষ্ঠখণ্ডে, মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়া সম্বন্ধে, স্বর্গীয় শিশির বাবু যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রমাণিত করিয়াছেন যে,

মহাপ্রভু জগন্নাথের দেহেই লীন হইয়াছেন। যথা অমিয়-নিমাই চরিত ষষ্ঠ খণ্ডে উদ্ধৃত চৈতন্যমঙ্গলে—

ভক্তি ইচ্ছা দেখি কহে পড়িছা তখন।
গুঞ্জা-বাড়ির মধ্যে প্রভুর হইল অদর্শন॥
সাক্ষাতে দেখি গৌর প্রভুর মিলন।
নিশ্চয় করিয়া কহি শুন সর্ব্বজন॥

শিশির বাবুর নিজের মতও উদ্ধৃত করিলাম—"আমাদের প্রভু যাইবার বেলা আমাদিগকে জগন্নাথদেবের হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন। সঁপিয়া দিয়া আবার সেই জগন্নাথের হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন।"

আমাদের প্রভু জগন্নাথেই বিলীন হউন, অথবা গোপীনাথেই বিলীন হউন, তাঁহার ভিতরেই, তিনি বিলীন হইলেন, ইহা নিশ্চিত হইল। জগন্নাথময় গৌরভক্ত-বৃন্দের ভিতরে মহা ক্রন্দনের রোল উঠিয়া গেল। এই কথা শুনিবামাত্র, স্বরূপ, তাঁহার প্রাণসর্ব্বস্ব গৌরাঙ্গকে হারাইয়া, আর জীবন রাখিতে পারিলেন না। তিনি বুক ফাঁড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ মৃতপ্রায় হইয়া চেতনা লাভ করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোভাবে যে, কি দুঃখ হইয়াছিল, কেবল গৌর-ভক্তেরাই তাহার অনুভূতি করিতে পারিবেন! আমাদের বুঝাইবার চেষ্টা বৃথা! যদিও এই সমস্ত ভক্ত ইন্দ্রিয়-বিজয়ী, পরমজ্ঞানী,—তবু মহাপ্রভুর

তিরোভাবে এত ব্যাকুল হইলেন কেন, কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। এই প্রেমের রাজ্যে জ্ঞানের কঠোরতা নাই, অথচ, জড়-জগতের সাধারণ জীবের ন্যায় স্নেহ মমতা হইতে একটু স্বতন্ত্র। এই সব ভক্তের হৃদয় কর্ত্তব্য-পালনে বজ্র হইতেও কঠিন, আবার সময়ে, কুসুম হইতেও সুকোমল।

জয়দেব।

এখন আমরা আর এক মহাপুরুষের কথা উল্লেখ করিব, যাঁহার সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বিশেষ একটি লীলা-প্রসঙ্গের সংযোগ রহিয়াছে। ইঁহার নাম শ্রীজয়দেব। ইঁহার জন্মভূমি নিয়া মতদ্বৈধ আছে। কেহ বলেন, ইঁহার জন্মভূমি কটক জিলায়; কেহ বলেন, বর্দ্ধমানের অন্তর্গত কেন্দুবিল্ব গ্রাম। এই কেন্দুবিল্বগ্রামে জয়দেবের স্মৃতির জন্য বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে। সুতরাং কেন্দুবিল্বই ইঁহার জন্মভূমি, তাহা একরূপ প্রমাণিত হইয়াছে। ইনি লক্ষ্মণ-সেনের সমকালীন এবং তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার গীতগোবিন্দ-গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন :—

বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধাং গিরং
জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।

শৃঙ্গারোত্তর-সৎপ্রমেয়-রচনৈরাচার্য্য-গোবর্দ্ধন-
স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়ী
কবিঃ ক্ষ্মাপতেঃ ॥

এই শ্লোকের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি—উমাপতি, শরণ, ধোয়ী, গোবর্দ্ধনাচার্য্য ও জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ সমকালীন। ইঁহারা লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত, সুতরাং জয়দেবও যে, এই সভার সহিত বিশেষ সম্পর্কান্বিত, তাহা বুঝা যায়। অন্যান্য গ্রন্থের মতামতের সহিত একবাক্যতা করিলে, তিনি যে, লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। গোবর্দ্ধন পণ্ডিত লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের ইতিহাস লিখিতে গিয়াও জয়দেব সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তমাল-লেখক বনমালী দাস তাঁহার রচিত জয়দেব-চরিত্ত গ্রন্থে জয়দেবের বাসস্থান কেন্দুবিল্বতেই নির্ণয় করিয়াছেন। অদ্যাবধিও কেন্দুবিল্বে জয়দেবের বাসস্থান বলিয়া, মকর-সংক্রান্তিতে সমস্ত লোক সমবেত হয়, এবং অজয় নদীতে স্নান করে।

এইরূপ চির-প্রসিদ্ধ জনপ্রবাদের বিরুদ্ধে অন্য কোনও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহাতে জয়দেবের বাসভূমি অন্য স্থানে কল্পনা করা যাইতে পারে। গীতগোবিন্দের শ্লোক পাঠ করিলে সহজেই মনে হয়, ইহা যেন বাঙ্গালা রচনা; কেবল সংস্কৃতের বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। যদি

তিনি বাঙ্গালী না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনা এরূপ হইত কি না সন্দেহ। কেহ কেহ জয়দেবের জন্মভূমি যে উড়িষ্যাতে বলেন, সে মত সমর্থন করিবার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং আমরাও জয়দেবের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশেই ধরিয়া লইলাম।

যদিও জয়দেবের জন্মভূমি বাঙ্গালাদেশ, তথাপি এই মহাপুরুষের প্রকৃত পূজা এবং এই সাধুপুরুষের প্রকৃত-তত্ত্ব বাঙ্গালী বুঝিতে পারে নাই। উড়িষ্যাতে জয়দেব যেরূপ ভাবে পূজিত হইতেন, এবং এখনও হইতেছেন, আমাদের দেশে জয়দেবকে সেরূপ ভাবে কে পূজা করে? রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত, জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দের গান গাহিয়া থাকে, এবং জগন্নাথের মন্দিরে নিত্য এই গীতগোবিন্দ গীত হইয়া থাকে।

এখন আমরা জয়দেবের ঐতিহাসিক অংশ ছাড়িয়া দিয়া, তাঁহার যে প্রকৃত গুণ, যে গুণে তিনি চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, যে গুণেতে ভক্তমণ্ডলী অদ্যাবধি তাঁহাকে পূজা করিতেছেন, তাহারই একটু আলোচনা করিব।

জয়দেব একজন পরমভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণিত আছে, তাহা বিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত যুবকদের অনেকে বিশ্বাস নাও করিতে পারেন। বিশ্বাস না করিলে, এই সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস জন্মানও কঠিন, এবং তজ্জন্য আমরা প্রয়াসীও হইব না।

"বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" ইহাই আমাদের বিশ্বাস; সুতরাং অনর্থক বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করায় ফল নাই। শ্রীজয়দেবেরও এই বিশ্বাস ছিল, প্রমাণস্বরূপ গীতগোবিন্দের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি :—

"যদি হরি-স্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্।
মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্॥"

জয়দেবের বাল্য-জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। জয়দেবের বাল্য-জীবনের পর, যখন ভক্তির জীবন আরম্ভ হইল, তখনই তাঁহাকে পুরীধামে দেখিতে পাই। যখন তাঁহার ভক্তির সৌরভ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতে থাকে, তখনই বিশ্ববাসী তাঁহাকে চিনিতে পারিল। জয়দেব একাধারে ভক্ত, কবি এবং গায়ক; কাজেই তাঁহার পরিচিত হওয়ার অতি সহজ সুযোগ ছিল। ভক্তেরা সাধারণতঃ প্রচ্ছন্ন থাকিতে চান,—বহির্জগতের সহিত তাঁহারা সম্পর্ক কম রাখেন। কিন্তু জয়দেবের সম্বন্ধে তাহা ঘটিতে পারিল না। তিনি প্রত্যহই তাঁহার গীতগোবিন্দের গান রচনা করিতেন, এবং প্রত্যহই জগন্নাথদেবকে গাহিয়া শুনাইতেন। যদিও লোককে শুনাইবার জন্য তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না,—ভগবানকে শুনানই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু একে

জয়দেবের মনোহারিণী কবিতা, তাহাতে জয়দেবের ভক্তিমিশ্রিত কণ্ঠ—উভয়ে মিলিয়া সেই গান এত সুমধুর হইয়াছিল যে, সমস্ত লোক তাহা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইল।

এইরূপে জয়দেব বাহিরে প্রকাশিত হইলেন। পুরীধামময় তাঁহার নাম ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল,—কণ্ঠে কণ্ঠে তাঁহার আলোচনা হইতে লাগিল। জয়দেবের গানের কথা অল্প দিনের মধ্যেই রাজ-দরবারে পৌঁছিল। রাজা স্বয়ং আসিয়া সেই গান শুনিবার জন্য মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। এখন হইতে জয়দেব পুরীর রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন। যদিও রাজার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল, কিন্তু বিষয়ীর সঙ্গে থাকাতেও তাঁহার সাধন ভজনের কোনও বিঘ্ন হইল না। এই সময়ে তিনি গীতগোবিন্দের "মান" লিখিতেছিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের অনেকগুলি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে।

জয়দেব যখন গীতগোবিন্দের কৃষ্ণলীলা গানে উন্মত্ত ছিলেন, সেই সময়ে দক্ষিণদেশ হইতে এক হরিভক্ত ব্রাহ্মণ জগন্নাথদেবের নিকট উপনীত হন। তাঁহার সঙ্গে পদ্মাবতী নাম্নী দ্বাদশ বর্ষীয়া তাঁহার একটী কন্যা ছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান ছিলেন। একদা জগন্নাথদর্শনোপলক্ষে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে আসিয়া, সেই ব্রাহ্মণ একান্তমনে প্রার্থনা করিলেন যে, জগন্নাথদেব কৃপা করিয়া,

যদি তাঁহাকে একটী পুত্র কিম্বা কন্যা-সন্তান প্রদান করেন, তবে পুত্র হইলে দাস এবং কন্যা হইলে দাসী করিয়া জগন্নাথ-দেবকে সমর্পণ করিবেন।

অতঃপর, কালক্রমে জগন্নাথদেবের কৃপায় তাঁহার এক কন্যা-সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণ তাহার নাম পদ্মাবতী রাখিলেন। এখন পদ্মাবতীর বয়স দ্বাদশ বৎসর। সেই পদ্মাবতীকে জগন্নাথ-দেবের নিকট সমর্পণ করিবার জন্য, ব্রাহ্মণ অদ্য এইখানে উপস্থিত হইয়াছেন। রজনীযোগে জগন্নাথদেব ব্রাহ্মণকে স্বপ্নে আদেশ করিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ, তোমার প্রতিজ্ঞাপূর্ণ হইয়াছে; আমি তোমার কন্যা গ্রহণ করিলাম; কিন্তু তুমি আমার এক আদেশ পালন কর। অজয়-নদীর তীরে কেন্দুবিল্ব নামে এক গ্রাম আছে। তথায় আমার অংশে ব্রাহ্মণ-কুলে জয়দেব নামে একজন হরিভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তুমি তথায় যাইয়া, তাঁহাকে তোমার কন্যা সম্প্রদান কর। তাহা হইলে আমি পরম পরিতুষ্ট হইব।"

এই আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, ব্রাহ্মণ কেন্দুবিল্বে উপস্থিত হইলেন. এবং ভক্ত-শিরোমণি জয়দেবকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিবার জন্য, জয়দেবকে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে, তিনি পদ্মাবতীকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন :—

"স্বপ্নে জয়দেব কহে যে আজ্ঞা তোমার।
তোমার যে আজ্ঞা তাহা মোর অঙ্গীকার॥
মোর এক নিবেদন শুন মহাশয়।
প্রার্থনা করিয়ে যদি কার্য্যসিদ্ধি হয়॥
কৃষ্ণ-লীলা-গ্রন্থ এক বর্ণন করিব।
রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি রাখি তোমারে সেবিব॥
এই দুই বাঞ্ছা যদি পূরাহ আমার।
তবে জানি মোর প্রতি সুদৃষ্টি তোমার॥
প্রভু কহে দুই বাঞ্ছা হইবে পূরণ।
গীতগোবিন্দ-গ্রন্থ তুমি করহ রচন॥
কৃষ্ণ-লীলা সর্ব্ব যাহা কেহ নাহি জানে।
অনায়াসে জানিবে তুমি আপনার মনে॥
সেই গ্রন্থ শুনিলে ভক্তের আনন্দ জন্মাব।
সেবা যে করিবে তাহার নির্ণীত কহিব॥
এই কেন্দুবিল্ব মোর পুরাতন ধাম।
কত দিন কর তুমি ইহাতে বিশ্রাম॥"

বনমালী দাসের এই জয়দেব-চরিত অনুসারে, জয়দেব যে কখনও পুরীধামে গিয়াছেন, এইরূপ বুঝা যায় না। পক্ষান্তরে চন্দ্রদত্ত-কৃত সংস্কৃত ভক্তমাল-গ্রন্থে জয়দেবের জন্মভূমি পুরীতে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জয়দেব যে

কখনও বঙ্গদেশে আসিয়াছেন, কিম্বা বৃন্দাবনে গিয়াছেন, তিনি এরূপ কোনও উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং ইঁহাদের পরস্পর বিরোধ দেখা যায়। বনমালী দাসের উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও জয়দেব যে পুরীতে কোনও সময়ে গিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। কারণ জয়দেবের ঘটনাবলী এবং তাঁহার গীতগোবিন্দ পুরীধামে এতই প্রচলিত যে, জয়দেব সে স্থানে কতকদিন পর্য্যন্ত বাস না করিলে, এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন না। এই উভয়ের পরস্পর বিরোধের মীমাংসা পাঠক করিবেন। আমরা কেবল উভয়ের মত অবলম্বনে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ঠাকুর বলেন স্বপ্নে আজ্ঞা মোরে হইল।
বিবাহ করিব কন্যা অঙ্গীকার কৈল॥
কিন্তু এক চমৎকার স্বপ্নেতে দেখিল।
রাধাকৃষ্ণ-মূর্ত্তি সেবা প্রভু মোরে দিল॥
কদম্বখণ্ডীর ঘাটে অজয় কিনারে।
এক হাঁটু জল মধ্যে তাহে শোভা করে॥
চল শীঘ্র সবে যাব তাঁহা দরশন।
তাঁহারে আনিলে মোর বাঞ্ছিত পূরণ॥

অতঃপর, সমস্ত গ্রামবাসী ও জয়দেব একত্র হইয়া, অজয় নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন।—

উভৌ তৌ দম্পতী তত্র

একপ্রাণৌ বভূবতুঃ

নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন তৎপরৌ।

জয়দেব ও পদ্মাবতী ঠাকুরবাড়ীতে নৃত্য করিতেছেন

পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্ত্তী—

হেনকালে জয়দেব ঠাকুর মহাশয়।
অজয়ের জলে গেল হইয়া হৃষ্টময় ॥
এক হাঁটু জল মধ্যে তাহে হাত দিলা।
সিংহাসনে প্রতিমা দুই হাতে উঠাইলা ॥
রূপ দেখি সর্ব্বলোকের বিস্ময় হইল।
সাক্ষাৎ রাধাকৃষ্ণ যেন অবতীর্ণ হইল ॥

তৎকালে বর্দ্ধমানের রাজা এই দুই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বহু অর্থব্যয়ে শ্রীরাধামাধবের চারি মহল পুরী নির্ম্মাণ করাইয়া, অষ্টকালীন সেবার সুবন্দোবস্ত করেন। তখন জয়দেব পদ্মাবতীর শুভ-পরিণয় কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। এখন হইতে জয়দেব ও পদ্মাবতী শ্রীরাধা-মাধবের সেবায় নিরত রহিলেন। বনমালী দাস তাঁহাদের নিত্য-কার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন। যথা——

"রাত্রিশেষে উঠি মঙ্গল-আরতি করিয়া।
প্রাতঃকালে সুকুসুম আনেন তুলিয়া ॥
পদ্মাবতী নানারঙ্গে গাঁথে ফুলহার।
গীত-গোবিন্দ রচে গ্রন্থ কৃষ্ণ-লীলা-সার ॥
নিত্য সেবা করয়ে আনন্দিত দুইজন।
এই মত বহুদিন করিল সেবন ॥

গীত-গোবিন্দ-গ্রন্থ রসের সাগর।
বর্ণন করয়ে যবে সেবা অবসর ॥

ইতঃপর গীত-গোবিন্দ লেখার উপলক্ষে, যে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে বনমালীদাস ও ভক্তমাল প্রভৃতি রচয়িতা অন্যান্য গ্রন্থকার সকলেই এক মত। কেবল বিশেষের মধ্যে এই,—কেহ এই ঘটনার স্থল কেন্দুবিল্বে নির্দ্দেশ করেন, কেহ বা পুরীতে নির্দ্দেশ করেন। একদিন জয়দেব "মান" লিখিতে বসিয়া "স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরশি মণ্ডনং" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াছেন, তখন আরঃ লেখনী অগ্রসর হইল না। যথা বনমালি দাস—

"স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং"
এই অর্দ্ধ উক্তি লিখি আর না লিখিলা।
পূর্ণ নাহি হয় কলি ভাবিতে লাগিলা ॥
শ্রীরাধিকার মানে কৃষ্ণের দগ্ধ হয় অঙ্গ।
স্তুতি-বাণী কহে চাহে রাধা-অঙ্গ-সঙ্গ ॥
তুয়া সঙ্গ বিনা মোর মদনের শরে।
শরের গরলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে ॥
মান ত্যাজি কৃপা করি পরশ মোরে তুমি।
মদন-অনল হইতে রক্ষা পাই আমি ॥
এত বলি নিজ শির নম্র করি যায়।
পাদ-পদ্ম দেহ মাথে এই সে আশয় ॥

কৃষ্ণ চাহে পাদ-পদ্ম মস্তকে ধরিতে।
কেমতে লিখিব ইহা বিস্ময় এই চিতে ॥
এই ভাবি পদের শেষ লিখিতে নারিল।
কি লিখিব কি লিখিব চিন্তিতে লাগিল ॥
উদ্বিগ্ন হইয়া অতি গ্রন্থ ঝাঁপি দিলা।
গঙ্গাস্নান করিবারে ঠাকুর চলিলা ॥
উদ্বিগ্ন হইয়া যবে গঙ্গাস্নানে গেলা।
অন্তর্য্যামী নন্দসুত সকল জানিলা ॥
ভকতের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ করিবারে।
জয়দেব মূর্ত্তি ধরি আইলা তার ঘরে ॥
স্নান করি জয়দেব আইসে যেন মতে।
সেইরূপে দাঁড়াইলা পদ্মার সাক্ষাতে ॥
স্বামী-জ্ঞানে পদ্মাবতী পাদ প্রক্ষালিল।
কেশে করি পাদ-পদ্ম দুখানি মুছিল ॥
দিব্য পীত বস্ত্র তাঁরে পরিবারে দিলা।
আনন্দিত হইয়া প্রভু আসনে বসিলা ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপন দেবী করিলা চন্দন।
গন্ধ পুষ্প দিয়া পূজা করিল চরণ ॥
প্রত্যহ করেন দেবী সেই আচরণে।
সেই মত কৈলা দেবী নিজ পতিজ্ঞানে ॥

জয়দেব-রূপে প্রভু সেবা কাজে গেলা।
রাধা-মাধবেরে লইয়া স্নান করাইলা॥
পূজা আদি করি দিলা নৈবেদ্য সেবন।
তণ্ডুল শর্করা গব্য আদি দ্রব্যগণ॥
রাধা-মাধবেরে ভোগ প্রভু সমর্পিলা।
তাম্বূলাদি দিয়া ভোগ আরতি করিলা॥
আরতি করাইয়া পুনঃ করাইল শয়ন।
তার পর কইল প্রভু চামর-ব্যাজন॥
তার পর অন্তঃপুরে প্রসাদ আনিল।
সেই থালে বসি প্রভু ভোজন করিল॥
ভোজন করিয়া প্রভু কৈলা আচমন।
আসনে বসিয়া কৈল তাম্বূল ভক্ষণ॥
তার পর যাঞা গ্রন্থের ঝাঁপ ঘুচাইলা।
পদের শেষ হয় নাই গ্রন্থেতে দেখিলা॥

অতঃপর, শ্রীকৃষ্ণ নিজ হস্তে "স্মর-গরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" পংক্তির পরে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই পংক্তিটি লিখিয়া পালঙ্কে শয়ন করিয়া রহিলেন। পদ্মাবতী শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট-পূর্ণ ভোজনপাত্রে বসিয়া প্রসাদান্ন ভোজন করিতেছেন, এমন সময়, জয়দেব আর্দ্রবস্ত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া—

জয়দেববেশে ভগবান 'দেহি পদপল্লবমুদারং' লিখিতেছেন।

ভোজন করয়ে পদ্মা দেখি আচম্বিত।
আশ্চর্য্য দেখিয়া মনে হইলা বিস্মিত॥
পদ্মাবতী নিকটেতে আসি দাণ্ডাইলা।
অন্তরে দুঃখিত হঞা কহিতে লাগিলা॥
অনুচিত কর্ম্ম তোমার দেখি পদ্মাবতী।
জ্ঞানবান্ হঞা তোমার এমত কুমতি॥
ঈশ্বরের সেবা নহে ভোগ-সমর্পণ।
স্বচ্ছন্দেতে অগ্রভাগ করিলা ভোজন॥
সচ্চরিত্রা সুলক্ষণা নাহি তুয়া সম।
আজি কেনে কিবা দোষে হৈলা মতিভ্রম॥
এত শুনি পদ্মাবতী হইলা চমকিত।
আজি কেন প্রভু মোরে বল অনুচিত॥
আজি যবে স্নান করি আইলা আপনি।
পূর্ব্বমত পূজা আমি কৈলা দ্বিজমণি॥
তার পর সেবা পূজা আপনি করিলা।
রাধা-মাধবের ভোগ তুমি সমর্পিলা॥
প্রসাদান্ন থালে তুমি ভোজন করিলা।
তারপরে গ্রন্থ খুলি তাহাতে লিখিলা॥
তাম্বূল ভোজন করি করিলা শয়ন।
এ সকল করি পুনঃ হৈলা বিস্মরণ॥

পুনঃ স্নান করি আইলা লাগে হেন মত।
পরিহাস কর কিম্বা ভ্রম হইল নাথ॥
তোমার প্রসাদি অন্ন করি এ ভোজন।
আজ্ঞা কৈলা অগ্রভাগ করহ ভক্ষণ॥
যে সব কহিলা প্রভু পরিহাস-বাণী।
লজ্জা পাই তোমার কৌশল-বাক্য শুনি

জয়দেব তখন ভাবিলেন—

মিথ্যা বাক্য পদ্মাবতী কভু নাহি কহে।
এমত কুচ্ছিত কর্ম্ম তারে শোভা নহে॥

তখন জয়দেব ভাবিলেন, হয়ত স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই জয়দেব-বেশে দেখা দিয়া, পদ্মাবতীকে কৃতার্থ করিয়াছেন। এই মনে করিয়া তিনি ত্বরিত গমনে যাইয়া—

এক চিত্তে গ্রন্থ-পাত খুলিল ঠাকুর।
অর্দ্ধকলি ছিল পদ হইয়াছে পূর॥
অর্দ্ধকলি পূর্ব্বে কৈল জয়দেব সার!
কৃষ্ণ-হস্তে দেখি পদপল্লবমুদার॥
পদ পূর্ণ দেখি মনে হইল প্রত্যয়।
কৃষ্ণ পূর্ণ কৈল মম মনের আশয়॥
শয়নে আছে ত প্রভু মনে অভিপ্রায়।
মন্দির-ভিতরে প্রভু দেখিবারে যায়॥

কৃষ্ণ-অঙ্গ-পরিমলে পালঙ্ক পূরিল।
মনোহর সুগন্ধেতে নাসিকা মাতিল॥
শয়নের চিহ্ন সব দেখিল শয্যাতে।
শয্যা মাত্রে আছে কৃষ্ণ না পায় দেখিতে॥
উনমত্ত হইয়া দ্বিজ নাচিতে লাগিলা।
মোর গৃহে আসি প্রভু পুনঃ কোথা গেলা॥
মহাভাব হৈল দেহ পুলকাঙ্গময়।
পুলকিত হৈল অঙ্গ শিখা ঊর্দ্ধ হয়॥
নয়নে বহয়ে ধারা প্রেমের তরঙ্গে।
ঊর্দ্ধ বাহু করি নাচে করে কত ঢঙ্গে॥
শয্যা দেখি প্রেম-ময়ে করিয়া ভকতি।
করজোড়ে স্তব পাঠ করে স্তুতি নতি॥
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে রাধা-মাধব বলিয়া।
পদ্মারে কৃতার্থ কৈলা আমারে ভাণ্ডিয়া॥

তারপর, জয়দেব বাহ্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া —

বাহির হইয়া আইলা পদ্মার নিকটে।
স্তুতি-বাক্য কহিতে লাগিলা অকপটে॥
তুমি মহা-ভাগ্যবতী সফল জীবন।
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম তুমি দেখিলা নয়ন॥

কৃষ্ণ-অঙ্গ পরসিয়া লেপিলা চন্দন।
ধন্য তুমি মহা-প্রসাদ করিলা ভোজন॥
সেই প্রসাদ শনকাদি শম্ভু বাঞ্ছা করে।
হেন প্রসাদ তুয়া গুণে আমার মন্দিরে॥
এত বলি পদ্মাসঙ্গে করয়ে ভোজন।
পুনঃ পুনঃ প্রসাদেরে করএ বন্দন॥
ইহা দেখি পদ্মাবতী হইলা বিস্ময়।
জোড়-হস্ত করি কহে করিয়া বিনয়॥
এই প্রসাদান্ন থাল উচ্ছিষ্ট আমার।
উচ্ছিষ্ট ভোজন কর কোন ব্যবহার॥
দ্বিজমণি কহে তুমি অপরাধ কৈলা।
কৃষ্ণ-অধরামৃত তুমি উচ্ছিষ্ট কহিলা॥
মহাপ্রসাদান্ন কভু উচ্ছিষ্ট না হয়।
শ্বান-মুখ হৈতে পড়ে ব্রহ্মা নিতে ধায়॥

* * * * * *

এত শুনি পদ্মাবতীর বিস্ময় ঘুচিল।
একত্রে আনন্দে দোঁহে প্রসাদ খাইল।

এতদ্‌ব্যতীত জয়দেবের সম্বন্ধে আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা আছে। সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিলে, গ্রন্থ বাড়িয়া

যায়। আর দুই একটী মাত্র ঘনটার উল্লেখ করিয়া, আমরা জয়দেবের কাহিনী শেষ করিব।

সংস্কৃত ভক্তমাল-গ্রন্থে, গীত-গোবিন্দ ও জয়দেবের মাহাত্ম্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে এই গল্পটীর উল্লেখ আছে। পূর্ব্বেও আমরা ইহার উল্লেখ করিয়াছি। পুরীধামের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে এক শাক-বিক্রয়কারিণী বাস করিত। সে কোনও সময়ে বেগুণ তুলিতে তুলিতে গীতগোবিন্দ গাহিতে-ছিল, তাহা শুনিয়া জগন্নাথদেবের আসন টলিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ছুটিয়া আসিয়া সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতে লাগিলেন। বেগুণের কাঁটার আঁচড় লাগিয়া তাঁহার পীত-বসন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল।

পর দিন পাণ্ডারা যখন শ্রীমন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিলেন, তখন দেখা গেল বস্ত্রে বেগুণ কাঁটা সংলগ্ন রহিয়াছে, এবং স্থানে স্থানে কাপড় ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া, পাণ্ডারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া রাজাকে খবর দিলেন। রাজা শ্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া এই অদ্ভুত ব্যাপারের কোনও কারণ স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি ও পাণ্ডারা শ্রীমন্দিরে হত্যা দিলেন। তাঁহারা স্বপ্ন-যোগে দেখিতে পাইলেন, জগন্নাথ দেব আবির্ভূত হইয়া বলিতেছেন, "শাক-বিক্রয়কারিণীর গীতগোবিন্দ-গানে আকৃষ্ট হইয়া, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়াছিলাম,

তাহাতেই আমার কাপড় বেগুণের কাঁটায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে।" রাজা পর দিন প্রাতঃকালে ঐ শাক-বিক্রয়কারিণীকে আনাইলেন, এবং তাহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া, তাহার সুখে জীবন-যাপনের বন্দোবস্ত করিলেন, এবং প্রত্যহ প্রভুর সম্মুখে গীতগোবিন্দ-গানের আদেশ করিলেন। সেই নিয়মানুসারে অদ্যাবধিও প্রভুর সম্মুখে গীতগোবিন্দ-গান হইয়া আসিতেছে।

জয়দেবের শেষ জীবন, বনমালীদাসের গ্রন্থানুসারে বৃন্দাবনে অতিবাহিত হইয়াছিল দেখা যায়। জয়দেবের বৃন্দাবনে যাওযার সময়ে একটী প্রসঙ্গ আছে, তাহার উল্লেখ করিতেছি।

জয়দেব এবং পদ্মাবতীর বৃন্দাবনে যাওয়া ঠিক হইল; তাঁহাদের সেবিত ঠাকুর রাধামাধব-বিগ্রহ বৃন্দাবনের দীর্ঘ রাস্তার পক্ষে অত্যন্ত বড়মূর্ত্তি; সুতরাং এই বিগ্রহ কি করিয়া লইয়া যাইবেন, এইজন্য তাঁহারা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শ্রীশ্রীরাধামাধব স্বপ্নযোগে আদেশ করিলেন, "আমাকে ছাড়িয়া যাইও না। তোমাদের লইয়া যাওয়ার সুবিধার জন্য, আমি অত্যন্ত লঘু হইব।" জয়দেব এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। রাধামাধবকে তাঁহার পুটুলির মধ্যে পুরিয়া বৃন্দাবনে লইয়া গেলেন। এইরূপে ভগবান্ ভক্তবাৎসল্যের পরিচয় দিলেন।

জয়দেব এবং পদ্মাবতী কর্ত্তৃক রাধামাধবের সেবা এবং

পদ্মাবতীর পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আরও আখ্যায়িকা রহিয়া গেল, তাহার উল্লেখ করিতে পারিলাম না। জয়দেবের প্রতি পদ্মাবতীর এতই আসক্তি ছিল যে, তাঁহার মৃত্যুকথা শুনিবামাত্র পদ্মাবতী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। জয়দেবের সাধন-বলে কিন্তু তিনি পুনর্জ্জীবন লাভ করেন।

ভগবান্ ভক্তের নিকট যে কতদূর অধীন হন, জয়দেবের জীবনীপাঠ করিলে তাহার সবিশেষ উপলব্ধি হয়; এবং ভগবান্ যে ভক্তের বাঞ্ছা-কল্পতরু তাহাও প্রমাণিত হয়। এই গীত-গোবিন্দ কাব্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যেরূপ প্রিয়, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবেরও সেইরূপ প্রিয় ছিল। গম্ভীরা-লীলাতে, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতির পদাবলী, জয়দেবের গীত-গোবিন্দ, রায় রামানন্দের জগন্নাথ-বল্লভ নাটক, এই গুলিই তাঁহার ভাবোদ্দীপনার সহায় ছিল। এই বিষয় গম্ভীরা-লীলায় বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেবে প্রেমিকের প্রেম, ভক্তের ভক্তি, সুকবির কবিত্ব, সুগায়কের মধুর গীতি, একাধারে দেখিতে পাই। এরূপ দুর্ল্লভ চরিত্র অতি অল্পই পাওয়া যায়।

জয়দেবের মাতা পিতার পরিচয়, তাঁহার স্বরচিত গীত-গোবিন্দে এইরূপ দেখা যায়, যথা—

শ্রীভোজদেব-প্রভবস্য বামা-দেবীসুত-শ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদি-প্রিয়বন্ধু-কণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দ-কবিত্বমস্তু॥

মাধোদাস।

এই ভক্তের নামোল্লেখ না করিলে, বোধ হয়, জগন্নাথ দেবের সন্তুষ্টি হইবে না। তাঁহার প্রীতির জন্য, এই ভক্তের জীবনী এখানে সন্নিবিষ্ট করিতেছি। ইনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের অতি প্রিয় পাত্র,—সখ্য-ভাবে ইঁহার ভজন। ইনি আহারের জন্য কিছু মাত্র চেষ্টা করিতেন না,—অজগর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিতেন।

এক সময়ে তিনি এইরূপ উপবাসে আছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভোজনের জন্য স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী জগন্নাথের থালাতে ভোজন সামগ্রী আনিয়া, তাঁহার সম্মুখে দিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পরিলেন, স্বয়ং লক্ষ্মী তাঁহার ভোজনের জন্য জগন্নাথের থালাতে ভোজন-সামগ্রী আনিয়া তাঁহার সম্মুখে দিয়াছেন। মাধোদাস তাহা গ্রহণ করিলেন। থালাখানি সেখানে পড়িয়া রহিল। সকাল বেলা পাণ্ডারা থালা না পাইয়া, চতুর্দ্দিকে খুজিতে আরম্ভ করিলেন, অবশেষে মাধোদাসের নিকট থালা দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা মাধোদাসকে চোর মনে করিয়া, অত্যন্ত প্রহার করিলেন। মাধোদাসের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। রাত্রিযোগে ভগবান্ পাণ্ডাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন—"মাধোদাসকে যে তোরা প্রহার করিয়াছিস, সমস্তই আমার অঙ্গে লাগিয়াছে। এই থালা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাঁহাকে দিয়াছিলেন, তাঁহার প্রতি

মাধবদাস উপবিষ্ট। শ্রীকৃষ্ণ কাঁঠাল পাড়িতেছেন।

এইরূপ ব্যবহার, যেন আঁর কখন করা না হয়। সেই হইতে মাধোদাস জগন্নাথের বাড়ীতে আস্তানা করিলেন।

এক দিন শীতকালে মাধোদাসের গায়ে লেপ নাই, ভগবান্ তাঁহার লেপ মাধোদাসের গায়ে পরাইয়া দিলেন। এখন পাণ্ডারা বুঝিয়াছেন যে, ইহা ভগবানেরই খেলা। আর এক দিন রাত্রিতে জগন্নাথদেব মাধোদাসকে বলিলেন, —"আমার সঙ্গে এস।" মাধোদাস তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন ;—উভয়েই এক মহাজনের বাগানে প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর স্বয়ং কাঁঠাল পাড়িতে গাছে উঠিলেন। মাধোদাস বলিলেন,—"আমি গাছে উঠিতে পারিব না,— এই চুরি করা তোমারই কার্য্য। তুমি মাখন চুরি করিয়াছ, গোপিনীদের বস্ত্র-হরণ করিয়াছ,—এই যুগে কাঁঠাল চুরি কর।" ঠাকুর কাঁঠাল পাড়িলেন, শব্দেতে বাগানের মালীরা জাগিয়া উঠিল, এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইল। ঠাকুর মালীদের সাড়া পাইয়া পলাইলেন। মাধোদাস বন্দী হইলেন। মালীরা চোর বলিয়া তাঁহাকে কিছু প্রহারও করিল। মাধোদাস কেবলই বলেন, "যে চোর তাহাকে ধরিতে পারিলে না।" কিন্তু তাঁহার কথায় কেহই বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না।

রাত্রি প্রভাত হইল। ঠাকুরের অঙ্গের বসন নাই,— তখনই তাহার খোঁজ আরম্ভ হইল। পাণ্ডারা বস্ত্রান্বেষণ করিতে করিতে সেই বাগানে উপস্থিত হইলেন, এবং

মাধোদাসকে বন্দী অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। মাধোদাসকে সেই অবস্থায় দেখিয়া, তাঁহারা সমস্ত কথা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, ঠাকুরের বস্ত্র বাগানের বেড়ায় সংলগ্ন রহিয়াছে, তখন আর কিছু বুঝিতে বাকী রহিল না, প্রকৃত চোর স্থির হইল। বাগানের কর্তৃপক্ষীয়েরা তখন বাগানের সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া, জগন্নাথদেবকে উপহার দিতে লাগিলেন।

এদিকে মাধোদাস অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। জগন্নাথদেব তাঁহার প্রতি এইরূপ ছলনা করিলেন—ইহাই তাঁহার ক্রোধের কারণ। জগন্নাথের নিকট গিয়া, তিনি জগন্নাথকে নানারূপ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিলেন। "এত দিন গেল, এখনও তোমার চঞ্চলতা দূর হইল না। তুমি তোমার পুরাতন অভ্যাস একটুও ছাড়িতে পার নাই। পূর্ব্বে দ্বাপরযুগে গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করিয়াছ, মাখন চুরি করিয়াছ; সেই অভ্যাস বশতঃ, এখন আবার কাঁঠাল চুরি করিলে। নিজে করিয়াছিলে তা'ই ভাল, আমাকে আবার বিপন্ন করিলে কেন?" এইরূপ ভর্ৎসনাতে জগন্নাথ বেদস্তুতি অপেক্ষাও আনন্দ লাভ করিলেন।

এক সময়ে মাধোদাসের রক্ত-আমাশয়ের পীড়া হইয়াছিল। অত্যন্ত মলত্যাগের বেগ হওয়ায়, জলপাত্র না লইয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিলেন। শৌচের সময় ভাবিলেন, জলত আনা হয় নাই। এমন সময় একজন লোক জলপূর্ণ ঘটী

লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন মাধোদাস জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে হে বাপু, আমাকে জল যোগাইতেছ?" তখন ভগবান্ বলিলেন, "আমি তোমার জগন্নাথ।" মাধোদাস তখন বলিলেন, "তোমার যদি এতই দয়া, তবে আমার রোগটা সারাইয়া দিলেই ত পার। তাহা হইলে, আর তোমাকে জল যোগাইবার কষ্ট ভোগ করিতে হয় না।" তখন জগন্নাথ বলিলেন, "তোমার ভোগ শেষ হয় নাই, ভোগ শেষ না হইলে, আমি ব্যাধি সারাইতে পারি না।"

মা ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি।

ইহা দ্বারা ভগবান্ দেখাইলেন, যে তিনি ভক্তাধীন এবং ভোগ শেষ না হইলে, কর্ম্ম শেষ হয় না।

শ্রীশ্রীগঙ্গামাতা।

মাধোদাসের গল্প শেষ করিতে গিয়া, আরও একটী ভক্তের কথা মনে পড়িল, তাঁহার নাম গঙ্গামাতা। ইহাঁর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয় নাই, নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র, সুতরাং ইহাঁর বৃত্তান্ত না লিখিলে আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হয় না। বিশেষতঃ ইনি জগন্নাথের অতি নিজ জন। আর ইহাঁর নামে পুরীতে এক মঠও পরিচিত, এই মঠকে গঙ্গামাতা-মঠ বলে।

বৈষ্ণবগ্রন্থে পঞ্চরসের অবতারণা করিয়াছেন, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ইনি বাৎসল্য রসেতে

শ্রীশ্রীজগন্নাথকে সেবা করিতেন। জগন্নাথের যেরূপ সেবা ভোগ হইয়া থাকে তাঁহার মনের মত না হওয়ায় তিনি নিজ গৃহে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া জগন্নাথকে খাওয়াইবেন, ইহা তাঁহার মনের সাধ, কিন্তু কি করিয়া এই সাধ পূর্ণ হয়? পাণ্ডারা তাহার বিরোধী। অন্য স্থান হইতে প্রস্তুত করিয়া খাদ্য দ্রব্য আনিলে, তাহা পাণ্ডারা ভোগের জন্য গ্রহণ করেন না, অন্যের ভোগ দিবারও অধিকার নাই।

এখন গঙ্গামাতার তীব্র সাধ হইয়াছে তাঁহার জগন্নাথকে একটু মাছের ঝোল খাওয়াইবেন, বহুদিন যাবত জগন্নাথ মাছের ঝোল খায় না, কেবল নিরামিষ খাইয়া থাকে, ভক্তের প্রাণে ইহা কেমন করিয়া সহ্য হয়, এই রসের যে ভাব ইহা বেদ-বিধির অগোচর। তাই গঙ্গামাতা সমস্ত বিধিশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া রাগানুগামার্গে জগন্নাথকে মাছের ঝোল খাওয়াইবেন।

এখন কেমন করিয়া এই কামনা পূর্ণ হয় তাই ভাবিতে লাগিলেন। পাণ্ডারা টের পাইলে অনর্থ ঘটাইবে, অথচ না দিলেও নয়, সুতরাং সমস্ত বাধা বিপত্তিকে তুচ্ছ করিয়া, নিজ গৃহে জগন্নাথের জন্য মনের মতন করিয়া রন্ধন করিলেন, এবং অতি সাবধানে গোপনে হাড়িতে পুরিয়া তাহার মুখ আচ্ছাদন করিয়া পরিধেয় বস্ত্রের নীচে কোমরের সঙ্গে বাঁধিলেন, তদুপরি বস্ত্র পরিধান করিয়া ওরনা দ্বারা সর্ব্বগাত্র আচ্ছাদন করিলেন। যেন কেহ টের না পায়

যে তাঁহার সঙ্গে কোন দ্রব্য আছে। এই ভাবে মন্দিরে যাত্রা করিলেন।

যাহারা গোপনে কোন কাজ করিতে চায়, তাহাদের প্রাণে সততঃ আশঙ্কা থাকে কেহ বা টের পাইল। এই ভাবটী মুখেতেও প্রকাশিত হয়। সুতরাং গঙ্গাদেবী আশঙ্কচিত্তে ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ভগবানের কিরূপ ইচ্ছা বুঝা যায় না, ভক্তের ভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য অতি কঠিন ভাব ধারণ করেন।

মন্দিরের ভিতরে গঙ্গামাতা প্রবেশ করিয়াছেন, বাতাসে তাঁহার বস্ত্রাবরণ উড়াইয়া ফেলিল। পরিধেয় বস্ত্রের তলে কোন বস্তু আছে বলিয়া পাণ্ডাদের সন্দেহ হইল। একে তাঁহার শঙ্কিত ভাব, অপর বস্ত্রাবরণের উচ্চতা এই উভয় কারণেই তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং সন্দেহযুক্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। গঙ্গামাতা ছড়িদারদের হাত ছাড়াইয়া যাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিলেন; কিছুতেই ছড়িদারদের হাত ছাড়াইতে পারিলেন না। তাহাদের সহিত ধস্তাধস্তি করাতে বস্ত্রাচ্ছাদিত হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া গেল, গঙ্গামাতা মূর্চ্ছিত হইলেন, সমস্ত ব্যাপার প্রকাশিত হইলে ছড়িদারদের শত শত ছড়ি চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহার গাত্রে পড়িল। গঙ্গামাতা মূর্চ্ছিতা তদুপরি বেত্রাঘাতে মৃতপ্রায়। এইভাবে তাঁহার কুঠিরে নীত হইলেন।

গঙ্গামাতার এই অবস্থা দেখিয়া অনেক ভক্ত হাহাকার

করিতে লাগিলেন। ছড়িদারদের অব্যাহত বেত্র কিছুতেই নিবারিত হইবার নয়। যাহা হউক বহু কষ্ট পাওয়ার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথের দয়া হইল। ভক্তের মহিমা প্রকাশ করিতে হইবে। তাই সেবকদের প্রতি আদেশ হইল গঙ্গামাতা আমার পরম ভক্ত তাহাকে যে প্রহার করিয়াছ তাহা সমস্তই আমার গাত্রে আঘাত করা হইয়াছে। অতএব তাহাকে শীঘ্র নিয়া আস, এবং সে যেরূপে আমাকে খাওয়াইতে চাহিয়াছিল, সেই সকল দ্রব্য দ্বারা আমার ভোগ লাগাইতে দাও, আমি তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইব। তদনুসারে সেবকগণ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের আদেশ জ্ঞাপন করিল।

গঙ্গামাতা সেবকদের নিকট ভক্তবৎসল ভগবানের দয়ার কথা শুনিয়া তাঁহার সমস্ত অভিমান এবং দুঃখ ভুলিয়া গেলেন। আনন্দে বিহ্বল হইলেন। নবানুরাগে পুনরায় নানাপ্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার বহুদিনের সাধ মিটাইয়া জগন্নাথকে খাওয়াইবেন, এই আনন্দে তিনি বিভোর। সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া জগন্নাথের নিকট নিয়া গেলেন।

যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণকে যেইরূপ বাৎসল্য ভাবে খাওয়াইতেন, কর্ম্মাবাই যেরূপে খিচরী খাওয়াইয়াছেন, আজ গঙ্গামাতা ও বাৎসল্য ভাবেতে জগন্নাথকে খাওয়াইলেন। অদ্য হইতে গঙ্গামাতা প্রসিদ্ধ হইলেন।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৭	চেতঃ	শ্রেয়ঃ
২৮	অতিহীন	অতিহীনা
৩৪	তস্মিন	যস্মিন
৩৫	বিগডাইয়া	বিগড়াইয়া
৪১	গ্রহন	শ্রবণ
৪৫	ঢ়িবিতে	ঢিবিতে
৪৯	দাদাত্যেব	দদাত্যেব
৬৫	প্রণিনাং	প্রাণিনাং
৭০	মোহিনী কুণ্ড	রোহিনী কুণ্ড
৭১	সাওয়ার	যাওয়ার
৮৪	তর্থানি	তীর্থানি
৯৪	স্বরপওদামোদর	স্বরূপদামোদর
১০৫	পূজাস্পদ	পূজ্যস্পদ
১৩২	বড়ভাণ্ডের	বড়ডাণ্ডের
[illegible]	খুড্দার	খুড়্দার
১৫৯	হবিদাস	হরিদাস
১৬০	ঢ়েউ	ঢেউ
১৬০	বিদারিয়া	বিদরিয়া
১৬৩	না কয়	না কর
১৭২	মহায়দবকে	মহাদেবকে

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭২	কিরভে	করিতে
১৭৭	চৈতন	চৈতন্ত
১৭৯	গৌরাঙ্গ দেহ	গৌরাঙ্গ দেহে
১৮৫	স্তথেব	স্তথৈব
১৯০	আপনি	আপন
১৯১	উত্তণ্ড	উদ্দণ্ড
১৯২	আকজ্ঞা	আকাজ্ঞা
২০২	জল	দল
২০৮	দাসানুদাস	দাসদাসানুদাস
২০৯	যত্রিক	যাত্রিক
২১২	চৌষউ	চৌষদী
২২৩	গুণ্ডিকা	গুণ্ডিচা
২৪৮	বুডন	বুড়ন
২৫১	বিডম্বনা	বিড়ম্বনা
২৬১	নির্ব্বনের	নির্ব্বানের
২৬২	তত্ত্ব বধানের	তত্ত্বাবধানের
২৬৫	আমারা	আমরা
২৭১	সমদ্র মধ্যে	সমুদ্র মধ্যে
২৭২	শঙ্করাচার্য্যেকে	শঙ্করাচার্য্যকে
২৭৩	সমুদ্রেতীরে	সমুদ্রতীরে
৩১২	কর	করে
৩১৩	পাপৌ	পপৌ
৩১৪	নাপারি	না পারে

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩১৪	পিবাঃ	পিবঃ
৩২০	এখন ও তাঁহার	এখন তাঁহার
৩২৪	পঁহিল	তাহা
৩২৮	জাগরোদ্বে	জাগ্ররোদ্বেগোতানবং
৩৪০	কন্তিধরি	কণ্ঠধরি
৩৪২	দার্ঘ	দীর্ঘ
৩৪৩	চটকা	চটক
৩৪৫	আহটোটা,	আইটোটা
৩৪৯	দার্ঘ	দীর্ঘ
৩৫১	কোতুক	কৌতুক
৩৫২	রংখে	রাখে
৩৫৩	সহকান্তাগণ	সঙ্গে লঞা সব কান্তাগণ
৩৫৬	এতনু আশে	এতনুক আশে
”	গোপিয়া	সোপিয়া
৩৫৭	কাটীয়া	বাটীয়া।
৩৫৮	কথা গোসই	কথা কই গো সই
	তাল তমাল	তাউর তমাল
৩৬০	কৃষ্ণ ছোড়	কৃষ্ণ ছেড়ে
৩৬৪	পরম	পরস
৩৭০	কই	এই ব্রজ মাঝে
৩৭৭	পরবো	পরবোবব
৩৮৪	পড়স	পড়সী
”	ফুল	কুল

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪০২	পরিসঞা	পরসিয়া
”	হৈলা	হইলা
৪০৪	বড় × র্ত্তি	বড় মূর্ত্তি
”	ইয়া	লইয়া
”	আলাদির	আহ্লাদির
৪০৮	দেখিলন	দেখিলেন
৪০৯	নাভূক্ত	মাভুক্তং

"নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ"

নামক গ্রন্থের প্রশংসাপত্র।

গ্রন্থকার—শ্রীগোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী।

মুক্তাগাছা, রাজর্ষি ষ্টেট। জিলা—ময়মনসিংহ।

১৩২৬ সন।

TESTIMONIALS.

1. From the Personal A[illegible] of His Excellency the Governor of Bengal —

"I am desired to acknowledge with thanks the receipt of your letter dated the [illegible] July [illegible] and the copy of your book "Nilachale Sree Sree Jagannath and Sree Sree Gouranga" which you have been kind enough to send. The book has been placed on his Excellency's table."

Sd. [illegible]

2. From Justice Sir Gurudas Banerjee Kt, M. A., D. L. formerly Vice Chancellor of the Calcutta University.

Dear Sir,

[illegible] to acknowledge the receipt of your kind present a copy of your book entitled "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" I have glanced over portions of your book. It contains much interesting information about Puri, and it is valuable to the '[illegible]' a book full of '[illegible]'।"

Yours truly

Sd. GURUDAS BANERJEE.

3. From Maharaj Kumud Chandra Singha Bahadur of Durgapur Shushung (Mymensingh).

"My dear Sir,

Received with many thanks yours of the 23rd inst and a copy of "Nilachale Sree sree Jagannath and Sree sree Gouranga" so kindly presented to me, through Kailash Chandra Jyotisharnava, I shall go through the book with great pleasure, at my leisure.

It is really praiseworthy that you could devote at least a portion of your valuable time in pursuit of literature amidst your multifarious business. May God grant you long long lease of life and enable you to continue your noble pursuit."

I am yours sincerely

Sd. KUMUD CHANDRA SINGHA.

4. From Maharaja Sir Manindra Chandra Nandi Bahadur Kt. K. C. I. E. of Cossim Bazar.

"My dear Gopal Babu,

I have to thank you very much for your kindly presenting a copy of "Nilachale Sree Sree Jagannath and Sree Sree Gouranga" forwarded with your letter of the 23rd. July 1916.

As soon as I get leisure I shall enjoy its perusal and as it comes out from one who has attained spiritual world, it is sure to be one of the best books on that time."

Yours sincerely

Sd. MANINDRA CHANDRA NANDI.

5. From the Raja Bahadur of Dinajpur :—

"My dear Sir,

I duly received your letter of the 27th July last, and a copy of your excellent book "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" which you so kindly presented to me. Please accept my most sincere thanks for the very kind present.

I read the book with great pleasure, it is very interesting and contains a lot of useful informations.

Yours very sincerely

Sd. GIRIJA NATH ROY.

6. From Babu Umacharan Banerjee M.A., Principal Burdwan Raj College.

"It affords me great pleasure to note that I have read the book with special interest verging on curiosity. In the first place, the author himself is a worthy representative of the landed aristocracy of Bengal, belonging to the more respectable section of the Brahmin community. He is well-known for his pure and orthodox habits, and there is ample evidence in the work under review, of his devotion to, and extensive familiarity with, Sanskrit Learning—qualifications usually combined with the possessing of good riches. The author appears to be therefore well-qualified for the great work he has undertaken, not however from the sordid motives of lucre. Taking glibly of, and writing indiscriminately on, Sanskrit Literature and Philosophy have become the regaining fashion now a days in Bengal—but I note with particular satisfaction that the Rajarshi has not in any way tainted with literary vice. The language of the book is throughout good. Though occasionally disfigured by misprints and the general get up is all that can be desired. The ideas expressed are generally sound; and his interpretation of the learned quotations from various Sastras—with which the work abounds,—seems to be fairly accurate and reliable. There is no attempt, at studied or careless misinterpretation of the ancient text—an evil which has gained undue ascendency in some quarters. The work can be read with advantage by that section of the educated public who take real interest in the growth and development of 'Vaishnavism' and can safely be put into the hands of our Hindu undergraduates, who being too much enamoured of pure secular learning, or rather compelled, by stress of circumstances, to seek the acquisition of such learning are fast developing strange notions of the spiritual culture of their remote ancestors."

7. From Babu Pyjushkanti Ghose, Editor of the 'Amrita Bazar Patrika :—

"I have received your book sent under a Registered

cover. On a cursory view the book appeared so me to be an excellent production and it gladdens my heart to think that such advanced 'Bhaktas' like you are devoting thier time and energy in the field of the 'Vaishnava literature.' Certainly notices of the book must appear both in the Amrita Bazar and Ananda Bazar Patrika."

8. Review of the book written in the 'Amrita Bazar Patrika' is as follows :—

"Nilachale Sree Sree Jagannath and Sree Sree Gouranga' by Rajorshi Gopal Chandra Acharjya Chowdhury :—With regard to the book we beg to acknowledge with thanks the receipt of a copy of this book which may be fittingly described as a compendium of information relating to Holy Puri, its great and hallowed temple, and the many shrines and sanctuaries that abound in that great centre of Vaishnavism. The traditions that handed for generations, the fascinating legends that have entwined themselves round the temple of the lord, the rituals, the festivals—all these have been described with a wealth of detail and minuteness that cannot fail to impress most superficial reader. Exploring the extensive field of Vaishnavic literature, the author has succeded in gathering together a unique collection of matter which has been colated and presented in a manner at once scholarly and simple.

A most fairminded presentment is the treatment of the vexed question of the utility or otherwise of the obscene carvings that are to be seen in the lower part of the Jagannath temple. The author, we find, has been free to express his own view of the matter, but it is the refreshing absence of dogmatism that is truely commendable.

A short list of the Rajas who ruled over Puri from the great Jajati Keshori down to the time of the Marhatta Invasion, adds considerably to the historical of the volume, while the life stories of Joydeva Goswami, Madhodas and last but not the last attractive of its many features, while the paper and type making reading a pleasure. Altogether a Bhaktas-Book from the pen of a true

Bhakta and one that is sure to form a welcome addition Vaishnavic literature."

THE OPINION OF THE 'BENGALEE'.

"Puri is a sacred name and great sanctity attaches to it as a place of pilgrimage for the Hindus. There are books on Puri. But the volume under notice is perhaps a unique publication in point of intrinsic value as being written by a devout Vaishnava. It gives a clear insight into the origin, sanctity and value of the different places of pilgrimage in Puri or Purusattamkhetra as it is called. The language of the book is simple and lucid. The author deals with the religious history of Purusattam as a place of Pilgrimage and quotes Sastric Texts on the point and goes on step by step describing the different places of worship and different festivals and their devotional value—according to the Sastras. But in this, mainly, spiritual outlook, the secular objects also have not been lost sight of thus making the book comprehensive and upto-date. The book has been published expressly for the purpose of devoting the sale proceeds to the benefit of Muktagacha, Harivaktipradayini Sava, of which the author is the President. We are confident that Vaishnavas will value it as a treasure. But none the less, it will be read with delight and benefit by non-vaishnavites as well."

10. The opinion of the Hony. Librarian of the Rammohan Library, Calcutta.

"I am desired by the Executive Committee of the Library to request the favour of your kindly presenting the Library a copy of your book 'নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ.' I need hardly say that your book will be a valuable addition to the stock of the Library."

(১১) মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এইচ, ডি, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় লিখিয়াছেন :—

(ক) "It is one of the most valuable publication in Bengali."

Sd. Satish Ch. Vidyabhusan.

(৺) "রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের 'নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ' নামক পুস্তক পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীত হইলাম। পুস্তকের প্রস্তাবনাটী এতই উপাদেয় হইয়াছে যে, মাত্র এইটীতেই গ্রন্থকারের অশেষ দক্ষতার ও জ্ঞানবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের প্রধান তীর্থ পুরুষোত্তম ক্ষেত্র সম্বন্ধে ঐ অনুপম পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গ্রন্থকার প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। ভাষা, ভাব ও বিষয় বিন্যাসের কৌশলে গ্রন্থখানি যে সকলেরই মনোজ্ঞ হইবে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।"

স্বাক্ষর—শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

(১২) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

"রাজর্ষে! আপনার রচিত "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মধুর লীলা আপনি যেরূপ সুন্দর ভাবে সুললিত ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন তাহা দেখিয়া ভক্ত মাত্রেরই হৃদয়ে আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেল হইয়া উঠে। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের বৌদ্ধমূর্ত্তিত্ব সম্বন্ধে ভ্রান্ত প্রবাদ যেরূপ সদ্‌যুক্তি ও সাহসের সহিত খণ্ডন করিয়াছেন তাহা আস্তিক হিন্দুমাত্রেরই বিশেষ আনন্দপ্রদ হইয়াছে। এই বিষয়ে আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা আমার সম্পূর্ণরূপে অভিমত জানিবেন। আপনার ন্যায় প্রধান ভূম্যধিকারী মহাত্মা বঙ্গভাষার সেবায় এরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন ইহা দেখিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই হৃদয় যে গৌরবানুভব করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

স্বাক্ষর—শ্রীপ্রমথনাথ শর্ম্মা।

(১৩) বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ট্রান্‌স্লেটার মহামান্য পণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর এম, এ, পি, আর, এস, মহাশয় লিখিয়াছেন ;—

আপনার "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছি। ভক্ত ভগবানকে যে ভাবে দেখেন অন্য সকলে ত সেই ভাবের অধিকারী হইতে পারেন না। আপনি স্বয়ং একজন পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত, গ্রন্থের ছত্রে ছত্রেই আপনার হৃদয়ের অভিব্যক্তি পাইয়াছি। আপনার উক্তি সমর্থন জন্য পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা হইতে আপনার শাস্ত্রদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ভক্তের নিকট আপনার গ্রন্থের আদর হইবে, সাধারণ পাঠকও ইহা হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় ধনী ও মহানুভব ব্যক্তির বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় অনেক সুফলের আশা করা যায় ইতি।"

স্বাক্ষর—শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শর্ম্মা।

(১৪) গবর্ণমেণ্ট জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"রাজর্ষি মহাত্মন্! আপনার পুস্তকখানি প্রকৃত পক্ষে অতীব উত্তম হইয়াছে। ৺শ্রীক্ষেত্র ও শ্রীগৌরাঙ্গ বিষয়ক এরূপ পুস্তক ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। আপনার পুস্তক পাঠে ৺শ্রীক্ষেত্র সম্বন্ধে অনেক অজ্ঞাত বিষয়ে আমরা জ্ঞান লাভ করিয়াছি, আপনার পুস্তক যে এরূপ সুন্দর ও উপাদেয় হইবে তাহা পূর্ব্বে কল্পনা করিতে পারি নাই। এই পুস্তকে সাহিত্য ও ধর্ম্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহা পাঠে বুঝিতে পারা যায় যে এ পুস্তক আপনার দিবারাত্র অসাধারণ পরিশ্রমপ্রসূত ফল। আপনি যথার্থ রাজর্ষি ও ময়মনসিংহের গৌরব। জমিদারগণ যে এরূপ একনিষ্ঠচিত্তে বাণীর সেবা করিতে পারেন তাহা আপনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। আপনি আদর্শ পুরুষ ও জমিদারকুলভূষণ, এই গ্রন্থ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইল।"

স্বাক্ষর—শ্রীকৈলাসচন্দ্র জ্যোতিষার্ণব

(১৫) "মুক্তাগাছা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সভাপতি স্বনামধন্য জমিদার হরিভক্তি-পরায়ণ রাজর্ষি শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহোদয় প্রণীত অভিনব গ্রন্থ একই পুস্তক ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও ৺শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের মধুর লীলা সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে, এই শ্রেণীর ভক্তিমূলক গ্রন্থ আর প্রকাশিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"

প্রকাশক—শ্রীনরহরি ঠাকুর
আনন্দ ধাম, পুরী।

(১৬) বরিশালের উজ্জ্বল রত্ন, ধার্ম্মিকপ্রবর ও স্বদেশহিতৈষী উকীল শ্রীযুক্ত অশ্বিনী-কুমার দত্ত এম, এ, বি, এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"সপ্রণতি নিবেদন :—মহাশয়ের নীলাচলে ৺শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। পুস্তকখানি শ্রীক্ষেত্রে দর্শনাভিলাষী ব্যক্তি মাত্রেরই পবিত্র সঙ্গী হইয়া বিশেষ উপকার সাধন করিবে। উহাতে আপনার চিন্তা,

গবেষণা ও অপূর্ব্ব সংগ্রহ হিন্দুগণের বড় আদরের বস্তু করিয়া রাখিয়াছে। ভগবানের শ্রীচরণে আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থনা করি।" ইতি—

প্রণত

স্বাঃ—শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

(১৭) ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল ও অধুনা কলিকাতা মেট্রোপলিটান কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"পুরুষোত্তম বিষয়ে আপনার বৃহৎ গ্রন্থ পাঠ করিয়া রোগশয্যায়ও আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছি; অংশ বিশেষ আগ্রহ সহকারে একাধিকবারও পাঠ করিয়াছি। এই মহা-তীর্থের ইতিহাস, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের পূজা প্রতিষ্ঠা কাহারও কাহারও জীবনে তাঁহার কৃপা ও মহিমার নিদর্শন, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের পুরীলীলা ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে উপন্যস্ত হইয়াছে। লক্ষ্মীপ্রসাদভাক্ ও বাগ্ দেবতা সেবানুরাগী এই দুইটী বিশেষণ একই পুরুষে প্রযোজ্য দেখিয়া সুখী হইয়াছি; তদুপরি উন্নত পরমার্থ বিষয়ে আভিমুখ্যের প্রমাণ পাইয়া সমধিক আনন্দ লাভ করিয়াছি।" ইতি

স্বাঃ—শ্রীকুঞ্জলাল নাগ।

(১৮) ঢাকা সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র গুহ এম, এ, বি, এল, মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"রাজর্ষে, আপনার 'নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ' নামক উপাদেয় গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া অনুগৃহীত হইয়াছি। আপনি ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের আজীবন সভ্য, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্ত ও অকৃত্রিম সেবক। আপনার গ্রন্থ আমাদের সর্ব্বাগ্রে পাঠ করা কর্ত্তব্য। আপনাকে আমরা এ পর্য্যন্ত বৈষ্ণব ও পরম ভাগবত বলিয়াই শ্রদ্ধা করি। আপনি যে বাঙ্গালা ভাষাও এরূপ কৃতিত্বের সহিত সাধনা করিতেছেন তাহা ইতিপূর্ব্বে জানিতাম না। ভরসা করি আপনি এরূপ আরও গ্রন্থ লিখিয়া মাতৃভাষার [illegible] বৃদ্ধি করিবেন।"

স্বাঃ—শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

(১৯) বাঁকুড়া দর্পণে ২৩শে মার্চ্চ ১৯১৭ সনে যে সমালোচনা হইয়াছিল তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ"—শ্রীযুক্ত রাজর্ষি গোপালচন্দ্র আচার্য্য

চৌধুরী প্রণীত। এই গ্রন্থখানির সকলই সুন্দর, ভাষা সুন্দর, গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সুন্দর, রচনাপ্রণালী সুন্দর, ভাব সুন্দর, ভাষা সুন্দর, মুদ্রণ অতি সুন্দর। গ্রন্থখানির বিক্রয়ে যাহা লাভ হইবে, তাহা হরিসভার কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। সুতরাং গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্যও সুন্দর। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কার্য্যে, চিরসুন্দর কার্য্যে ভগবান যে সহায় হইবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের ভিন্ন ভিন্ন উৎসব, ৺পুরীধামের তীর্থ সমূহের বিবরণ এবং পুরী রাজবংশের ইতিবৃত্ত সুললিত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সম্বন্ধে বহু কথাও গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আলোচিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই উপাদেয় ভক্তি গ্রন্থখানি, পুরীর তীর্থযাত্রীগণের বিশেষ উপযোগী। এই গ্রন্থের মধ্যে যে কয়েকখানি হাফটোন্ ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহা বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। পরম শ্রদ্ধাস্পদ রাজর্ষি মহোদয়, ধনী সন্তান, তিনি বিলাস বাসনা ত্যাগ করিয়া প্রকৃত মহৎ কার্য্যে শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি, তাঁহার উদ্যম প্রশংসনীয়।"

(২০) ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কাটিহালী বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীগুরুচরণ স্মৃতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"রাজর্ষে! গতকল্য ভবৎপ্রণীত পুস্তকখানা প্রাপ্ত হইলাম। পুস্তকখানা পাঠ করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থের কঠিন কঠিন বিষয়গুলি অতি সরল ভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার মহাশয় গ্রন্থ রচনা কৌশলে নানা শাস্ত্র পারদর্শিতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। বস্তুতঃ পুস্তকখানা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি মহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া স্বকীয় যশোরাশি বিস্তার করতঃ পুত্রপৌত্রাদির সহিত সুখে কালাতিপাত করুন।"

স্বাঃ—শ্রীগুরুচরণ স্মৃতিরত্ন।

(২১) ৺কাশীধাম হইতে চন্দ্রকান্ত বসু নামক জনৈক ভদ্রলোক লিখিয়াছেন—

"আপনার পত্র সহ "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" নামক পুস্তকখানি পাঠ করতঃ পরম সন্তোষ লাভ করিলাম। মহামহোপাধ্যায় মহোদয়গণের প্রশংসার যোগ্যই গ্রন্থখানি হইয়াছে। সাহিত্যভাণ্ডারে এই পুস্তকখানি চিরকাল রত্নস্বরূপ বিরাজমান থাকিবে সন্দেহ নাই।"

স্বাক্ষর—শ্রীচন্দ্রকান্ত বসু।

(২২) ময়মনসিংহ জেলায় টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত বল্লাওয়ালী জালিগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মথুরামোহন ভক্তিরত্ন মহাশয় গৌরগোবিন্দ কুটীর হইতে লিখিয়াছেন।—

"মহাত্মন্। এই মাত্র ভবদীয় শ্রমলব্ধ "নীলাচলে গৌর ও জগন্নাথ" শ্রীগৌর সমীপে উপনীত হইলেন। আমার বিমল অসীম অতৃপ্ত আনন্দ এই যাঁহার করুণা মহারাজ রুদ্রতুল্য হইয়া মহোদয় এই মহান কার্য্য নিষ্পাদন করিয়াছেন আজ তাঁহার নিকট আপনার শ্রমলব্ধ ধন উপস্থিত হইয়াছে। আগামী ১লা মাঘ হইতে স্বয়ং শ্রীগৌরযুগল ও তদীয় ভক্তজন আপনার শ্রমলব্ধ ধনের বর্ণনা পরিজ্ঞাত হইবেন। শ্রীগৌরযুগল আপনাকে দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র স্থানে স্থান প্রদান করুন। আপনার কৃপা, করুণায় অধম আমরা গৌরভক্তিপথের পথিক হই। শ্রীগৌর আপনার ধর্ম্মবল পরিবৃদ্ধি করুন। আশীর্ব্বাদ করিবেন এ অধমচরণ ভবতুল্য মহৎ ব্যক্তির কৃপাকটাক্ষে সর্ব্বদা শান্তি লাভ করিতে পারি।"

স্বাঃ—শ্রীমথুরামোহন ভক্তিরত্ন।

(২৩) ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাউন সেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার রায় শ্রীযুক্ত রাধাবল্লভ চৌধুরী বাহাদুর লিখিয়াছেন :—

প্রেম রাজর্ষিসত্তম,—

যথাকালে কৃপালিপি ও শ্রীগ্রন্থ পাইয়া পরম চরিতার্থ হইয়াছি। তোমার শ্রীগ্রন্থ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কেবল ভাষা অংশে নহে, তত্ত্ব অংশে, ইতিহাস অংশেও প্রভুর ইচ্ছায় অতি মহা অভাব দূর হইল। শ্রীমন্দিরের আলয়ে অশ্লীল ছবির কৈফিয়ৎ চমৎকার হইয়াছে।

স্বাঃ—শ্রীরাধাবল্লভ চৌধুরী।

(২৪) ৺পুরীধাম হইতে মদানন্দ, পণ্ডিতপ্রবর রাজকবিরাজ শ্রীযুক্ত যাগুনি মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"মুক্তাগাছা হরিভক্তি সভার সভাপতি রাজর্ষি গোপালচন্দ্র আচার্য্যস্য চৌধুর্য্যোপাখ্যানস্য "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাভিধগ্রন্থ" বিশেষ্য আমূল চূল পর্য্যালোচনয়া নিরতিশয়া নন্দাতুলা তেন চ কৃতকৃত্যোঽস্মি। শ্রীশ্রীনীলাদ্রিনাথস্য দারুমূর্ত্তি মাহাত্ম্যাদি বর্ণনং পুরবাসি নৃপতিবংশ বিবরণাদি কঞ্চ পুরাণভক্তিগ্রন্থানুগততয়া প্রতিচ্ছবি বিভূষিততয়া চ অতীব মনসঃ আহ্লাদনং যদ্যপি ক্ষেত্রান্তর্বর্ত্তী মঠাদি সুপ্রসিদ্ধস্থানবিবরণং

শ্রীভুবনেশ্বরাধিষ্ঠিতৈকাম্রকাননাদিবিবরণঞ্চ তদপিপ্রাচীন মতানুগত তথা সুশ্রাবণীয়ঃ অতোঽহং মন্যেন কেবলং মদং গ্রন্থঃ বৈদেশিকানামুপকরী অপিতু এতদ্দেশবাসিনাঞ্চ বিশেষতঃ। সম্ভাবয়ামি চ অদৃষ্টক্ষেত্রেণাপি প্রাঞ্জল পাঠেন দৃষ্টচরমিব মন্যেত।" এতত প্রণয়েন—সর্ব্ব হিন্দুসমাজস্য কৃতজ্ঞতাভাজনং ভবিতুমর্হতি খলু প্রণেতা। সদনুষ্ঠানমিদং সদানুকরণীয়মিতি ন সংশয়ঃ।"

স্বাঃ—পণ্ডিত শ্রীমাধব মিশ্র।

(২৫) ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের ভূতপূর্ব্ব প্রাইভেট সেক্রেটারী ৺রামনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" দেখিলাম, বেশ হইয়াছে, আশার অতিরিক্ত বেশ হইয়াছে, বিশেষতঃ ইহার 'প্রস্তাবনা' অংশ অতি উপাদেয় হইয়াছে। ইহার গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র ও সাধু বাক্যের সমন্বয় বড়ই সুন্দর হইয়াছে। এই শ্রেণীর পুস্তক মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ অবশ্য স্থান পাইবে, কোন্ স্থানে স্থান পাইবে তাহা ভাক্তমান মহাত্মাগণ বিচার করিবেন।"

স্বাঃ—শ্রীরামনাথ শর্ম্মা।

(২৬) ৺কাশীধাম হইতে শ্রীযুক্তা জগদম্বা দেবী লিখিয়াছেন—

"আমাদের বংশের মধ্যে দুর্গাদাস বাবু নলদময়ন্তী" উপাখ্যান ঘটিত একখানা বই লিখিয়া ছাপাইয়াছিল, তৎপর তুমি "নীলাচলে জগন্নাথ ও শ্রীগৌরাঙ্গ" নামক পুস্তক লিখিয়া ছাপাইয়া পাঠাইয়াছ তাহা পাঠ করিয়া বড়ই সন্তোষলাভ করিলাম। বিশ্বেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি দিন দিন তোমার যশগৌরভ ও ভগবৎপ্রেম বর্দ্ধিত হউক।"

আশীর্ব্বাদিকা

স্বাঃ—শ্রীজগদম্বা দেবী।

(২৭) ৺পুরীধামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের মন্তব্য স্মারিকারূপে গ্রন্থের কলেবরভুক্ত করা হইল।

রাজর্ষি শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী মহোদয় সঙ্কলিত "নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" নামক পুস্তকখানি উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া যাদৃশ আনন্দ লাভ করিলাম, পুস্তক পাঠে ততোধিক প্রীতিলাভ করিলাম। পুস্তকখানি যাদৃশ অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা সহকারে লিখিত, তদনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে তাহা গ্রন্থের অর্দ্ধবৃত্তি

ধারণ করিতে পারে ; এই বাহুল্য ভয়ে বিস্তৃত মন্তব্য দানের বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিম্নে তাহা সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করিলাম।

পুস্তকখানি গদ্যাত্মক, মধ্যে মধ্যে নিতান্ত শিক্ষণীয়, অথচ গম্ভীর সারময় সংস্কৃত ও বঙ্গভাষার কতিপয় পদ্যাংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে তীর্থ-পর্য্যটকদিগের তীর্থতত্ত্ব অবগতি, ঐতিহাসিকদিগের যুগান্তরাতীত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ, জ্ঞান-পিপাসুদিগের উজ্জ্বল জ্ঞানালোক প্রাপ্তি এবং লোভানুভাবকতার সার্থক্য সম্পাদিত হইবে। স্থূলতঃ পুস্তকখানি নানা গুণে সাধারণের আদরণীয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের তৎতৎ জ্ঞাতব্য বিষয় এবং তৎসম্পর্কীয় ক্ষেত্রান্তর্গত 'মঠ' প্রভৃতির অনেক কৌতূহলোদ্দীপক অথচ অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থে শিক্ষণীয় শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ ও ভক্তকুলাগ্রগণ্য শ্রীজয়দেব প্রভৃতির জীবন বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে মনোদর্শন প্রীতিকর রমণীয় প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থের রচনাপ্রণালী পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। পুস্তক বর্ণিত বিষয় প্রায়শঃ তথ্যানুগত, ভাষা সুললিত, প্রসাদগুণবিশিষ্ট, ভাব গম্ভীর, ভক্তিরসোদ্দীপক ও সুবোধ্য ; অতএব এতদ্দ্বারা হিন্দু সাধারণের উপকার সাধিত হইতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস। স্থূলতঃ গ্রন্থের স্বরূপ যেরূপ নয়নানন্দকর, বর্ণিত বিষয় তেমন মানসতৃপ্তিপ্রদ। তবে মহোদয়ের বর্ণিত শ্রীজয়দেব প্রভৃতির জন্মভূমি নিরূপণাদি সম্বন্ধে আমরা একমত নহি। গ্রন্থকর্ত্তা অনুসন্ধানবলে জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার রচিত 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত বঙ্গভাষাযোগে নির্ম্মিত এবং বীরভূমিতে জয়দেবের বাৎসরিক অনুষ্ঠান অদ্যাবধি প্রচলিত রহিয়াছে, অতএব বীরভূম জয়দেবের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারিতেছি না। কারণ ভক্তমালা গ্রন্থে লিখিত আছে যে জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুবিল্ব গ্রামে ও সমুদ্রকূলবর্ত্তী, সেই কেন্দুবিল্ব গ্রাম অধুনা উড়িষ্যার পুরীজেলান্তর্গত কোঠদেশ পরগণায় স্বনামে বিখ্যাত রহিয়াছে। অপিচ এই কেন্দুবিল্ব সমুদ্রের সন্নিহিত এবং জয়দেব উৎকলীয় ব্রাহ্মণ কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া এই উৎকলেই জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিবার ভূরি ভূরি প্রমাণ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, উড়িষ্যাতে গীতগোবিন্দ তুল্য বা ততোধিক সুললিত অথচ অনায়াস সুবোধ্য সংস্কৃত কাব্য দৃষ্ট হয়। তবে এই গ্রন্থগুলির প্রণেতা কি বঙ্গবাসী ? ইহা কখনও যুক্তিসঙ্গত নহে। গ্রন্থকর্ত্তা মহোদয় যে বীরভূমের কথা লিখিয়াছেন সেই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী

হে। অতএব নানা কারণ বশে জয়দেবের জন্মভূমি উড়িষ্যা ভিন্ন অন্য কোন স্থানে হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ লেখক মহোদয়ের প্রাচীন রামানুজ সাম্প্রদায়িক লোককে আধুনিক বলিয়া প্রমাণ করা অমূলক, কারণ মহারাষ্ট্রীয়দিগের মন্দিরাধিকার দিনে দিনে উঠিয়াছে। বংশে আধিপত্য বর্দ্ধিত হইলেও শ্রোত্রস্মার্ত্তধর্ম্ম অনাদি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। চৈতন্যদেবের অবস্থান সময় কতিপয় সেবা বৃদ্ধি। সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ক্ষত্রিয়েরা সত্ত্ব-রজঃ প্রধান প্রকৃতিক এবং বীররস ও রুদ্ররস স্বভাব এই গুণ রাজ্য পরিচালনা পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। ইঁহারা যদি শান্তিরসাশ্রিত হইয়া বৈষ্ণব হইয়া থাইতেন তবে রাজ্য পরিচালনা অসম্ভব হইত। যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে বৈষ্ণব বলিয়া গ্রন্থকর্ত্তা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা অসত্য নহে, ক্ষত্রিয়েরা যে শান্তিরসের ত্রিসীমায় যাইবে না, অথচ বিষ্ণুভক্তিরসাস্বাদন করিবে না এ কথা আমরা বলিতেছি না, তবে ইহাদের সময়ে তন্ত্রের বিশেষ প্রাদুর্ভাব না থাকাতে স্মার্ত্তধর্ম্মের বিশেষ প্রচার ছিল এবং তাৎকালীন ক্ষত্রিয়েরা অথর্ব্বনীয় আভিচারিক মন্ত্রবলে হিংসাদি কার্য্য করিতেন; অতএব স্মার্ত্ত থাকা হেতু পঞ্চদেবতার উপাসনার অধিকারী হইয়া প্রকারান্তরে বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, কিন্তু কেবল বৈষ্ণব ছিলেন না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, গ্রন্থখানা আদ্যন্ত পাঠ করিলে পাঠকদিগকে পরমানন্দ ভোগ করিতে হয় এবং গ্রন্থকার মহাশয়ের অসাধারণ উদারতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা অনুভব করিতে হইবে। বঙ্গসাহিত্যকোষে এই গ্রন্থখানা উদারতা বিষয়ে উচ্চস্থান অধিকার করিবে বলিয়া আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। এবম্বিধ পুস্তক ও এবম্বিধ ধর্ম্মপরায়ণ লেখকের প্রাচুর্য্য যে ভারতের হিতের জন্য একান্ত আবশ্যক ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। নানা উপকার পাইয়া এবং পাঠের আশায় জগৎপাতা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি আমাদের লেখক মহাশয়কে সপরিবারে দীর্ঘায়ু করিয়া পরহিতৈষণা বর্দ্ধিত করুন। ইতি।"

মহামহোপাধ্যায়োপাধিক

স্বাঃ—শ্রীসদাশিব মিশ্র শর্ম্মা—পুরী।

জয়দেবের জন্মভূমি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত প্রতিবাদ খণ্ডন :—

"এই প্রতিবাদের আলোচনা করিতে গিয়া মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র মহাশয়ের নিকট ১৩২৫ সনের শেষভাগে এক পত্র লিখা হয়, তাহাতে গীতগোবিন্দের উদ্ধৃত "জয়দেবের

জয়দেব 'কেন্দুবিল্ব' বিষয়ক শ্লোক এবং তাহার টীকা, ব্যাখ্যা মিশ্র মহাশয়ের নিকট পাঠান হয়। সেই টীকা দ্বারা আমরা দেখাই যে—

'বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন ।১।

কেন্দুবিল্ব সমুদ্রসম্ভব রোহিণীরমণেন ।২।

এই 'সমুদ্রসম্ভব' পদের টীকাকারের মতে "কেন্দুবিল্ব নামা জয়দেবস্য গ্রামঃ কেন্দুবিল্ব মিতি কুলঞ্চ তয়োর্মহত্বাৎ সমুদ্রত্বেন নিরূপণং তদুদ্ভবচন্দ্রেণ যথা সমুদ্রো চন্দ্রস্য সমুদ্র বৃদ্ধিকরস্তথায়মপি তদ্বৃদ্ধিকর ইত্যর্থঃ।" এই কথা দ্বারা সমুদ্র সম্ভব পদের আপত্তি খণ্ডন হইল। এই সব বিষয়ে প্রত্যুত্তরে তিনি লিখেন যে এইটী কবির কল্পনা মাত্র। টীকাকারের ব্যাখ্যা তিনি সমীচীন বলিয়া মনে করেন না"। ১৩২৬ সন ৬ই ভাদ্র।

স্বাঃ—শ্রীগোপালচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী।